কন্নড সাহিত্যের ইতিহাস

এই পুস্তকের অন্তঃপ্রচ্ছদে আনুমানিক খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতকে রচিত একটি ভাস্কর্যের প্রতিলিপি মুদ্রিত হয়েছে। নাগার্জুনকোণ্ডার এই ধ্বংসাবশেষ এখন নতুন দিল্লীর ন্যাশনাল মিউজিয়ম-এ রক্ষিত। এই ভাস্কর্যের বিষয়: রাজা শুদ্ধোদনের রাজসভায় তিনজন জ্যোতিষী ভগবান বুদ্ধের জননী মায়াদেবীর স্বপ্নের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করছেন। জ্যোতিষীদের আসনের তলায় বসে করণিক তাঁদের বক্তব্য লিখে চলেছেন। অনুমান এটি ভারতে লিখনকলার প্রাচীনতম চিত্ররূপ।

কন্নড সাহিত্যের ইতিহাস

আর. এস. মুগালি

অনুবাদ
বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

সাহিত্য অকাদেমি

Kannad Sahityer Itihas : Bengali translation by Vishnupada Bhattacharya of R. S. Mugali's *History of Kannada Literature*. Sahitya Akademi, New Delhi, 1991. Rs. 30

প্রথম প্রকাশ : ১৯৯১

সাহিত্য অকাদেমি

রবীন্দ্রভবন, ৩৫ ফিরোজশাহ রোড, নতুন দিল্লী ১১০ ০০১

বিক্রয় কেন্দ্র

'স্বাতী', মন্দির মার্গ, নতুন দিল্লী ১১০ ০০১

শাখা কার্যালয়

'জীবনতারা ভবন' (৫ম তল), ২৩এ/৪৪এক্স্, ডায়মণ্ড হারবার রোড, কলিকাতা ৭০০ ০৫৩

২৯ এলডামস রোড, তেয়নামপেট, মাদ্রাজ ৬০০ ০১৮

১৭২ মুম্বাই মারাঠী গ্রন্থ সংগ্রহালয় মার্গ, দাদার, বোম্বাই ৪০০ ০১৪

মুদ্রাকর

শ্রীসৌমেন্দ্রনাথ পাল

ভিক্টোরিয়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

৯৪ বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা ৭০০ ০০৬

সূচীপত্র

ভূমিকা

সাহিত্য অকাদেমির একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প হল অকাদেমি স্বীকৃত প্রতিটি ভাষায় রচিত সাহিত্যের ইতিহাস প্রকাশনা। সাধারণ ইতিহাস প্রথমে লিখিত হয় সংশ্লিষ্ট ভাষায় অথবা ইংরেজীতে এবং পরে অন্যান্য ভাষায় অনূদিত হয়। ভাষা, লিপি ও পটভূমির পার্থক্যের ফলে ভারতীয় সাহিত্যের যে মূল ঐক্যটি অস্পষ্ট হয়ে আছে, সমগ্র প্রকল্পটি সম্পূর্ণ হলে সেই ঐক্য সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা লাভ করা সম্ভব হবে। এইভাবে সাহিত্যের মধ্য দিয়ে জাতীয় সংহতির পথটি প্রস্তুত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

এই প্রকল্পের অঙ্গরূপে কন্নড-ভাষায় কন্নড সাহিত্যের ইতিহাস রচনার কাজটি সাহিত্য অকাদেমি আমাকে অর্পণ করেন। ১৯৬০ সালে কাজটি সম্পূর্ণ হয় এবং গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৯৬৫ সালে। বছর কয়েক আগে সাহিত্য অকাদেমি আমার অভিপ্রায় মতো পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সহ বইটি ইংরেজীতে অনুবাদ করার নির্দেশ দেন।

'সাহিত্যের ইতিহাস' পর্যায়ের প্রতিটি খণ্ডের জন্য সাহিত্য অকাদেমি কর্তৃক প্রস্তুত সাধারণ নির্দেশপত্র অনুযায়ী বইটি প্রথমে কন্নড ভাষায় রচিত হয়। নির্দেশ পত্রের নিয়ম অনুসারে প্রতিটি খণ্ডে উপযুক্ত উদাহরণসহ প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যের ঐতিহাসিক ও সমালোচনামূলক পরিচয় থাকবে। কিন্তু সাহিত্য ইতিহাসের ভূমিকারূপে সাধারণ পাঠক-পাঠিকার উপযোগী করে তোলার জন্য বইটিতে অনাবশ্যক পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ ও দীর্ঘ আলোচনা বর্জনীয়।

মূল কন্নড গ্রন্থে এবং ইংরেজী রূপান্তরে সাহিত্য অকাদেমি প্রদত্ত নির্দেশাবলী অনুসরণের চেষ্টা করা হয়েছে। ইংরেজী সংস্করণ প্রকাশিত হলে যাঁদের জন্য এই অনুবাদ প্রস্তুত হয়েছে তাঁদের প্রয়োজন মিটবে এবং ভারত-বর্ষে ও তার বাইরে বৃহত্তর জনসমষ্টির মনোযোগ আকৃষ্ট হবে বলে আশা করি।

আধুনিক সাহিত্য নিরন্তর বেড়ে চলেছে। নতুন ধারা, নতুন রীতি প্রচলিত হচ্ছে। খুবই স্বাভাবিক যে একটা বিশিষ্ট কাল পর্যন্ত আধুনিক সাহিত্যের পর্যালোচনা অচিরেই সেকেলে হয়ে পড়বে। নতুন সংস্করণ প্রকাশের সুযোগ এলে তবেই হাল আমলের তথ্যাদি সংযোজিত হতে পারে। কিন্তু যখন বিবেচনা করা যায় যে মাতৃভাষা ছাড়া অন্যান্য ভাষার সাহিত্যিক ইতিহাসের আকর্ষণ এখনও পাঠক সাধারণের মধ্যে গড়ে ওঠে নি, তখন সে সুযোগ খুব নিকটবর্তী বলে ভাবা যায় না। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে আধুনিক কন্নড সাহিত্যের পর্যালোচনা অংশে যে অপূর্ণতা দেখা যাবে পাঠক সাধারণ তা সহৃদয়তার সঙ্গে গ্রহণ করবেন বলে ভরসা রাখি।

আমাকে এই কাজের দায়িত্ব দেওয়ার জন্য সাহিত্য অকদেমির কর্তৃপক্ষ আমার কৃতজ্ঞতা ভাজন। ইংরেজী সংস্করণের উন্নতি বিধান কল্পে শ্রী এল্. এস্ শেষগিরি রাওর কাছে আমার ঋণ স্বীকার করছি।

শ্রীকমলালয়

৯৫ বি, আই. এন্. ব্লক রাজ্জীনগর

বেঙ্গলূর ৫৬০ ০১০

আর. এস. মুগালি

প্রথম অধ্যায়

কন্নড ভাষার উদ্‌ভব ও বিকাশ

সমৃদ্ধিশালী ভারতীয় সাহিত্যের সুদীর্ঘ ইতিহাসে কন্নড ভাষার সাহিত্যিক ঐতিহ্য যেমন প্রাচীন ও অবিছিন্ন, তেমনি বিষয়বস্তু ও প্রকাশভঙ্গিতে বিচিত্র। একেবারে গোড়া থেকেই এই সাহিত্য একদিকে যেমন ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত, অন্যদিকে তেমনি আঞ্চলিক জীবনধারার সঙ্গেও সংযুক্ত। কখনো কখনো এই সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রচনাবলীতে সর্বভারতীয় এবং আঞ্চলিক উপাদানের একটি চমৎকার সমন্বয় ঘটেছে। একজন 'কন্নডিগ' অর্থাৎ কন্নডভাষীর কাছে তার ভাষা ও সাহিত্যের অন্তরঙ্গ পরিচয় যেমন প্রেরণার উৎস, তেমনি বৃহত্তর ভারতের ও ভারত বহির্ভূত সাহিত্যানুরাগীর কাছে চিত্তাকর্ষক হবে আশা করা যায়।

দক্ষিণ ভারতের একটি প্রধান ভাষা কন্নড। দু'কোটিরও বেশি লোক এই ভাষায় কথা বলে। এই ভাষা যে কত প্রাচীন তা নিশ্চিত করে বলা কঠিন। তবু এমন সব তথ্য প্রমাণ আছে যা থেকে বলা যায় কন্নড ভাষা অন্তত দু হাজার বছরের প্রাচীন। খ্রীস্টীয় প্রথম শতাব্দীর গ্রীক ভৌগোলিক ও পর্যটক টলেমি বাদামি, কলকেরি, মুদ্‌গল প্রভৃতির অনুরূপ এমন কতগুলি স্থানবাচক নামের উল্লেখ করেছেন যার কয়েকটি বিশুদ্ধ কন্নড শব্দ। কর্ণাটকের একটি অঞ্চল বিশেষের নাম 'পুন্নাত'। টলেমির রচনায় এই খাঁটি কন্নড শব্দটি হয়েছে 'পৌন্নড'। ২০০ খ্রীস্টাব্দে হালরাজ সংকলিত প্রাকৃত শ্লোক সংগ্রহে বহু কন্নড শব্দের উল্লেখ রয়েছে। কন্নড দেশ বোঝাতে মহাভারতে একাধিক-বার কর্ণাটক ও কুণ্ডল শব্দের ব্যবহার পাই। পাণিনী ব্যাকরণে কর্ণাট কর্ণাটকরূপে উল্লিখিত। খ্রীস্টীয় অব্দের গোড়ার দিকে রচিত তামিল ভাষার অন্যতম প্রাচীন কাব্যগ্রন্থে কর্ণাটক-নিবাসী বোঝাতে 'করুণাডগন' কথাটির প্রয়োগ আছে। কর্ণাটক শব্দটির উৎপত্তি নিয়ে বিস্তর গবেষণা হয়েছে। যেমন, কালোমণির দেশ 'কবুনডু' অথবা ফুলের ও চন্দনকাঠের দেশ 'কম্মিটু নাডু' থেকে সংস্কৃত রূপ কর্ণাটক। বর্তমান লেখকের মতে কর্ণাটকের মূলে আছে উচ্চ অথবা বৃহৎ দেশবোধক শব্দ 'করুনাডু'। করুনাডুর সংক্ষিপ্ত-রূপ কন্নাডুর থেকে কালক্রমে কন্নাডু এবং অবশেষে কন্নড শব্দের উদ্‌ভব।

কন্নড বলতে ভাষা ও দেশ দুই-ই বোঝায়। পরবর্তীকালে কন্নড থেকে কানাড়া এবং সর্বশেষে পাশ্চাত্যবাসীদের কণ্ঠে সম্ভবত পর্তুগীস্ শব্দের উচ্চারণ সাদৃশ্যে ক্যানারিস্ শব্দের সৃষ্টি।

কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে কন্নড ভাষায় রচনা শুরু হয় খ্রীস্টীয় প্রথম শতকে অথবা আরও কিছু আগে। তবে আমাদের হাতে যে সব বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষ্য প্রমাণ রয়েছে তার ভিত্তিতে বলা যায় খ্রীস্টীয় পঞ্চম শতাব্দী থেকেই কন্নড রচনার সূত্রপাত। সম্রাট অশোকের আমল থেকেই কন্নডদেশে সংস্কৃত ও প্রাকৃতে লিখিত তাম্রশাসন ও শিলালিপির সন্ধান পাই। তবে কন্নডলিপি ও কন্নড ভাষায় লিখিত শিলালিপির খোঁজ পাওয়া যায় কিছু পরবর্তীকালে —প্রথম দিককার খ্রীস্টীয় শতাব্দীগুলিতে। কন্নড ভাষায় প্রাচীনতম তাম্রশাসন পাওয়া যায় হাল্‌মিডি নামক স্থানে এবং তার রচনাকাল ৫০০ খ্রীস্টাব্দ। এই তাম্রশাসন থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে পঞ্চম শতাব্দীর আগেই কন্নড একটি মার্জিত ভাষার স্তরে উন্নীত হয়েছে এবং এই ভাষার উপর সংস্কৃতের প্রভাবও যথেষ্ট পড়েছে। এই তাম্রশাসনে কিছু প্রাচীনতর কন্নডরূপও লক্ষিত হয়। ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীর বেশ কিছু সংখ্যক কন্নড শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। তাদের কোনো কোনোটি সাহিত্যগুণযুক্ত। তাতে কিছু কিছু অচলিত রূপেরও সন্ধান পাওয়া যায়।

ষষ্ঠ শতকে যে কন্নড গ্রন্থাদি রচিত হয়েছিল তার নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া গেছে। প্রাচীনতম প্রাপ্ত গ্রন্থের নাম 'কবিরাজ মার্গ (কবিদের রাজপথ)। রচনাকাল ৯০০ খ্রীস্টাব্দ। এই গ্রন্থ এবং অন্যান্য গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে ৫০০ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি সময় থেকে কন্নড ভাষায় গ্রন্থ রচিত হয়ে আসছে। মোটের উপর একথা বেশ জোর দিয়ে বলা যায় যে ভাষা হিসাবে কন্নড গত দু'হাজার বছর ধরে প্রচলিত এবং বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে কন্নড আজ একটি পূর্ণ বিকশিত ভাষায় পরিণত। এই ভাষায় যে বিশাল ও বিচিত্র সাহিত্য গড়ে উঠেছে তাও অন্তত দেড় হাজার বছরের পুরানো। এমনকি যদি আধুনিককালে প্রাপ্ত উপাদানের হিসাবেও বলা যায় তবে কন্নড সাহিত্যের সূচনা হাজার বছর আগে।

তামিল, তেলুগু ও মালয়লম্ সহ কন্নডও দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। এই ভাষা চারটির উৎপত্তিস্থল অভিন্ন এবং আজও এরা শব্দ-সম্ভার ও

ব্যাকরণের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে পরস্পরসম্পৃক্ত। এই ভাষাগুলি সংস্কৃত থেকে বিভিন্নরূপে বৃদ্ধিলাভ করেছে সন্দেহ নেই, তবু তারা সংস্কৃত থেকে উদ্ভূত একথা বলা ঠিক হবে না। তাহলে এই ভাষাগুলির এবং অনুরূপ অন্য ভাষাগুলির জননীস্থানীয় কে? কারও কারও মতে এই গোষ্ঠীর প্রাচীনতম ভাষা তামিলই এদের জননীস্থানীয়। দ্রাবিড় কথাটি তামিল কথাটিরই সংস্কৃত রূপ। কিন্তু একথাও স্বীকৃত সত্য যে কন্নড ও অন্যান্য দ্রাবিড় ভাষায় এমন সব শব্দ পাওয়া যায় যা তামিল থেকেও প্রাচীনতর। সুতরাং আমাদের জ্ঞানের বর্তমান অবস্থায় এই কথা মেনে নেওয়াই সমীচীন যে তামিল থেকে ভিন্ন হলেও তামিলের কাছাকাছি একটি আদি-দ্রাবিড়ভাষা থেকেই কন্নড এবং এই গোষ্ঠীর অন্য ভাষাও কি উদ্ভূত হয়ে পরে পৃথক হয়ে পড়ে। তারা সকলেই অবশ্য তাদের নিজস্ব বিকাশের ধারায় সংস্কৃত থেকে অল্প-বিস্তর সাহায্য গ্রহণ করেছে।

দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষাসমূহের মধ্যে তামিলের সঙ্গেই কন্নডর নিকট সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধ আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে যদি আধুনিক কন্নড থেকে প্রাচীন কন্নডর দিকে ফিরে তাকানো যায়। তেলুগুর সঙ্গে কন্নডর সম্বন্ধ কিন্তু তেমন ঘনিষ্ঠ নয়। একই জননীসমা ভাষা থেকে উদ্ভূত হলেও ভাষা সমষ্টির আন্তঃ-সম্পর্কের মূলে অনেক কারণ থাকে। প্রধান কারণ অবশ্য সান্নিধ্যের তারতম্য, এবং এই তারতম্যও খানিকটা স্থান ও কালের উপর নির্ভরশীল। এর উপর অবশ্য মানুষের কোনো হাত নেই। একটি বিশেষ গোষ্ঠীর যে সাদৃশ্যটি সকলের থেকে বিচ্ছিন্ন দূরবর্তী স্থানে গিয়ে স্বতন্ত্র জীবন যাপন করে, পরিবারের অন্য সকলের সঙ্গে তার সম্পর্ক লুপ্ত হলে ক্রমশ সে নতুন পরিবেশের প্রভাবাধীন হয়। এই দিক থেকে দেখতে গেলে কথাটা মানতেই হবে যে মূল ভাষাগোষ্ঠী থেকে প্রথম বিচ্ছিন্ন হয় তেলুগু, তারপরে তামিল ও কন্নড এবং আরও পরে মালয়লম্‌ ভিন্ন হয়ে পড়ে তামিল থেকে। এই সঙ্গে যেমন বিবেচ্য ভৌগোলিক, রাজনৈতিক কারণগুলি তেমনি অনুধাবনযোগ্য অন্যান্য ভাষার সংস্পর্শ ও প্রভাবের প্রকৃতি ও পরিমাণ। মূলভাষা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরে কন্নডর কী রূপ ছিল তা নির্ণয় করার মতো কোনো উপাদান আমাদের হাতে এসে পৌঁছয়নি। যৎসামান্য প্রাপ্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ থেকে আমরা কেবল এইটুকু অনুমান করতে পারি যে সে ভাষা ছিল পুরানো কন্নডর প্রাচীনতর রূপ যা

ছিল তামিলের কাছাকাছি। কেবল কথ্য ভাষারূপে প্রচলিত সেই প্রাচীনতর কন্নডর মধ্যে সংস্কৃত বা প্রাকৃতের উপাদান থাকা সম্ভব ছিল না। পরবর্তী-কালে মার্জিত সাহিত্যিকশৈলী নিয়ে লিখিত কন্নডর বিকাশের যুগে হয়তো সচেতন ভাবেই সংস্কৃতেও প্রাকৃতের প্রভাব পড়ে থাকবে।

কন্নডভাষার সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের সূচনা শিলালিপির অধ্যয়ন থেকে। তখনকার দিনেই সংস্কৃত ও প্রাকৃতের প্রভাব শুরু হয়ে গেছে। তার আগেকার ভাষাপ্রকৃতি নিয়ে কেবল অনুমানই করা চলে। কিন্তু অসংখ্য শিলালিপি ও গ্রন্থাদি থেকে আমরা জানতে পারি কন্নড কীভাবে বিকাশ লাভ করেছে এবং প্রথম প্রাপ্ত শিলালিপির পর থেকে কতটা তার পরিবর্তন ঘটেছে। এই সমস্ত উপাদান বেশির ভাগ লিখিত কন্নড থেকে প্রাপ্ত। যদিচ এই বিশাল লিখিত সাহিত্যের মধ্যে কথ্য কন্নডর সামান্য আভাস পাওয়া যায়, তার বৈচিত্র্য ও সমৃদ্ধির কোনো পরিচয় পাই না। সুতরাং একথা মনে রাখা আবশ্যক যে যখন আমরা কন্নডর বিকাশের কথা বলি, তখন আমাদের মনে থাকে তার লিখিতরূপ যার শৈলী কথ্য নয়, অল্পবিস্তর সাহিত্যিক। এটা কেবল আধুনিককালেই সম্ভব হয় যে সাহিত্যের মধ্য দিয়ে আমরা তার লিখিত রূপের সঙ্গে কথ্যভাষার প্রকৃতিও বুঝতে পারছি। ভাষার গতিশীলরূপের সম্পূর্ণ অধ্যয়নের উপাদান বর্তমান যুগে সুলভ্য।

এখানে আমরা ভাষার কথ্য ও মার্জিত রূপের সম্বন্ধ নিয়ে কয়েকটা সাধারণ মূলনীতির কথা বলতে পারি। কথ্য ভাষায় স্থিরত্ব ও ঔজ্জ্বল্য এনে মার্জিত ভাষা সৃষ্টির ফলে এই শেষোক্ত ভাষা কখনো কখনো কৃত্রিম ও আড়ষ্ট বোধ হলেও এর ভিত্তি কিন্তু থাকে কথ্যরীতিতে। কথ্যভাষায় যে গতিতে পরিবর্তন ঘটে না, সাহিত্যিক ভাষায় সেরকম ঘটে না বিশেষ করে ভারত-বর্ষের মতো ঐতিহ্যশীল দেশে। কথ্যরীতি যখন এগিয়ে চলে, সাহিত্যিক রীতি তার একগুঁয়ে অহঙ্কার নিয়ে পিছিয়ে থাকে। যখন এই দুই রীতির ব্যবধান ক্রমশই বেড়ে যায়, তখন প্রবল প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, যার ফলে এই দুই রীতিকে কাছাকাছি আনার উগ্র প্রয়াস চলে। সেই উগ্রতার ফলে বিপরীত প্রতিক্রিয়ায় আবার তারা বিচ্ছিন্ন হয়। পরিবর্তনের এই সাধারণ নিয়ম কন্নড সম্পর্কেও প্রযোজ্য। তবু বলা যায়, কন্নড দুই বিপরীত মেরুবিন্দুকে এড়িয়ে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মধ্যে একটা সামঞ্জস্য সৃষ্টির চেষ্টা করেছে।

অগ্রণী লেখকবৃন্দ তাঁদের সমকালীন কথ্যরীতির উপর ভিত্তি করে সাহিত্যিক রীতিকে রূপায়িত করেন। সত্য বটে তাঁরা সংস্কৃত ভাষার সৌন্দর্যে ও ঐশ্বর্যে মুগ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু তা বলে তাঁরা কখনো কন্নডর নিজস্ব প্রকৃতিকে বিসর্জন দেননি। কালক্রমে কিছু অল্পশক্তিমান কবি পাণ্ডিত্যের মোহে মুগ্ধ হয়ে সংস্কৃতের দ্বর্থ্যক শব্দসম্ভারে আত্মহারা হয়ে দৈনন্দিন জীবনের ভাষা থেকে অনেক দূরে সরে যান। এই বাড়াবাড়ির প্রতিক্রিয়ায় অন্য কিছু কবি জনভাষার পতাকা তুলে ধরেন। সেই ভাষাই ক্রমে মার্জিত ও সাহিত্যিক রূপ পেলেও তাতে কৃত্রিম বা আড়ষ্ঠতা বড় একটা ছিল না। তথাপি একথা স্বীকার্য যে আধুনিককালে যা দেখা যাচ্ছে তাতে না বলে উপায় নেই যে কন্নড ভাষার সাধু ও চলিত রূপের মধ্যে ব্যবধানটা একটু বেশিই।

স্থূলভাবে বলতে গেলে কন্নড সাহিত্য রীতির দুটি ভেদ—প্রাচীন কন্নড ও নবীন কন্নড। প্রথম রূপটির প্রচলন ছিল নবম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত। অতঃপর শুরু হয় নতুন কন্নডর যুগ যার ক্ষীণ আভাস একাদশ শতাব্দীতে পাওয়া গেলেও নির্দিষ্ট রূপ দেখা যায় দ্বাদশ শতকে। নতুন কন্নড প্রাচীন ভাষাকে সম্পূর্ণ স্থানচ্যুত করে নি। দ্বাদশ-ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকেও কিছু কিছু গ্রন্থ পুরানো ভাষায় রচিত হয়। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে এই ভাষা গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। পুনরায় সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে মৈসূর (মাইসোর) মহারাজের পৃষ্ঠপোষকতায় পুরানো ভাষার পুনরভ্যুদয় ঘটে। ঊনবিংশ এবং বিংশ শতকে নবীন কন্নড তার যোগ্য মর্যাদা লাভ করে।

এতৎ সত্ত্বেও কন্নড ভাষার ইতিহাসকে প্রাচীন ও নবীন এরকম দুটি যুগে ভাগ করা সঙ্গত নয়। একথা ঠিক যে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রাধান্য বিস্তার করে ছিল প্রাচীন কন্নড। কিন্তু এই যুগকে প্রাচীন কন্নডর যুগ নামে অভিহিত করলে মনে হতে পারে, এই যুগের শেষে প্রাচীন ভাষার অবলুপ্তি ঘটেছে। তা কিন্তু সত্য নয়। তাছাড়া, পুরানো কন্নডর কিছু কিছু উপাদান নতুন কন্নডর সঙ্গে বিভিন্ন মাত্রায় এমন ভাবে মিশে গেছে যে এই দুই ভাষার দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধানের কথা ভাবা যায় না। পুরানো কন্নডর গুণ স্পষ্টতা ও সংক্ষিপ্ততা। এর ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য কিছু বিভক্তি প্রত্যয় ও ধাতুরূপে নিবদ্ধ হলেও প্রকৃতার্থে এই ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্যের অনেক গুণ সামান্য কিছু রূপান্তর সহ নবীন ভাষাতেও রয়ে গেছে। আসলে প্রাচীন ও নবীন কন্নডর

প্রধান পার্থক্য মূল শব্দের সঙ্গে বিভক্তি প্রত্যয়ের যোগসাধনে এবং শব্দের অন্তিম রূপ গঠনে। প্রাচীন কন্নডর মূল শব্দগুলি প্রধানত ব্যঞ্জনান্ত, নবীন কন্নডয় তারা স্বরান্ত। প্রাচীন কন্নডর সংক্ষিপ্ততা আরও ঘনীভূত হয় কন্নডর বিশেষ বিশেষ সন্ধিনিয়মের জন্য যা সংস্কৃত সন্ধি থেকে পৃথক। সন্ধির ফলে ভিন্ন ভিন্ন শব্দ এমনভাবে জুড়ে যায় যে প্রায়ই তাদের একক শব্দ বলে মনে হয়। নতুন কন্নডর যে এরকম শব্দমিশ্রণ নেই তা নয়। কিন্তু স্বরান্ত শব্দের প্রভাবে নতুন ভাষায় সংক্ষিপ্ততা কম। পুরানো আর নতুন কন্নডর পার্থক্যসূচক আরও কিছু বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হচ্ছে।

প্রাচীন কন্নড	নবীন কন্নড
বিষমোচ্চারিত যুক্তব্যঞ্জন (ইর্দম্)	সমোচ্চারিত যুক্তব্যঞ্জন (ইদ্দনু)
'ন ধ্বনি যুক্ত শব্দ (কূন্দল্)	'ন' ধ্বনি বর্জিত শব্দ (কূদলু)
'প' ধ্বনির ব্যবহার (পাল্)	'প' ধ্বনির পরিবর্তে 'হ' ধ্বনি (হালু)
প্রাচীন 'র' ও 'ল'-এর ব্যবহার (কেরে, মালে)	প্রাচীন 'র' ও 'ল'-এর লোপ (কেরে, মালে)

প্রাচীন কন্নডর অন্যতম বৈশিষ্ট্য নামবাচক শব্দের সঙ্গে ধাতু-প্রত্যয় যুক্ত করে ক্রিয়াপদ গঠন করা। যেমন, 'কেশবন্' পদের সঙ্গে 'এন্' প্রত্যয় যোগে গঠিত 'কেশবনেন্' কথাটির তাৎপর্য 'আমি হলাম কেশব'। এইভাবে 'পিরিয়র' (বয়স্ক ব্যক্তি) পদের 'এর্' প্রত্যয় যোগে গঠিত 'পিরিয়রের্' (আমরা হলাম বয়স্ক ব্যক্তি)।

এক শ্রেণীর পণ্ডিতের মতে 'পুরানো কন্নড'র আগে এই ভাষার আর একটি স্তর ছিল যাকে বলা যায় 'প্রাচীন পুরানো কন্নড'। আর একদল পণ্ডিত মনে করেন 'নতুন কন্নড'র আগে এই ভাষার আর একটি স্তরকে বলা যায় 'নডুগন্নড' (মধ্যকন্নড)। যদি আমরা পুরানো ও নতুন কন্নডর সঙ্গে প্রাচীনতর ও মধ্য কন্নড মেনে নিই তাহলে সব সুদ্ধ স্তর হল চারটি। ভাষা হিসাবে কন্নডর বিকাশে বিভিন্ন স্তরের কথা বলার আগে স্তর বলতে আমরা কী বোঝাতে চাইছি তা বলা আবশ্যক। প্রতিটি ভাষার ক্ষেত্রেই মাঝে মাঝে পরিবর্তন দেখা দেয়। প্রধান প্রশ্ন হল পরিবর্তনের কিরূপ প্রকৃতি ও পরিমাণকে আমরা একটা স্তর বলে গণ্য করতে পারি। সমস্ত ভাষা সম্পর্কে সমভাবে প্রযোজ্য হবে এমন সূত্রাবলী নির্ণয় করা সহজ নয়। তবে

নীতি-নির্দেশের সহায়করূপে কয়েকটি সাধারণ সূত্রের কথা বলা চলে। ভাষার পরিবর্তন সেই ভাষার লোকের দৃষ্টি সহজে আকর্ষণ করে না। দৃষ্টি আকর্ষণের মতো পরিবর্তন ঘটলেই ভাষার একটি নতুন স্তর এসে গেছে বলা যায়। এই হল একটা সূত্র। কিন্তু কথাটা খুব স্পষ্ট নয়। প্রশ্ন ওঠে—কোন্ ধরনের পরিবর্তন দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং কার দৃষ্টি? কোন্ সময়েই বা বলা যায় যে ভাষার বিকাশে একটা স্তর এসে গেছে? এ প্রশ্নগুলির উত্তর পাওয়া দরকার। বিস্তৃত আলোচনায় না গিয়ে সংক্ষেপে বলা যায়, কোনো একটা ভাষায় পরিবর্তন যখন গভীর ও স্থায়ী হয়, তখনই একটা নতুন স্তরের শুরু বলে চিহ্নিত হতে পারে। তখন তা সর্বজনগ্রাহ্য একটা ঐতিহ্যের মর্যাদা লাভ করে। এইরূপ ঘটার আগে একটা যুগসন্ধির স্তর আছে যাকে স্তর না বলে স্তরের আগমনী বলা চলে। এটা হল পরীক্ষা-নিরীক্ষার যুগ। তার সব-গুলি সর্বজনগ্রাহ্য হয় না, মাত্র কয়েকটি কালের বিচারে বেঁচে থাকে এবং দৃঢ়মূল হয়। এইভাবে যুগসন্ধির স্তরে পুরানো ও নতুন রূপের মিশ্রণে গড়া একটা অনিশ্চয়তার ভাব লক্ষ করা যায়। প্রত্যেক ভাষার পাশেই অপরিহার্য পরিবর্তন ও সুস্থিতি। যুগসন্ধির স্তরে বড় হয়ে ওঠে পরিবর্তন, আর সত্যিকার স্তরে প্রাধান্য লাভ করে সুস্থিতি। এই নতুন স্তর সূচনার পূর্বে তার আগমনস্বরূপ কিন্তু পরিবর্তনের পদসঞ্চার ঘটে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত পরি-বর্তনের পরে সুস্থিতি না আসে, ততক্ষণ তাকে স্তর আখ্যা দেওয়া চলে না।

উল্লিখিত অভিমত সত্য হলে কন্নড ভাষার মাত্র দুটি স্তর—পুরানো ও নতুন কন্নড। প্রাচীনতর এবং মধ্যবর্তী কন্নড ঠিক স্তর নয়, যুগসন্ধির সূচক-মাত্র। প্রাচীনতর কন্নড প্রকৃতপক্ষে পুরানো কন্নডর ঈষৎ পূর্ববর্তী রূপ, যার বৈশিষ্ট্যগুলি পুরানো কন্নড থেকে ঝরে গেছে। যেগুলি ৬০০ থেকে ৮০০ খ্রীস্টাব্দের শিলালিপিতেই কেবল পাওয়া যায়। সে যুগের কোনো লিখিত গ্রন্থ অদ্যাবধি পাওয়া যায় নি। তাছাড়া লক্ষ করা গেছে যে পুরানো কন্নডর মাঝে মাঝে প্রাচীনতর কন্নডর রূপ মিলেমিশে আছে। প্রাচীনতর কন্নডর একটা মুখ্য বৈশিষ্ট্য ধাতুরূপ ও শব্দরূপে স্বরধ্বনির সম্প্রসারণ। সুদূর অতীতকালের কথ্যভাষার স্মৃতিচিহ্নরূপে এবং বাক্-ঐশ্বর্যের প্রতীকরূপে এগুলি পুরানো কন্নডয় ঢুকে পড়েছে। পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্তরে কিছুকাল বেঁচে থেকে পরে এগুলি লুপ্ত হয়ে যায়। মধ্যবর্তী কন্নডর যে ব্যঞ্জনান্ত

ধ্বনির স্বরান্তধ্বনিতে পরিণত হওয়ায় প্রবণতা দেখা যায়, সেটা নতুন কন্নডর পূর্বাভাস। মোটের উপর বলা যায়, প্রাচীনতর ও পুরানো কন্নডর যে সম্পর্ক, মধ্যযুগীয় ও নতুন কন্নডর সম্পর্কটাও তদনুরূপ।

কথায় বলে, যোজনে যোজনে নতুন ভাষা। অঞ্চল ভেদে একই ভাষার ধ্বনি, শব্দে ও অর্থে প্রভেদ ঘটে। একথা অতীতের কন্নড সম্পর্কে যেমন সত্য, আজকের কন্নড সম্পর্কেও তেমনি সত্য। নবম শতব্দীর 'কবিরাজ মার্গ' কন্নড ভাষায় অলঙ্কার শাস্ত্র বিষয়ক প্রথম গ্রন্থ। তাতে বলা হয়েছে যে বহু ভাষাবিৎ ভগবান আদিশেষও বুঝতে পারেননি তৎকালীন কন্নড উপভাষা-গুলির মধ্যে কোন্‌টি শুদ্ধ, কোন্‌টি বা অশুদ্ধ। কথ্য-কন্নডর আক্ষরিক প্রভেদ যে এত বেশি বেড়ে গেছে তার প্রধান কারণ ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক কন্নডভাষীদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগের অভাবে এবং কর্ণাটকের সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলিতে অন্যান্য ভাষার প্রভাবে উপভাষাগুলি আরও পৃথক হয়ে পড়ে। কন্নডভাষীরা এক সময়ে একই শাসনকর্তৃত্বে যেভাবে ঐক্যবদ্ধ ছিল, বিজয়নগর সাম্রাজ্যের পতনের পরে তাদের সেই ঐক্য বিনষ্ট হয়। প্রাচীন মৈসুর ছাড়া কর্ণাটকের বাকি অংশে কন্নডভাষা ও সংস্কৃতি হতাদর হয়ে পড়ে। সীমান্ত অঞ্চলে অন্যান্য ভাষার (মারাঠী, তামিল, তেলুগু, উর্দু) অত্যধিক প্রভাবে কন্নড তার নিজস্ব শক্তি হারিয়ে ফেলে। বিস্ময়ের কথা এই যে 'কবিরাজ মার্গ'-এর মতো গ্রন্থ রচিত হওয়ার একহাজার বছর পরে আজও আমরা কর্ণাটকে বহু কন্নড উপভাষার কথা শুনতে পাই। পূর্বের তুলনায় কথাটা আজ অধিকতর সত্য মনে হয়, 'কবিরাজ মার্গ'-এর লেখক ভবিষ্যদ্‌বক্তার দিব্য দৃষ্টি নিয়ে বইটি লিখেছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে বর্তমান শতকের সূচনায় কন্নডভাষীদের মনে নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর উন্মেষ ঘটেছে এবং তাদের নিরন্তর প্রয়াসের ফলে কর্ণাটক ভারতবর্ষের অঙ্গরাজ্য রূপে একক শাসন-কর্তৃত্বের অধীনে এসে গেছে। কন্নডভাষীদের পারস্পরিক সান্নিধ্যের ফলে কন্নড-উপভাষাগুলিও কাছাকাছি আসার সুযোগ পেয়েছে, এবং আশা করতে বাধা নেই যে অদূর ভবিষ্যতে সাহিত্যিক ভাষার ঐক্য কথ্যভাষার মধ্যেও দেখা দেবে। কর্ণাটকের মানুষ এতদিন কেন কোনো রাজপরিবারের সন্তানদের মতো উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে ছিল। বিধাতা পুনরায় আজ তাদের ঐক্যসূত্রে বেঁধে দিয়েছেন।

দ্রাবিড় গোষ্ঠীর প্রধান প্রধান ভাষা হল তেলুগু, তামিল, কন্নড ও মালয়লম্। উপভাষা থেকে এগুলি ধীরে ধীরে লিখিত ভাষারূপে বিকশিত হয়েছে। এই গোষ্ঠীর অন্য কয়েকটি ভাষা বিকাশের সুযোগ না পেয়ে উপভাষার পর্যায়েই রয়ে গেছে। এই উপভাষা সমূহের মধ্যে কন্নডভাষীর অধিকতর নিকটবর্তী হল তুলু, কোডগু, হব্যাক, তোট, কোট ও বডগ। প্রশ্ন হতে পারে—এর সবগুলিই কি কন্নডর উপভাষা? অথবা অঞ্চলভেদে কন্নডর ভিন্নরূপ মাত্র? যাই হোক, সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে সাহিত্যিক মর্যাদা লাভের সুযোগ এদের হয়নি। কন্নডভাষার প্রাচীনতম রূপের ঐতিহাসিক অধ্যয়ন ও গবেষণার ক্ষেত্রে এই উপভাষাগুলি যথেষ্ট সহায়ক হতে পারে। আধুনিক কালের কন্নডিগ (কন্নডভাষী) এই সব উপভাষা পুরোপুরি বুঝতে পারে না। কয়েকটি তো তার কাছে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাষা বলেই মনে হতে পারে। দক্ষিণ কানারা অর্থাৎ কর্ণাটকের মঙ্গলূর্ (ম্যাঙ্গালোর) জেলায় প্রধানত বলা হয় তুলু। কোডগু চলে কুর্গ অঞ্চলে। দক্ষিণ এবং (বিশেষ করে) উত্তর কানারায় চলে হব্যাক। প্রাচীন কন্নড-র স্পষ্ট নিদর্শন এই উপভাষায় আজও রক্ষিত। তোড, কোট এবং বডগ বলা হয় নীলগিরি বা উটকামণ্ড্ (উদকমণ্ডল) অঞ্চলের আদিবাসীদের মধ্যে। এই তিনটি উপভাষার মধ্যে বডগ র বেশ মিল দেখা যায় প্রাচীন কন্নডর সঙ্গে। যে বিশিষ্ট 'ৱ' ও 'ল' ধ্বনি আধুনিক কন্নড থেকে লুপ্ত হয়ে গেছে, সেই ধ্বনি দুটি এখনও বেঁচে আছে বডগ উপভাষার মধ্যে। কথাটা অদ্ভুত শোনালেও সত্য যে সুদূর বেলুচিস্তানে ব্রাহুই উপভাষা দ্রাবিড় উপাদানে পরিপূর্ণ। কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে ব্রাহুই অন্যান্য দ্রাবিড় ভাষার চেয়ে কন্নড ও তুলুর কাছাকাছি।[১] পরবর্তী গবেষণায় বিষয়টি প্রতিপন্ন হলে ব্রাহুইকেও কন্নডর অন্যতম উপভাষা বলে গণ্য করা যেতে পারে।

আগেই বলা হয়েছে, কন্নডর বিকাশে সংস্কৃত ও প্রাকৃতভাষা পুষ্টি দান করেছে। তার মানে এই নয় যে কন্নড ভাষার নিজস্ব বিকাশ ক্ষমতা ছিল না।

১. Denys Bray : The Brahui Language, Part II, p. 19 'Comparative Phonology thus points to Brahui being closer to Kanarese and Tulu, than to Tamil, Malayalam and Telugu, closer still Kurukh and Malto.'

তামিলের প্রাণশক্তি ছিল প্রচুর এবং তার প্রকাশও ঘটেছে নিজস্ব ধারায়। কন্নডও হয়ত তামিলের মতো সম্পূর্ণ নিজস্ব পথে গড়ে উঠতে পারত, কিন্তু ঘটনাক্রমে কন্নড বেছে নিয়েছে একটা মধ্য পথ। নিজস্ব শক্তির সঙ্গে কন্নড আহরণ করেছে সংস্কৃতের শ্রেষ্ঠ বস্তু। এখানেই দেখা যায় কন্নড সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত সমন্বয় শক্তির প্রকাশ।

অতীতে হয়তো কন্নড নিতান্ত প্রয়োজনবোধে সংস্কৃতের প্রভাব গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল। খুবই স্বাভাবিক যে একটা বিকাশোন্মুখ ভাষা পূর্ণ বিকশিত একটা সমৃদ্ধ ভাষা থেকে পুষ্টিলাভ করে থাকে। একথা ঠিক যে তামিলের মতো কন্নড তখনও কোনো বিকাশ লাভ করে নি। তাছাড়া এই সময়ে তামিলের সঙ্গে তার যোগাযোগও ছিল ক্ষীণ। এই সঙ্কটমুহূর্তে আর্য সংস্কৃতির আলোক-সংকেত রূপে সংস্কৃত এসে কন্নডর পথ আলোকিত করে। বিজ্ঞান ও পুরাণ, ধর্ম ও দর্শনের দাবী মেটাবার পক্ষে সংস্কৃতের শব্দসম্ভার ছিল বিপুল। কন্নড সেই শব্দসম্ভার অবাধে গ্রহণ করে। এইভাবেই সংস্কৃত ভাষার সাহায্যে কন্নডর সমুন্নতি ঘটে। তবে সাধারণভাবে বলা যায় যে কন্নড কখনো নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বিসর্জন দিয়ে সংস্কৃতের প্রতি মোহান্ধ হয়নি। এর একটি কারণ প্রাকৃতের সঙ্গে কন্নডর নিকট সম্বন্ধ। সংস্কৃত যেমন আবির্ভূত হয় বৈদিক ধর্মের ভাষারূপে, প্রাকৃতের তেমনি প্রবর্তন ঘটে বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের বাহনরূপে। কন্নড উভয় ভাষাকেই বরণ করে নেয়। জৈনধর্ম বিশেষভাবে কন্নডভূমিতে শিকড় বিস্তার করে দৃঢ়মূল হয় এবং কর্ণাটকের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে গভীর ছাপ ফেলে। জৈন সাধু ও পণ্ডিতেরা সংস্কৃত ও প্রাকৃত দুটি ভাষাতেই অভিজ্ঞ ছিলেন। তাঁরা সংস্কৃতের অনুরাগী ছিলেন, সংস্কৃতে তাঁদের পাণ্ডিত্য ছিল যথেষ্ট, কিন্তু সেই পাণ্ডিত্য ও অনুরাগ কখনো অন্ধ মোহে পরিণত হয়নি। কোনো কোনো জৈন সাধু প্রাকৃতে ধর্মগ্রন্থ পাঠ ও রচনায় অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন। এটা তাঁদের কাছে একরকম ধর্মবিধি ছিল যে ধর্মীয় আলোচনা হবে জনসাধারণের ভাষাতেই অর্থাৎ প্রাকৃতে। তাঁদের এমন কোনো দুর্বলতা ছিল না যে সংস্কৃত হচ্ছে দেবভাষা এবং সাহিত্য-চর্চার একমাত্র বাহন। ভাগ্যক্রমে এক্ষেত্রে তাঁরা শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতাও পেয়েছিলেন। বিদ্যা ও শাসনশক্তি এই শুভ যোগাযোগের ফলে কন্নডর সুষম

বিকাশ ঘটতে থাকে, এবং খুব অভাবনীয় রূপে প্রাচীনতর কালেই জন্ম লাভ করে কন্নড সাহিত্য দ্রুতবৃদ্ধির পথে এগিয়ে যায়।

দৈনন্দিন জীবনের কাজকর্মে কন্নড অনেকটা স্বাবলম্বী হলেও সংস্কৃত ছাড়া তার চলে না। যেমন জলের প্রতিশব্দ 'নীরু' তার নিজস্ব পদ, কিন্তু খাদ্যের প্রতিশব্দ 'অন্ন' সংস্কৃত। হালকা ভোজন বোঝাতে 'ফলাহার' কথাটাও তাই। ঘুমের প্রতিশব্দ সংস্কৃত থেকে আগত—নিদ্রা>নিদ্রে> নিদ্দে। দেব, ধর্ম, পাপ, পুণ্য প্রভৃতি এবং এই জাতীয় আরও অনেক সংস্কৃত শব্দ কন্নডভাষার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অতি প্রাচীনকালে 'অর' (ধর্ম), 'পোল্‌তু' (কাল), 'নেসর' (সূর্য) প্রভৃতি শব্দ প্রচলিত ছিল, কিন্তু কালক্রমে সংস্কৃতের প্রভাবে সেই সব শব্দ অপ্রচলিত হয়ে পড়ে। কেবল প্রাচীন গ্রন্থাদিতে অতীতের নিদর্শনরূপে সেগুলোর ব্যবহার সীমাবদ্ধ। অশিক্ষিত লোকের কথাবার্তায় সংস্কৃত শব্দাদির প্রয়োগ অপেক্ষাকৃত কম হলেও সংস্কৃতের প্রভাব সেখানেও কিন্তু গভীর ও স্থায়ী। সাধারণ লোকের বার্তারূপে যে সব সংস্কৃত শব্দ মূলরূপে অথবা বিকৃত আকারে স্থান পেয়েছে, তার কতগুলিকে অ-সংস্কৃত বলে চেনাই কঠিন।

আরও একটি বিষয় লক্ষণীয়। কন্নড ভাষায় ব্যবহৃত বেশ কয়েকটি সংস্কৃত শব্দের মূল অর্থ বদলে গেছে। কখনো কখনো ভিন্ন অর্থে, কখনো বা সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত হয়। শব্দার্থে এই পরিবর্তনের কারণ নির্ণয় করা দুঃসাধ্য নয়। একেবারে গোড়া থেকেই কবি ও সমালোচকদের মধ্যে এই মত প্রচলিত ছিল যে কন্নড ভাষায় সংস্কৃত শব্দসম্ভার ও ব্যাকরণগত উপাদান ধার করে নেওয়া একটা সীমারেখা টানা উচিত এবং ধার করা বস্তুকে কন্নডর নিজস্ব ধরনে মিলিয়ে নেওয়া উচিত। নবম শতাব্দীর গ্রন্থ 'কবিরাজ-মার্গ' সংস্কৃত থেকে আহৃত শব্দাবলীকে 'সমসংস্কৃত' আখ্যা দিয়েছে। আখ্যাটি অর্থবহ। 'সমসংস্কৃত' অর্থাৎ যে-সব সংস্কৃত শব্দকে কন্নড ভাষায় ব্যবহারের সময়ে 'সম' বা উপযুক্ত প্রক্রিয়ায় প্রয়োগ করা হয়েছে। মনে হয় কবিরাজমার্গের আগেও, এই প্রথা চালু ছিল। তবে কবিরাজমার্গে সুনির্দিষ্টভাবে প্রদত্ত এই নিয়ম পরবর্তী সকল কবিই মেনে চলার চেষ্টা করেন। কিন্তু একটা জীবন্ত ও বিকাশোন্মুখ ভাষাকে কঠিন নিয়মের বন্ধনে বেঁধে রাখাও মুশ্‌কিল। নিয়ম হলে তার ব্যতিক্রমও থাকবে। সংস্কৃতের যে

ক্রিয়া-বিশেষণাত্মক পদ বা পদগুলি সমাসবদ্ধ পদের অঙ্গীভূত না হলে কন্নড ভাষায় নিষিদ্ধ ছিল, সেগুলি ক্রমশ চালু হল। প্রথম প্রথম সংস্কৃত ও কন্নড শব্দের সমাস 'অরি-সমাস' বলে নিষিদ্ধ ছিল, পরে তা 'মিশ্র-সমাস' রূপে ব্যবহৃত হতে থাকে। সংস্কৃতের স্বরান্ত বা ব্যঞ্জনান্ত শব্দকে কন্নডভাষার উপযোগী করে বদলে নেওয়া হয়। যেমন, মালে (মালা), লক্ষ্মি (লক্ষ্মী), সরযু (সরযু), য়শ-য়স্পস্যু (য়শস্), দিব (দিব), বিদ্বাংস (বিদ্বান্), শ্রীমন্ত (শ্রীমান্), প্রশ্নে (প্রশ্ন) ইত্যাদি। সামান্য পরিবর্তনের সাহায্যে সংস্কৃত শব্দকে কন্নডায়িত করার এই হল একটি উপায়।

অন্য একটি উপায় হল কন্নড ধ্বনিতত্ত্বের নিয়ম অনুযায়ী বড় রকমের পরিবর্তন যাতে শব্দটিকে চেনা মুশ্‌কিল হয়ে পড়ে। প্রথম পর্যায়ের শব্দকে বলা হয় 'সমসংস্কৃত' (তৎসম) এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের শব্দকে বলা হয় অপভ্রংশ বা তদ্‌ভব। প্রকৃতপক্ষে তদ্‌ভব শব্দগুলিকে সমসংস্কৃত শব্দ গঠনের অন্তর্নিহিত নীতি-নিয়মের সম্প্রসারণ রূপে গণ্য করা চলে। নীতিধর্ম হল এই যে যখন একভাষা অন্য ভাষা থেকে শব্দ গ্রহণ করে, তখন সেই শব্দগুলিকে অধমর্ণ ভাষার বৈশিষ্ট্য ও ধ্বনিতাত্ত্বিক প্রকৃতি অনুসারে রূপান্তরিত করা হয়। এই নীতি অনুসারে সংস্কৃত শব্দের রূপগত পরিবর্তন ঘটিয়ে তার উপর কন্নড ভাষার ছাপ লাগিয়ে দিলে সেগুলি হয় তদ্‌ভব। সংস্কৃতের দৃষ্টিতে সেগুলি হয়ত অপভ্রংশ (বিকৃত) কিন্তু কন্নডর দৃষ্টিতে সেগুলি তদ্‌ভব। এই তদ্‌ভব শব্দরাজি কন্নড ভাষায় এতটা সহজ ও স্বাভাবিকভাবে মিশে গেছে যে কবি ও বৈয়াকরণদের চোখে সেগুলি দেশজ শব্দের মতোই 'অচ্চকন্নড' (খাঁটি কন্নড) রূপে গণ্য হয়। এইভাবে 'অচ্চকন্নড' কথাটির অর্থ আজ ব্যাপক হয়ে পড়েছে। একথা সুস্পষ্ট যে তদ্‌ভব শব্দের গঠন কতগুলি ধ্বনিতাত্ত্বিক নিয়মে নিয়ন্ত্রিত। যেমন, বিষম যুক্তব্যঞ্জন কখনো সমযুক্তব্যঞ্জনে কখনো বা বিশ্লিষ্ট ধ্বনিতে পরিণত হয় (সংস্কৃত>সক্কড, শ্রী>সিরি)। কখনো যুক্তব্যঞ্জনের একটি লোপ পায় (স্নেহ>নেহ, স্থান>তান)। 'য়' হয়ে যায় 'জ', 'শ' 'ষ' হয়ে যায় 'স' (য়মুনা>জমুনা, শশী>সসি, ঋষি>রিসি)। এইভাবে কন্নড উচ্চারণের উপযোগী করে এবং সময় সময় সংস্কৃতের তুলনায় মৃদুতর করে তদ্‌ভব শব্দগুলি গঠিত হয়েছে।

প্রশ্ন এই যে, তদ্‌ভব শব্দগুলি কন্নডতে এসেছে কি সোজা সংস্কৃত থেকে

অথবা প্রাকৃতের মাধ্যমে? তেলুগু ভাষার শব্দের শ্রেণীবিভাগ করা হয় চার উপায়ে—সংস্কৃতসম, সংস্কৃতভব, প্রাকৃতসম ও প্রাকৃতভব। কন্নড ভাষাতেও তদ্‌ভব শব্দের দুটি রূপ স্বীকৃত—প্রাকৃতসম ও প্রাকৃতভব।[১] মোটামুটিভাবে বলা যায়, বেশির ভাগ তদ্‌ভব শব্দ কন্নডতে এসেছে প্রাকৃত থেকে। কন্নড সাহিত্যের যাঁরা পথিকৃৎ সেই জৈন কবি ও পণ্ডিতেরা সংস্কৃত ও প্রাকৃত উভয় ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। তাঁরা উভয় ভাষার শব্দাবলীকে সহজ স্বাভাবিক রূপ দিয়ে কন্নড শব্দভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে গিয়েছেন। মনে হয় তদ্‌ভব শব্দের জন্য তাঁরা বিশেষভাবে সৌরসেনী প্রাকৃতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। বেশিরভাগ তদ্‌ভব শব্দকে 'প্রাকৃতভব' আখ্যা দেওয়াই সমীচীন। প্রাকৃত থেকে অভিন্ন শব্দগুলিকে 'প্রাকৃতসম' এবং অন্যগুলিকে 'প্রাকৃতভিন্ন' বলাই সঙ্গত। তাছাড়া অন্যান্য ভাষা থেকে স্বল্পসংখ্যক শব্দকেও তদ্‌ভব বলা হয়ে থাকে। এই জাতীয় শব্দ বেশির ভাগ এসেছে তামিল থেকে। 'অরস' (সংস্কৃত 'রাজন্', তামিল অরসন্), 'এণি' (সংস্কৃত শ্রেণী, তামিল 'এনি')।

কন্নড ভাষায় লেখার কাজ শুরু হওয়ার পর থেকে কন্নড অভিধান বিভিন্ন ভাষার শব্দ-সম্ভারে সমৃদ্ধ হয়েছে। তার মধ্যে গোড়ার দিকে সংস্কৃত ও প্রাকৃত শব্দই প্রধান। পরে এসেছে মারাঠী, আরবী, ফার্সী, উর্দু ও ইংরেজী, তামিল, তেলুগু এবং অন্যান্য দ্রাবিড় ভাষার কাছেও কন্নড ঋণী। যে কোনো বর্ধিষ্ণু ভাষার পক্ষেই বিদেশী ভাষা গৃহীত শব্দ কিছু অগৌরবের নয় যদি না তা ভাষার নিজস্ব রূপকে ব্যাহত করে। এক হাজার বছরেরও অধিক কাল ধরে কন্নড এক্ষেত্রে একটা ভারসাম্য বজায় রেখে এসেছে। তবু এ কথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে কন্নডভাষীরা যে অন্য ভাষা থেকে আহরণের জন্য বাতিকগ্রস্ত হয়ে আত্মনির্ভরশীলতা হারিয়ে ফেলেছে, তার কারণ অবশ্য ইতিহাসের বিশেষ বিশেষ যুগে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে তাদের দুর্বলতা। কন্নডর বিকাশের কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংস্কৃত যেমন সহায়ক হয়েছে, তেমনি বাধারও সৃষ্টি করেছে। বর্তমানে সংস্কৃতের স্থান নিয়েছে ইংরেজী। কন্নড যদি প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে আত্মস্থতার মিলন ঘটাতে না পারে, তবে মানসিক ভারসাম্য বজায় রেখে অগ্রসর হওয়া কঠিন হবে।

১. R. Narasimhacharya : History of Kannada Language, pp. 116-7

বিশেষজ্ঞদের মতে ভারতীয় বর্ণমালার উৎস হল ব্রাহ্মীলিপি। ভারতীয় ভাষাগুলি সমগোষ্ঠী থেকে উদ্‌ভূত না হয়েও যেমন অল্পবিস্তর সংস্কৃতের দ্বারা প্রভাবিত, তেমনি সমস্ত বর্ণমালার মূলে রয়েছে ব্রাহ্মীলিপি। এটি ভারত-বর্ষের অন্যতম ঐক্য বিধায়িনী শক্তি। ব্রাহ্মীলিপির প্রাচীনতম রূপ পাওয়া যায় সম্রাট অশোকের তাম্রশাসনে। দেবনাগরী এবং দ্রাবিড়ভাষার বর্ণমালা অশোকলিপিরই পরিবর্তিত রূপ। দ্রাবিড় লিপির মধ্যে কন্নড ও তেলুগু লিপি ছিল প্রায় অভিন্ন। মুদ্রণ যন্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ার পর কন্নড ও তেলুগু লিপিতে কিছু ইতর বিশেষ ঘটে। তামিল ও কন্নডলিপির মধ্যে মিল নেই বললেই চলে। যেমন ভাষার দিক থেকে কাছাকাছি কন্নড ও তামিল, তেমনি লিপির ও বর্ণমালার দিক থেকে কাছাকাছি কন্নড ও তেলুগু। মনে হয় আদি দ্রাবিড় গোষ্ঠী থেকে তেলুগু বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরে কন্নড ও তামিলের মধ্যে সুদীর্ঘকাল ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। কন্নড ও তামিল ভাষার দিক থেকে পৃথক হলেও তাদের লিপিগত সাদৃশ্যের একটা বড় কারণ বোধ করি একই শাসনাধীনে এই দুটি ভাষার পাশাপাশি অবস্থান। বিশেষ করে লক্ষণীয় বিজয়নগর সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধির যুগে কন্নড ও তেলুগু ভাষীদের রাজনৈতিক মিল।

বিগত দেড় হাজার বছরে কন্নড লিপির বহু রূপান্তর ঘটেছে। বর্ণমালার যে অক্ষরগুলি ছিল রৈখিক ও কৌণিক, সেগুলি পরে হয় গোল ও লতানো। এই পরিবর্তনের একটি কারণ এই যে পূর্বকালে তালপাতায় লেখার রীতি প্রচলিত ছিল। প্রাচীন শিলালিপির দিকে তাকালে তাদের বর্ণমালার শিল্প সুষমায় মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়। কন্নড তথা সংস্কৃত শব্দ লেখার সমস্ত চিহ্নই (প্রতীকই) কন্নড বর্ণমালায় বর্তমান। সংস্কৃতের মতো কন্নড বর্ণমালাতেও ঘোষবদ্‌ ব্যঞ্জন, অঘোষ ব্যঞ্জন, হিস্‌ধ্বনিযুক্ত ব্যঞ্জনের জন্য পৃথক পৃথক বর্ণ আছে। আবার দ্রাবিড় ভাষাসমূহের কবিতায় বিশিষ্ট ধ্বনিবোধক প্রতীক বা চিহ্নও রয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন দ্রাবিড় ভাষায় মহাপ্রাণ ধ্বনি না থাকার জন্য কন্নড বর্ণমালা থেকে মহাপ্রাণ বর্ণগুলিকে বাদ দেওয়া চলে। কিন্তু আমাদের মনে হয়, কন্নডভাষায় মহাপ্রাণ ধ্বনি রয়েছে যদিও তাদের সংখ্যা বেশি নয়। যাই হোক, কন্নড বর্ণমালায় মহাপ্রাণ বর্ণের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না।

দ্বিতীয় অধ্যায়
প্রাচীন যুগ ১
কন্নড সাহিত্যের সূচনা

কন্নড সাহিত্যের সূচনাকাল সম্পর্কে প্রথম অধ্যায়ে কিছু আভাস দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে বিষয়টি নিয়ে বিশদ আলোচনা করা যেতে পারে।

প্রত্যেক ভাষাতেই সাধারণত গান ও গল্পের একটা স্বতঃস্ফূর্ত মৌলিক ঐতিহ্য থাকে। তাদের গুণগত মানের তারতম্য যাই হোক, সাহিত্যরসের অভাব ঘটে না। এগুলি লিখিত সাহিত্য নয়, নরনারীর মুখে মুখে এদের প্রচার। এদের উদ্‌ভব সম্পর্কে কিছু বলা মুশকিল। কন্নডতে যে লোক-সাহিত্য ছিল তার প্রমাণ আছে। কিন্তু আমরা যখন কন্নড সাহিত্যের সূচনা-কালের কথা বলি তখন কিন্তু সাল-তারিখ বিহীন এই লোকসাহিত্যকে হিসাবের মধ্যে ধরি না। আমাদের হিসাব কেবল লিখিত সাহিত্য নিয়ে।

কন্নড সাহিত্যের প্রথম প্রাপ্ত নিদর্শন হল 'কবিরাজমার্গ'। নবম শতাব্দীর রচনা। এই শ্লোকবদ্ধ গ্রন্থটির প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে এইরূপ উল্লেখ আছে যে বইটি নৃপতুঙ্গদেব কর্তৃক অনুমোদিত। রাষ্ট্রকূট বংশের বিশিষ্ট নরপতি অমোঘবর্ষ নৃপতুঙ্গের রাজ্যকাল ৮১৪-৮৭৭ খ্রীস্টাব্দ। বইটির রচয়িতা কি স্বয়ং নৃপতুঙ্গ অথবা অন্য কোনো কবি তা নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়েছে। যথা-কালে তার উল্লেখ করা হবে। তবে গ্রন্থখানির রচনাকাল সম্পর্কে কোনো দ্বিমত নেই। 'কবিরাজমার্গ' কন্নড ভাষায় প্রাপ্ত প্রথম গ্রন্থ হলেও প্রাচীনতম গ্রন্থ নয়। এ কথার নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্য অন্যত্র রয়েছে, 'কবিরাজমার্গ' গ্রন্থখানিতেও আছে। বইটিতে পূর্ববর্তী কিছু বিশিষ্ট গদ্য ও পদ্য লেখকের নাম পাওয়া যায়। তাঁদের কেউ কেউ হয়ত 'কবিরাজমার্গ'-এর রচয়িতার সম-কালীন কয়েকজন পূর্বসূরী। পূর্বসূরীদের মধ্যে দুর্বিনীত নামে যে গদ্য লেখকের উল্লেখ পাওয়া যায় তিনি ছিলেন ষষ্ঠ শতাব্দীর গঙ্গবংশীয় নৃপতি। শিলালিপিতে তাঁর প্রশংসায় বলা হয়েছে যে তিনি ছিলেন একজন বিচক্ষণ পণ্ডিত, ভারবির 'কিরাতার্জুনীয়' নামক সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থের পঞ্চদশ সর্গের টীকাকার এবং সংস্কৃত 'শব্দাবতার' ও 'বৃহৎকথা'র রচয়িতা। সংস্কৃত গ্রন্থ 'অবন্তীসুন্দরীকথাসারে'তে আছে যে ভারবি কিছুকাল রাজা দুর্বিনীতের দরবারে

ছিলেন। দুর্বিনীতের 'শব্দাবতার'কে পাণিনি ব্যাকরণের ভাষ্য মনে করা হয়। বইটিকে বর্ধিষ্ণু কন্নড ভাষার ব্যাকরণ গ্রন্থও বলা হয়ে থাকে। পৈশাচীতে লেখা গুণাঢ্যের 'বৃহৎকথা'র প্রথম সংস্কৃত অনুবাদ তিনিই করেন বলে অনুমিত হয়। খুবই স্বাভাবিক যে কন্নডভাষী হয়ে তিনি গুণাঢ্যের 'বৃহৎকথা'র কন্নড অনুবাদও করে থাকবেন। দুঃখের বিষয়, দুর্বিনীতের সংস্কৃত বা কন্নড কোনো রচনাই আজ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি।

'কবিরাজমার্গে' উল্লিখিত অন্যান্য গদ্যলেখকদের মধ্যে পাই বিমলোদয়, নাগার্জুন এবং জয়বন্ধুর নাম। দুর্বিনীত সম্পর্কে যেটুকু তথ্য পাওয়া যায়, এঁদের সম্পর্কে তাও মেলে না। পদ্যলেখকদের মধ্যে যাঁদের নাম পাই তাঁরা হলেন শ্রীবিজয় কবীশ্বর, পণ্ডিত, চন্দ্র এবং লোকপাল। এই সব কবি সম্পর্কেও আমরা প্রায় কিছুই জানি না। 'কবিরাজমার্গে' উচ্চকোটির কবি ও সমালোচকদের উল্লেখ থেকে এবং গ্রন্থখানির ভাব ও রচনাশৈলীর পরিণতি থেকে তাহা স্পষ্টই বোঝা যায় যে বিগত কয়েক শতাব্দী ধরেই কন্নড সাহিত্যের বিকাশধারা চলে আসছিল। 'কবিরাজমার্গ' কবিদের সাহায্যের জন্য লিখিত অলঙ্কার শাস্ত্র বিষয়ক একখানি গ্রন্থ—এই ঘটনাটিই প্রমাণ করে যে এই গ্রন্থখানির অনেক আগে থেকেই কন্নড ভাষায় কাব্য সৃষ্টির ধারা প্রাচীন বইটির দৃষ্টান্তমূলক শ্লোকগুলিতে পাই তৎকালীন কোনো কন্নড রামায়ণ ও মহাভারতের কিছু অংশ। মোটের উপর 'কবিরাজমার্গে'র আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য থেকে অনুমান করা যায় যে বইটি রচনার চার-পাঁচ শতাব্দী আগে থেকেই কন্নড ভাষায় একটি সাহিত্য সৃষ্টির ধারা প্রবাহিত ছিল।

'কবিরাজমার্গ' ব্যতীত অন্যান্য গ্রন্থ থেকেও কন্নড সাহিত্যের প্রাচীনত্ব অনুমান করা যায়। কন্নড ভাষার প্রথম বড় কবি বলে পরিচিত দশম শতাব্দীর পম্প বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন যে তাঁর 'সমস্তভারত' এবং 'আদিপুরাণ' পূর্ববর্তী লেখকদের সমস্ত কাব্যকে ম্লান করে দিয়েছে। তাঁর ঘোষণা অনুসারে তাঁর আগে কোনো বড় কবি মহাভারতের কাহিনী এমন অভিনব রূপে বর্ণনা করেন নি। এই সব উক্তি থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়—কবিরাজমার্গের পূর্বে কন্নড গ্রন্থাদি রচিত হয়েছিল। এর সঙ্গে আরও কিছু পূর্বতন কবি ও কাব্যের উল্লেখ করা চলে। জানা গেছে যে সপ্তম শতাব্দীতে তাম্বুলুরাচার্য নামে জনৈক পণ্ডিত জৈনদর্শনের উপর 'চূড়ামণি' নামে তাঁর বিস্তৃত ভাষ্য রচনা করেন।

এই যুগেই শ্যামকুন্দাচার্য 'প্রাভৃত' নামে একখানি জৈনদর্শনের গ্রন্থ প্রস্তুত করেন। এর থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে খ্রীস্টীয় সপ্তম শতাব্দী থেকেই জৈন পণ্ডিতেরা জৈনদর্শন ও উপাখ্যান নিয়ে ব্যাখ্যাত্মক গ্রন্থরচনা শুরু করে দিয়েছেন। স্বল্প পরিমাণে হলেও ধর্মনিরপেক্ষ লৌকিক গ্রন্থাদিও রচিত হতে থাকে। 'কবিরাজমার্গে'র ঈষৎ পূর্ববর্তী রাজসভার কবি সৈগোত্ত শিবমার 'গজাষ্টক' নামে একটি ক্ষুদ্র কাব্য রচনা করেন যা লোকগাথারূপে জনপ্রিয় হয়েছিল। আধুনিককালে না পাওয়া গেলেও 'কর্ণাটক কুমারসম্ভব', 'কর্ণাটক মালতীমাধব' প্রভৃতি গ্রন্থের নামোল্লেখ কন্নড সাহিত্যে সংস্কৃতের ক্রমবর্ধমান প্রভাবের ইঙ্গিত বহন করে। কেহ কেহ মনে করেন গদ্যে জৈন গল্পগুচ্ছের সংকলন 'বড্ডারাধনে' (বৃহৎ আরাধনা) 'কবিরাজমার্গ' থেকে প্রাচীন।

শিলালিপি থেকেও কন্নড রচনার বিশেষ করে সাহিত্যিক রচনার প্রাচীনত্ব জানা যায়। খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর শিলালিপি ও তাম্রফলক কর্ণাটকে আবিষ্কৃত হয়েছে। এদের ভাষা অবশ্য সংস্কৃত অথবা প্রাকৃত। সর্বাপেক্ষা প্রাচীন সম্রাট অশোকের তাম্রশাসন। কন্নড ভাষায় রচিত প্রাচীনতম শিলালিপি অবশ্য ষষ্ঠ শতাব্দীর। হলমিডিতে প্রাপ্ত এই শিলালিপি থেকে কন্নড রচনায় সংস্কৃতের গভীর প্রভাব লক্ষ করা যায়। এর রচনারীতি থেকে বোঝা যায় যে পুরানো কন্নডর প্রাচীনতমরূপ থেকে কী ভাবে শতাব্দীব্যাপী সংস্কৃতের প্রভাবে শিষ্ট কন্নড জন্মলাভ করছে। কিন্তু এটি কোনো সাহিত্যিক রচনা নয়। মামুলী রীতিতে যুদ্ধ ও দানের বিবরণ দিয়ে প্রস্তুত একটি ক্ষুদ্র শিলালিপি।

এই শিলালিপির পরিমার্জিত রূপ থেকে বোঝা যায় যে কন্নড ইতিপূর্বেই সাহিত্য রচনার মাধ্যম হয়ে গেছে, যদিও এই যুগের সাহিত্যগ্রন্থ আমাদের হাতে এসে পৌঁছয়নি। সপ্তম শতাব্দী থেকে কন্নড শিলালিপির সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। পঞ্চম শতাব্দীর বলে কথিত একটি শিলালিপিতে যে প্রথম পদ্যরচনা পাই তাতে কবিত্বের স্পর্শ লেগেছে। তাতে তৎকালীন বীর নায়ক গুণমধুরাঙ্কের চরিত সংক্ষেপে অথচ জীবন্তরূপে বর্ণিত। সপ্তম শতাব্দীতে মাধবন্ নামে অপর এক বীর নায়কের স্পষ্ট চরিত্র পাই ত্রিপদী ছন্দে রচিত তিনটি স্তবকে। কন্নডর লোকগাথা ও জনপ্রিয় কবিতার সর্বাপেক্ষা দেশজ

ছন্দ এই ত্রিপদী। প্রসিদ্ধ তীর্থ শ্রাবণবেলগোলাতে প্রাপ্ত সপ্তম শতাব্দীর কয়েকটি শিলালিপিতে শান্তরস সমন্বিত সাহিত্য নিদর্শন সুস্পষ্ট।

নবম শতাব্দীতে 'কবিরাজমার্গে'র রচয়িতার সমকালীন আরও কয়েকজন লেখক কন্নড কবিরূপে খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁদের মধ্যে নাম করা যায় অসগ, গুণানন্দী ও প্রথম গুণবর্মার। অসগ পূর্বে উল্লিখিত 'কর্ণাটক কুমার-সম্ভব' ছাড়া আরও দুটি কাব্য রচনা করেছিলেন। সে সব গ্রন্থ অপ্রাপ্য। গুণানন্দীর রচনাবলী তাঁর সমকালে বিশিষ্ট রচনা বলে সমাদৃত হলেও আমাদের কাছে অজ্ঞাত। তাঁর একটি শ্লোকের যে অংশবিশেষ পাওয়া গেছে তার থেকে বোঝা যায় তিনি জাত কবি ছিলেন। গুণবর্মার 'শূদ্রক' এবং 'হরিবংশ' নামক দুটি গ্রন্থের অংশবিশেষ উদ্ধৃত হয়েছে কন্নড কবিতার দুটি প্রাচীন সংগ্রহে। মনে হয় গ্রন্থ দুখানি গদ্যে-পদ্যে রচিত চম্পূ কাব্য। রচনাশৈলী দশম শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবি পম্পর পূর্ববর্তী বাগ্‌বৈদগ্ধ্যে পরিপূর্ণ।

কবিরাজমার্গ

সংস্কৃত সাহিত্যে ভাস এবং কালিদাসের যুগ শেষ হয়ে তখন বাণভট্ট এবং ভারবির দীপ্তিময় যুগ। ভাস ও কালিদাস শ্রদ্ধা ও প্রশংসার পাত্র, কিন্তু বাণভট্ট ও ভারবি সৃষ্টি প্রেরণার মূল উৎস। 'কবিরাজমার্গে'র গ্রন্থকার যখন জন্মালেন তখন অলংকার শাস্ত্রের মুখ্য প্রবক্তা দণ্ডী ও ভামহ। গ্রন্থকারের কাল নিয়ে কোনো দ্বিমত নেই, কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্ব নিয়ে আছে। একদল মনে করেন স্বয়ং রাজা নৃপতুঙ্গই এই গ্রন্থের রচয়িতা। অন্য মতে নৃপতুঙ্গের সভাপতি শ্রীবিজয় অথবা কবীশ্বর রচয়িতা। একটি তৃতীয় মত এই যে পূর্ববর্তী কালে কবি শ্রীবিজয় লিখিত 'কবিমার্গ' নামের একটি ক্ষুদ্র বই অবলম্বন করে নৃপতুঙ্গের সভাকবি কবীশ্বর বিস্তৃত আকারে লিখলেন 'কবিরাজমার্গ'। বইটির আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য মতে এই সিদ্ধান্তই অনিবার্য হয়ে ওঠে যে 'কবিরাজমার্গে'র লেখক নৃপতুঙ্গ নন, লেখক একজন জৈন কবি-পণ্ডিত যিনি নৃপতুঙ্গের প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ ছিলেন এবং তাঁরই প্রেরণায় ও অনুমতিক্রমে বইটি লিখেছিলেন। এই কবি-পণ্ডিতের নাম নিশ্চিত করে বলা না গেলেও খুব সম্ভবত তিনি ছিলেন শ্রীবিজয়। 'কবিরাজমার্গে' উল্লিখিত কবিদের মধ্যে প্রথম নাম শ্রীবিজয় দেখে কেউ কেউ তাঁকে গ্রন্থকার বলে মেনে নিতে আপত্তি করেছেন। কিন্তু গ্রন্থকার

স্বয়ং পরোক্ষ উপায়েও নিজের নাম উল্লেখ করতে পারেন না এ আপত্তি গ্রাহ্য নয়। প্রত্যেক সর্গের শেষ স্তবকে ‘শ্রীবিজয়’ শব্দটি যে দ্ব্যর্থক অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে এটি কোনো আকস্মিক ব্যাপার হতে পারে না। প্রায় দুই শতাব্দী পরে ‘কন্নড পঞ্চতন্ত্রে’র গ্রন্থকার দুর্গসিংহ সাহিত্যের ছাত্রদের যথার্থ সহায়করূপে শ্রীবিজয় লিখিত ‘কবিমার্গ’ গ্রন্থটির স্পষ্ট প্রশংসা করেন। এছাড়া, এই অভি-মতের সমর্থনে অন্য কথাও রয়েছে। ‘কবিরাজমার্গ’ পড়লে মনে না হয়ে পারে না যে বইটি দণ্ডীর সুপ্রসিদ্ধ ‘কাব্যাদর্শে’র বিশদ ভাষ্য। ‘কবিরাজমার্গে’র মৌলিকত্ব এইখানে যে এতে ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে কন্নড বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় ঘটেছে। একাধিককালে বইটিকে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ বই বলে মনে করা হয়। কেবল প্রথম প্রাপ্ত গ্রন্থরূপে নয়, কন্নডভাষায় রচিত কাব্যশাস্ত্রের প্রথম গ্রন্থ বলেও। পরিণত চিন্তা ও জ্ঞানের ফসল এই বইটি সার্থকনামা—‘কবিরাজ-মার্গ’ (কবিদের রাজপথ)। সে যুগের মতো এ যুগের কবি ও সমালোচকদের কাছেও পথপ্রদর্শক। বইখানি যদি কেবল দণ্ডীর কাব্যাদর্শের কন্নড অনুবাদ বা ভাবানুবাদ হত তবে সে এর উচ্চ প্রশংসা লাভের অধিকারী হত না। মহানুভব রাজা নৃপতুঙ্গের প্রেরণায় এবং গ্রন্থকারের বহুমুখী বিদ্যাচর্চার ফলে বইটি কন্নড অনুরাগীদের পক্ষে একটি চিরস্থায়ী সহায়ক গ্রন্থরূপে সম্মানিত। বইটিতে ‘কাদম্বরী’ ও ‘হর্ষচরিত’ গ্রন্থ দুটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা পাই। তাছাড়া গুণসূরী, নারায়ণ, ভারবি, কালিদাস এবং মাঘ—এই সংস্কৃত কবিদের উল্লেখও করা হয়েছে। কন্নড ভাষার প্রসিদ্ধ গদ্য ও পদ্য রচয়িতাদের প্রশংসা করা হয়েছে। তৎকালের কন্নড ভাষায় প্রচলিত সাহিত্যরূপের মধ্যে বেদণ্ডে ও চট্টানর তাৎপর্যপূর্ণ উল্লেখ রয়েছে। সংস্কৃতেও কন্নড ছন্দের মিশ্রণে গঠিত বই দুটির সাহিত্যরীতি তৎকালীন কন্নডর বিশিষ্ট ও অভিনব বস্তু। কর্ণাটকের দৃষ্টিভঙ্গী ও সংস্কৃতি যে বরাবর সমস্ত রকম কার্যতৎপরতার মধ্যে সংস্কৃত ও কন্নড উপাদানের সমন্বয় সাধনের চেষ্টায় নিবদ্ধ, হাজার বছর আগেও তার প্রমাণ দিয়েছে ‘কবিরাজমার্গ’।

এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে রয়েছে কন্নডদেশ ও ভাষার সবিস্তার বর্ণনা যা অন্য কোথাও সুদুর্লভ। বলা হয়েছে, ‘কাবেরী থেকে গোদাবরী পর্যন্ত কন্নড দেশ প্রসারিত। চারদিকে কিসুবোলল, কোপ্পণ, পুলিগেরে এবং ওধুন্দা এই চারটি শহর এই প্রদেশের মধ্যভূমির চতুষ্পার্শ্বে অবস্থিত। এই দেশের মানুষ

বাক্‌-সংলাপে কুশল। এরা এত বুদ্ধিশালী যে পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়াই এরা কবিতার রসাস্বাদনে কিংবা কবিতা রচনায় সুপটু। নিরক্ষর ব্যক্তিরাও সমুচিতভাবে তার প্রকাশে সমর্থ। সরল প্রকৃতির এবং অল্প বয়সের লোকেদের মুখে জ্ঞানগর্ভ কথা শোনা যায়। অশিক্ষিত ব্যক্তিরাও নির্ভুলভাবে কোনো রচনার দোষ আবিষ্কার করতে পারে।' বর্ণনার আতিশয্যের কথা ছেড়ে দিলেও আমরা এখানে সে যুগের কন্নডিগদের (কন্নড ভাষীদের) মানসিকতা ও সংস্কৃতির একটি বিশ্বস্ত চিত্রপঙ্ক্তি অতীত ও বর্তমান কাল থেকে দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করে উল্লিখিত বর্ণনার যথার্থ প্রমাণ করা যেতে পারে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের অপর একটি শ্লোকেও কন্নডবাসীদের বিশিষ্ট গুণাবলী বর্ণিত: 'এই দেশের অধিবাসীরা খুব সাহসী। তারা একাধারে কবি ও শাসক। তারা সৌন্দর্য ও সংস্কৃতির অধিকারী। তারা আত্মসম্মানী ও বীর্যবান, আক্রমণে ভয়ঙ্কর, আবার সেই বাক্যে ও কর্মে গম্ভীর ও বিচক্ষণ।'

যদিও বইখানি দণ্ডীর সংস্কৃত গ্রন্থের এক প্রকার ভাবানুবাদ, তথাপি লেখকের রচিত মৌলিক শ্লোকগুলিকে বিশ্লেষণী অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় মেলে। সন্দেহ নেই যে তিনি সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের কাছে বিশেষ করে দণ্ডী ও ভামহের কাছে ঋণী। কিন্তু বইটির প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ সংস্কৃত থেকে পৃথক। তৃতীয় অধ্যায়ে অবশ্য মূল সংস্কৃতের অধিকতর অনুকরণ পাই। এই অধ্যায়েও প্রায় অর্ধেক শ্লোক স্বাধীন সৃষ্টি অথবা কিঞ্চিৎ পরিবর্তনসহ ভাবানুবাদ। প্রথম অধ্যায়ে যে সমস্ত বিষয়ের সুষ্ঠু আলোচনা করা হয়েছে সেগুলি হল: কবিতার যথার্থ প্রকৃতি, কবিতার উদ্দেশ্য ও শ্রেণীবিন্যাস, কবির প্রস্তুতি, সংস্কৃত ও কন্নড শব্দ ব্যবহারে সামঞ্জস্য ইত্যাদি। গ্রন্থে প্রকাশিত মতামতের পরিপক্বতার জন্যই বইটির এত মর্যাদা। পাঠকের দৃষ্টিতে গ্রন্থকার একজন প্রবীণ আলঙ্কারিক বলে পরিগণিত। তিনি যদি মৌলিকতার পরিচয় না দিয়ে কেবল আক্ষরিক অনুবাদ করে যেতেন, তবে তাঁর এ সম্মান প্রাপ্য হত না।

তাঁর মৌলিকতার কয়েকটি উদাহরণ এখানে অসঙ্গত হবে না। মূল অনুসরণে তিনি কবিদের অপরিহার্য গুণের মধ্যে প্রতিভা ও উদ্‌ভাবনী কৌশলের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কবিতার প্রভাব সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব চিন্তা প্রকাশিত। তিনি বলেন: 'কবির চিত্তে যে কাব্যভাবনা মূর্তি গ্রহণ করে তা যদি নতুন

আকারে সজ্জিত হয় তবেই তা রুচিমান শ্রোতাকে আকৃষ্ট করবে। অন্যথা, কে তাতে মুগ্ধ হবে? বক্ষশোভিক হীরকমালার মতো যে রচনা নিরন্তর স্মরণে ও মননে আনন্দ দান করে, সেই রচনাই প্রসিদ্ধি লাভের যোগ্য। এই জাতীয় রচনার মহত্ত্ব উপলব্ধি করা অতি সহজ'।[১] এই বক্তব্যের আসল কথা এই যে কবিতা নতুন সৃষ্টিরূপে পাঠককে এমনি আনন্দ দান করবে যাতে সে বারবার এই কবিতার দিকে ফিরে ফিরে যাবে, এবং এই শ্রেণীর কবিতার শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি ও উপভোগ করা সহজ। যে সব লেখক অন্য লেখকের ভাব চুরি করে নিজস্ব বলে জাহির করেন, কবি তাঁদের নিন্দা করেছেন। তাঁদের রচনা পর্বতের গুহার প্রতিধ্বনির মতোই নিষ্ফল। তাঁরা কখনো কবিজনোচিত বাক্‌পটুতা অর্জনে সমর্থ হবেন না।

কাব্যোৎকর্ষের মান নির্ণয়ে এবং ব্যাখ্যায় 'কবিরাজমার্গে'র রচয়িতা তাঁর নিজস্ব প্রমাণ-যুক্তি উপস্থিত করেছেন। বলেছেন: 'যে কবি নিজের ইচ্ছামত অপরের হৃদয়ের কথা অর্গলমুক্ত করতে পারেন, তিনিই বাক্‌শিল্পের যথার্থ সমঝদার। তাঁর চেয়েও যোগ্যতর ব্যক্তি তিনিই যিনি অল্প কথায় অধিক অর্থ প্রকাশ করতে পারেন। তাঁর চেয়েও কুশলী কে? যিনি তাঁর কথাকে তালে-লয়ে-ছন্দে রূপ দিতে পারেন। আর সকলের শ্রেষ্ঠ তিনিই যিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে অবিরাম ধ্রুপদী সাহিত্য রচনায় সুনিপুণ। মনুষ্যকুলের মধ্যে কেউ বাগ্মী, কেউ শ্লেষ ব্যঙ্গের রচয়িতা, কেউ বা ছন্দের রূপকার। সকল গুণের সমন্বয় যাঁদের মধ্যে, এমন অল্প কয়েকজন মাত্র সর্বশ্রেষ্ঠ'।[২] এ ধরনের উক্তির পশ্চাতে যে জীবনের বিপুল অভিজ্ঞতা ও সাহিত্যশিল্পের গভীর বিচারাসক্ত বর্তমান তা লক্ষণীয়। উৎকৃষ্ট রচনার পক্ষে অপরিহার্য উল্লিখিত গুণগুলি একজন বড় কবির অবশ্যই থাকা চাই, থাকা চাই একটি ব্যাপক ও অখণ্ড দৃষ্টি। তাঁর সৃষ্টিপ্রতিভা হবে সর্বগ্রাসী। বাগ্মীর বাক্‌পটুতা, ব্যঙ্গকারের সংক্ষিপ্ত স্মরণীয় উক্তিসৃষ্টির ক্ষমতা, পদ্য লেখকের ছন্দকৌশল—এই সমস্ত শক্তির সমন্বয় হলে তিনি মহৎ সৃষ্টির অধিকারী হন। হাজার বছর আগে 'কবিরাজমার্গে'র রচয়িতার এই কথাগুলি নিঃসংশয়ে তাঁর মৌলিক ও পরিণত চিন্তাশক্তির নিদর্শন। তিনি

১. কবিরাজমার্গ ১-১২, ১৩

২. কবিরাজমার্গ: ১-১৫, ১৬, ১৭

তাঁর পূর্ববর্তী দণ্ডী ও অন্যান্য আলঙ্কারিকদের কাছ থেকে অলঙ্কারের সংজ্ঞা আদি ধার করেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর প্রদত্ত দৃষ্টান্তগুলি সম্পূর্ণভাবে তাঁর নিজস্ব অথবা নতুন দিগ্‌দর্শক। নিম্নলিখিত দৃষ্টান্ত ও উপমাগুলির মধ্যে তাঁর কবি প্রতিভা ও ঔচিত্যবোধের প্রকাশ ঘটেছে: 'একটি কালো দাগ যেমন চোখের সমস্ত সৌন্দর্য নষ্ট করে দেয়, তেমনি একটি ক্ষুদ্র ত্রুটি কাব্যের সৌন্দর্য হানি করে। চোখ যেমন চোখে লাগানো কাজল দেখতে পায় না, কবিও তেমনি নিজের দোষ-ত্রুটি দর্শনে অপারগ। তাই প্রত্যেক কবির উচিত কোনো বিচক্ষণ সমালোচককে দিয়ে কাব্য পড়িয়ে নেওয়া। কন্নড শব্দের সঙ্গে সংস্কৃত ক্রিয়া-বিশেষণ পদ মেশাতে যে শ্রুতিকটু ধ্বনি উৎপন্ন হবে তা অনেকটা দু-মুখো ঢাকের মতো কর্কশ। সংস্কৃত ও কন্নড শব্দ দিয়ে সমাসবদ্ধ পদ গঠন করা আর গরম দুধে ঘোল ঢেলে দেওয়া একই কথা।'

এই সমস্ত উদাহরণ সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয় যে গ্রন্থকার সমালোচনার সূত্রকে জীবন্ত করে তোলার কৌশল নিপুণভাবে আয়ত্ত করেছেন। সত্য বটে যে তাঁর চিন্তার বিষয়গুলি অনেকাংশে সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্র থেকে গৃহীত, কিন্তু কিছু কিছু বিষয় তাঁর নিজস্ব। দণ্ডী আটটি রসের কথা বলেছেন, কিন্তু বর্তমান গ্রন্থকার শান্তিরস-সহ বলেছেন নয়টির কথা। যখন এই গ্রন্থ লিখিত হয় তার আগেই যে জৈন প্রভাবে কন্নড কাব্যেও সমালোচনার শান্তিরস ঠাঁই পেয়েছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এই গ্রন্থে 'ধ্বনি'ও একটি অলঙ্কার-রূপে গৃহীত এবং তদনুযায়ী তার দৃষ্টান্তও প্রদর্শিত। দণ্ডী বা ভামহে এর উল্লেখ নেই। 'কবিরাজমার্গ' অনুসারে শিশুদের মুখ থেকেও জবাবের কথা বেরিয়ে আসে। তাহলে এই গ্রন্থকারের মতো পরিপক্ক অভিজ্ঞতার মানুষের লেখনী থেকে বিশেষ জ্ঞানের কথা যে শোনা যাবে তাতে আর বিচিত্র কী? বিষয় যাই হোক, কন্নড ও সংস্কৃত শাস্ত্রের মিশ্রণ বিভিন্ন ভাষার পারস্পরিক সম্পর্ক, অথবা আদর্শ রচনাশৈলীর প্রকৃতি সর্বত্রই আমরা লেখকের জ্ঞানগর্ভে উক্তি শুনতে পাই। বিশেষ করে তৃতীয় অধ্যায়ের কথা ধরা যাক। এখানে আমরা এমন কয়েকটি উদাহরণ দেখতে পাই যা লেখকের রাজনৈতিক বিচক্ষণতা ও দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপক পরিচায়ক। যেমন, 'একজন মন্ত্রীর গুণের পরিচয় পাওয়া যায় যদি সে জনসাধারণের ভাবনাচিন্তার আগেই কোনো নীতি নির্ধারণ করতে পারে। যখন নাগরিকবৃন্দ কোনো নীতি সম্পর্কে সচেতন হয়ে কথাবার্তা শুরু করে,

তখন পর্বত-গুহার প্রতিধ্বনির মতো মন্ত্রীর পক্ষে সেই কথার পুনরাবৃত্তি করা কোনো কৃতিত্বের পরিচায়ক নয়। যদি কোনো মানুষ প্রথমে ভার বহন করে এবং পরে তার পরিণাম সম্পর্কে চিন্তা করে, তাহলে তার আচরণ সেই মূর্খের আচরণের তুল্য যে প্রথমে ক্ষৌরকার্য সমাধা করে পরে জানতে চায় সেটা কী বার (অর্থাৎ ক্ষৌরকার্যের পক্ষে নিষিদ্ধ বার কিনা)। যদি নিয়তি বিরুদ্ধ হয়, তবে নীতি অনুকূল হলেও কোনো কাজে হাত দেওয়া উচিত নয়। প্রতিকূল অবস্থা দেখেও যদি সে কাজ শুরু করে তবে তা মৃত ব্যক্তিকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রাখার তুল্য। শত্রুকে যদি ছোট বলে অবজ্ঞা করে ধ্বংস না করা হয়, তবে সে একদিন শক্তিশালী হয়ে কঠিন আঘাত হানবে, যেমন ছোট্ট এক টুকরো মেঘ দেখতে দেখতে বড় হয়ে সূর্যকে ঢেকে দেয়। অপরের চিন্তা ও ধর্মবোধের সঙ্গে মানিয়ে চলাই প্রকৃত সম্পদ। ধর্মের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর গড়ে তুলতে না পারলে জীবনের মূল্য কতটুকু ? অন্য লোকের নিন্দা-প্রশংসায় ভ্রূক্ষেপ না করে ইহলোক ও পরলোকের কল্যাণচিন্তায় মনস্থির করে প্রত্যেকটি মানুষ নিষ্ঠার সঙ্গে তার কর্তব্য করে যাক।' এই সমস্ত চিন্তাধারা লোকের বাস্তববুদ্ধি এবং পরিণত বোধশক্তির পরিচায়ক। হাজার বছর আগে ভারতীয় সংস্কৃতির বিশুদ্ধ প্রকাশ ঘটেছিল যে গ্রন্থে, সেইটিই কন্নড ভাষায় লেখা প্রথম প্রাপ্ত গ্রন্থ।

বড্ডারাধনে

উল্লিখিত বইখানি একাধিক কারণে কন্নড সাহিত্য জগতের একটি অমীমাংসিত প্রহেলিকা। বইটির প্রকৃত নাম কী ? গ্রন্থকারেরই বা কী নাম ? বইটি লিখিত হয় কবে ? এই সব প্রশ্নের চূড়ান্ত উত্তর এখনও পাওয়া যায় নি। রচনাকাল সম্পর্কে বিভিন্ন মত। তথাপি, কয়েকটি আভ্যন্তরীণ তথ্যের ভিত্তিতে অনুমান করা চলে যে বইটি বোধ করি দশম শতাব্দীর প্রথম তিন দশকের মধ্যে শিবকোটি আচার্য নামে কোনো ব্যক্তির দ্বারা রচিত হয়। 'কবিরাজমার্গে'র পরে এইটিই দ্বিতীয় প্রাপ্ত গ্রন্থ বলে বিবেচিত। কন্নড গদ্যে রচিত প্রথম গল্পসংগ্রহ।

একজন প্রসিদ্ধ গবেষকের মতে বইখানিতে কিছু অপ্রচলিত রূপ থাকার ফলে এটি ষষ্ঠ শতাব্দীর পরবর্তী নয়। অন্য এক পণ্ডিত মনে করেন গ্রন্থখানিতে

পরবর্তী কালের দু-একটি উদ্ধৃতি থাকাতে অষ্টম থেকে একাদশ শতাব্দীর মধ্যে এটি রচিত হয়ে থাকবে। তৃতীয় অভিমত এই যে খুব সম্ভবত দশম শতাব্দীর প্রথম কয়েক দশকের মধ্যেই বইটি রচিত হয়। এই অভিমতের প্রধান কারণ এই যে এই গ্রন্থখানিতে পুরোনো কন্নডর সঙ্গে কিছু অর্বাচীন রূপও পাওয়া যায়। প্রাচীন গ্রন্থে এইরূপ মিশ্রণ সম্ভব নয়। বরং মনে করা চলে পরবর্তী কালের রচনায় প্রাচীনতার মোহ সৃষ্টির জন্য অথবা ঐতিহ্য বজায় রাখার জন্য কিছু পুরোনো ভাষারূপ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

'বড্ডারাধনে' কথাটির তাৎপর্য বৃহৎ সাধনা। জৈন সন্ন্যাসীরা সর্বদাই (বিশেষ করে 'সল্লেখনা' ব্রত আচরণের সময়ে) জ্ঞান, বিশ্বাস, সদাচার ও তপস্যা অভ্যাস করতেন। এই ব্রত পালনের সময়ে সন্ন্যাসী স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করতেন। এর নাম 'সমাধিমরণ'। এই সমস্ত সাধনাকে বলা হয় 'আরাধনা'। কালক্রমে আরাধনার কালে যে সমস্ত দার্শনিক আলোচনা হত এবং গল্প কথিত হত সেগুলিও আরাধনা নামে অভিহিত হয়। 'বড্ডারাধনে' গ্রন্থে মোট গল্প সংখ্যা উনিশ। সংস্কৃতে ও প্রাকৃতেও কয়েকটি বই 'আরাধনা' নামে পরিচিত। মনে হয় এই গল্পের কথকের সামনে কোনো প্রাকৃত আদর্শ ছিল।

সংস্কৃতে হরিসেন-রচিত 'কথাকোষ' বইটিও বোধ করি প্রাকৃত বইখানির আদর্শে লিখিত। 'বড্ডারাধনে'র উনিশটি গল্পই 'কথাকোষ'-এর গল্পগুলির সঙ্গে মিলে যায়। গল্পগুলির বিন্যাস অবশ্য পৃথক পৃথক। স্থানে স্থানে গ্রন্থ দুটির সাদৃশ্য খুবই বেশি। তবে 'বড্ডারাধনে'র গল্পগুলি আকারে দীর্ঘতর এবং সেখানে মূলের বিস্তার কিছু বেশী। সুতরাং মনে করা যেতে পারে গল্পের জন্য মূলের কাছে ঋণী হলেও 'বড্ডারাধনে' বোধ করি কাহিনী বর্ণনার ঝোঁকে স্বাধীনতাকে কিছু রং-পরং লাগিয়েছে। তখনকার দিনে লেখকরা গল্পের কাঠামোতে বিশেষ করে ধর্মাচারণের সঙ্গে যুক্ত হলে বড় একটা পরিবর্তন করতে চাইতেন না। তার মানে এই নয় যে এই কন্নড বইটি তার প্রাকৃত আদর্শের আক্ষরিক অনুবাদ। কন্নড় লেখকের জানা ছিল কী করে একটি ধার করা কাহিনীকে জীবন্ত ও মনোরম করে বলা যায়। সামান্য একটু পরিবর্তনের ফলে গল্প উজ্জ্বল হয়ে ওঠে এবং মনুষ্য প্রকৃতি সম্পর্কে কন্নড লেখকের অন্তর্দৃষ্টি সূক্ষ্মভাবে মেলে ধরে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় রাজা 'সুকুমার স্বামী' গল্পের কথা। তাঁর সম্মানিত মন্ত্রীর তিরোধানের পরে রাজা মন্ত্রীর ছেলে দুটিকে

ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন তাদের শিক্ষাদীক্ষার কথা, দুজনেই নিরুত্তরে মাথা নিচু করে রইল। লজ্জানত মুখে তারা পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে মেঝের উপর কী লিখছিল। মন্ত্রীর ছেলে হয়েও তারা যে লেখাপড়া শেখেনি তাদের সেই লজ্জা ও দুঃখের বর্ণনাটি চমৎকার। যে যুবক দুটি লিখতে পড়তে জানে না তারা যে পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে মাটিতে হিজিবিজি দাগ কাটছিল এই বর্ণনার বক্রোক্তি অনেকটা কারুকার্য মণ্ডিত গজদন্তের মতো রমণীয়। এই-ভাবে লেখক শিবকোটি আচার্য কুশলী ও জীবন্ত সৃষ্টিশক্তির ছোঁয়া লাগিয়ে এবং সংলাপের মাধুর্যে মামুলী কাহিনীর মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করেছেন। একথা ঠিক যে মাঝে মাঝে গল্পের সংযোগসূত্রটি হারিয়ে গেছে এবং বৈচিত্র্যের অভাবে গল্পরস ক্ষুণ্ণ হয়েছে। কোনো কোনো গল্প যেমন দীর্ঘ, কয়েকটি আবার খুবই ছোট। এত ছোট যে গল্প জমে ওঠেনি। বড় গল্পগুলির মধ্যে আবার উপকাহিনী এসে জায়গা জুড়েছে।

গল্প যাই হোক, তাদের মূল লক্ষ্য একটিই। কয়েকজন ব্যক্তির বিভিন্ন জন্মের কাহিনীর মধ্য দিয়ে বিশেষভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে ‘ভবাবলী’, নীতি অর্থাৎ জন্ম মৃত্যু চক্রের অপ্রতিরোধ্য প্রকৃতি। আর জোর দিয়ে বলা হয়েছে জৈন ধর্মে ব্রত ও তপশ্চর্যার বিশেষ গুরুত্বের কথা। এই গল্প সংগ্রহের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প ভদ্রবাহুকে নিয়ে লেখা। এই গল্পে মিশে আছে ঐতি-হাসিক সত্যের সঙ্গে দর্শনের কথা, বর্ণনা কৌশলের সঙ্গে নৈতিক তাৎপর্য, মানবধর্মের সঙ্গে রোমান্টিকতা। গল্পের মুখ্য বর্ণনীয় বিষয়: উত্তর ভারতে দ্বাদশবর্ষব্যাপী দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা করে রাজা সম্প্রতি চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে চন্দ্রবাহু মুনির দক্ষিণ ভারতে চলে আসা। খ্রীস্টপূর্ব যুগের যে সময়ে তাঁরা কর্ণাটকে পদার্পণ করে শ্রাবণবেলগোলায় তপস্যা শুরু করেন, সেই মুহূর্তে কর্ণাটকে জৈন-ধর্মের বীজ বপন করা হল এবং কন্নড সাহিত্যসৌধের ভিত গড়ে তোলা হল। এই কাহিনীর উপকাহিনীরূপে পাই নন্দীমিত্রের কথা যিনি পরবর্তী জন্মে হলেন সম্প্রতি চন্দ্রগুপ্ত। এই উপকাহিনীটি ‘বড্ডারাধনে’ বইটির বর্ণনা-কৌশলের একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। সংক্ষেপে গল্পটি এই রকম: নন্দীমিত্র শৈশব থেকেই দুর্ভাগ্যের মধ্যে মানুষ। অনাথ শিশু রূপে অনেক কষ্ট পেয়েছে সে। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে উত্তরকালে সে একজন গুরুর সাক্ষাৎ পায়। সেই গুরু তাকে জৈন ধর্মে দীক্ষিত করে তপশ্চর্যার মহত্ত্বে শিক্ষা দেন। কঠোর তপস্যার পরে

নন্দীমিত্র মুক্তি লাভ করে, এইভাবে জৈনদর্শনের মধ্য দিয়ে গল্পটির সার কথা যা বোঝা গেল তা হল এই যে মানুষ জন্মবশত যতই দুর্ভাগ্য হোক না কেন, তপস্যা ও অধ্যবসায়ের বলে সে তার ভাগ্যনিয়ন্তা হতে পারে। গল্পটির বর্ণনায় লেখক শিবকোটি বুঝি অল্প বিস্মৃত হয়েছিলেন। তাঁর অন্য কয়েকটি গল্পে কয়েকজোড়া বিপরীত চরিত্র-চিত্রণ বেশ ফলপ্রসূ হয়েছে। যেমন 'সুকুমার স্বামী' গল্পে অগ্নিভূতি ও বায়ুভূতি, 'বিদ্যুচ্চোর' গল্পে বিদ্যুচ্চোর ও যমদণ্ড। 'বড্ডারাধন' যে কন্নড সাহিত্যে একটি অনুপম স্থান অধিকার করে আছে তার কারণ কিন্তু বর্ণনাকৌশল এতটা নয়, যতটা তার বিশিষ্ট গদ্য রচনা রীতি। 'কবিরাজমার্গ' থেকে জানা যায় যে কন্নড ভাষায় গদ্য আখ্যানের প্রচলন ছিল। কিন্তু সেগুলি এখন অপ্রাপ্ত। 'বড্ডারাধনে' থেকে আজকের যুগ পর্যন্ত সমগ্র কন্নড সাহিত্যে গদ্যে গল্পসংগ্রহের সংখ্যা খুব বেশি নয়। তার মধ্যে 'বড্ডারাধনে' তার নিজস্ব রীতি ও ভঙ্গি নিয়ে স্বতন্ত্র। মোটামুটি বলা যায়, বইটি কিছু প্রাচীনতর এবং কিছুটা নবীন কন্নডর মিশ্রণ সহ পুরোনো কন্নড ভাষায় লিখিত। আর একটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে, লেখক সংস্কৃত ভাষা বিসর্জন না দিলেও কন্নড শব্দ ও শব্দগুচ্ছের প্রতি তাঁর বিশেষ ঝোঁক দেখা যায়। মোটের উপর, 'বড্ডারাধনে' কন্নড সাহিত্যের একটি অমূল্য সম্পদ। যদিও বইটি স্পষ্টত ধর্মীয় উদ্দেশ্য নিয়ে লিখিত কয়েকটি গল্পের সমষ্টিমাত্র, এতে জাত গাথা লেখকের এবং উন্নত গদ্যশিল্পীর কৌশল পরিস্ফুট। প্রাচীন যুগের বিশিষ্ট গদ্য গ্রন্থরূপে 'বড্ডারাধনে' চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রাচীন যুগ ২

পম্প

আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধিমতে কন্নড সাহিত্যের প্রথম মহৎ কবি পম্প। প্রাচীন কন্নড সাহিত্যের যে সমস্ত গ্রন্থ একাল পর্যন্ত এসে পেঁাচেছে, তাদের মধ্যে 'কবি-রাজমার্গ' প্রধানত অলঙ্কার শাস্ত্রের উপর লেখা পদ্য ছন্দে রচিত গ্রন্থ, আর 'বড্ডারাধনে' হল গদ্যে লিখিত ধর্মীয় গল্প সংগ্রহ, পম্প কবির রচনার মধ্যেই আমরা প্রথমে পুরোদস্তুর পরিণত গ্রন্থের সাক্ষাৎ পাই। তাঁর রচনা ধ্রুপদী ঐতিহ্যে গদ্যপদ্যের মিশ্রণে লিখিত চম্পূ কাব্য।

পম্পর স্বীকারোক্তি থেকে জানা যায় যে তাঁর মধ্যে বৈদিক ও জৈন সংস্কৃতির অদ্ভুত সমাবেশ ঘটেছিল। প্রসিদ্ধ বৈদিক কুলে তাঁর জন্ম, কিন্তু তাঁর পিতৃদেব স্বেচ্ছায় জৈন ধর্মে দীক্ষিত হন। পম্পও জৈন ধর্মের উৎসাহী অনু-গামী ছিলেন, কিন্তু তিনি কখনো বৈদিক সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা হারাননি। উভয় সংস্কৃতির সারবস্তুকে নিরপেক্ষ বুদ্ধিবলে বিস্তার করে তিনি বিশ্ব সংস্কৃতির সুরে সুর মেলাবার মতো পরিপক্ক জ্ঞানের অধিকারী হন।

পম্পর কাব্য তাঁকে স্থায়ী কীর্তি এনে দিয়েছে। চালুক্য বংশের প্রসিদ্ধতম সামন্তরাজ অতিকেশরী ছিলেন কবির প্রিয় নায়ক ও পৃষ্ঠপোষক, আর পম্প ছিলেন তাঁর সেনাপতি। পম্পর জন্ম দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের বেঙ্গিমণ্ডলে হলেও তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় অতিবাহিত হয়েছে মনোরম বনবাসী এবং পুলিগেরের সমতলে। সাম্প্রতিক আবিষ্কারের ফলে জানা গেছে পম্পর মা উত্তর কর্ণাটকের পুলিগেরে-র নিকটবর্তী অন্নিগেরের রমণী। বনবাসীর জন্য পম্পর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ যে কত প্রগাঢ় ছিল তা বোঝা যায় তাঁর 'ভারত' কাব্যের নায়ক অর্জুনের একটি উক্তি থেকে : 'ত্রিশূলের মুখে দাঁড় করিয়েও যদি কেউ আমাকে প্রশ্ন করে, আমি বনবাসীকেই স্মরণে রাখব।' সৌভাগ্যবান পম্প ধনের মধ্যে পূর্ণ জীবন ভোগ করে গেছেন। তবে তিনি ঐশ্বর্যে মত্ত হন নি কখনো। অতিকেশরীর মতো রাজা তাঁর পৃষ্ঠপোষক হলেও কবি কখনো তাঁর তোষামোদ করেন নি। জৈন ধর্মে তাঁর প্রবল বিশ্বাস সত্ত্বেও তিনি কখনো গোঁড়া ছিলেন না। তাঁর এই মানসিক সাম্যের ফলে তিনি আত্মত্যাগের বন্ধনে উদ্দীপনাকে

বশে রাখতে পেরেছিলেন, আবার সৌন্দর্যবোধের প্রেরণায় তাঁর আত্মত্যাগও পীড়াদায়ক হয়ে উঠতে পারেনি।

পম্প দু'খানি বই লিখেছেন—'আদিপুরাণ' এবং 'বিক্রমার্জুনবিজয়'। শেষোক্ত বইটি 'পম্পভারত' নামেই সাধারণত পরিচিত। কবির স্বীকারোক্তি অনুসারে 'আদিপুরাণ' ধর্মগ্রন্থ, 'পম্পভারত' লৌকিক। একথা বিশ্বাস করবার মতো যথেষ্ট কারণ আছে যে নবম শতাব্দীর প্রথম গুণবর্মা কন্নডভাষায় 'হরিবংশ' ও 'শূদ্রক' নামে যথাক্রমে দু'খানি ধর্মগ্রন্থ ও লৌকিক গ্রন্থ রচনা করেন। প্রাচীন কাব্য সংগ্রহে এই বই দুটি থেকে উদ্ধৃতি পাওয়া যায়। এই ধরনের লেখা হয়ত আরও পূর্বকাল থেকে প্রচলিত ছিল। সে যাই হোক, প্রাপ্ত সম্পূর্ণ পুঁথির মধ্যে পম্পর বই দুইটিই সর্বাগ্রগণ্য। ৯৪১ খ্রীস্টাব্দে তিনি প্রথমে রচনা করেন 'আদিপুরাণ', পরে বোধ করি ঐ একই সালে 'পম্প-ভারত'। 'আদিপুরাণ' জীবনচরিত মূলক গ্রন্থ—এতে আদিনাথধামের প্রথম জৈন তীর্থঙ্করের জীবন-কাহিনী বর্ণিত। এতে তাঁর অতীত জীবনের কাহিনীপুঞ্জও ঠাঁই পেয়েছে। জৈন উপাখ্যানে প্রাপ্ত আদিনাথের পুত্র প্রথম সম্রাট ভরতেশ্বরের জীবন-কাহিনীও এখানে পাওয়া যায়। 'আদিপুরাণ' গ্রন্থের প্রধান উৎস সংস্কৃত ভাষায় জিনসেনের 'পূর্বপুরাণ'।

গল্প ও ঘটনা বিন্যাসে পম্প সেই উৎসকে বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করেছেন। তবু 'আদিপুরাণ'-এ যথেষ্ট মৌলিকতাও রয়েছে। দুটি বই-ই জৈন পুরাণ এবং কাব্যগুণমণ্ডিত। কিন্তু 'আদিপুরাণ'-এ পৌরাণিক আখ্যানের উপর স্থান পেয়েছে কাব্য গুণ। 'পূর্বপুরাণ' পুরোপুরি পদ্যে রচিত, 'আদিপুরাণ' গদ্যেপদ্যে মেশানো চম্পূ কাব্য। প্রথমটি অতি বিস্তৃত, দ্বিতীয়টি অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত। পম্পর দাবী এই যে ধর্ম ও কাব্যকে একসঙ্গে পেতে হলে 'আদিপুরাণ' পড়তে হবে। এবং সে দাবী বোধ করি মিথ্যা নয়। মাঝে মাঝে তাঁর শব্দপ্রয়োগ সংস্কৃত শব্দে ক্লিষ্ট। কিন্তু কবি চরিত্র চিত্রণ ও ঘটনাসংস্থানে ধর্ম ও কাব্যকে মেলাবার চেষ্টা করেছেন।

'আদিপুরাণ' এক ব্যক্তির এক জন্মের গল্প নয়। বইটির বিস্তৃত পরিসরে কয়েকটি জন্মব্যাপী আদিনাথ এবং অন্যান্য উন্নত চরিত্রবান মানুষের আধ্যাত্মিক ইতিহাসের কাহিনী। সেই কাহিনীতে পাই, কিভাবে তারা পার্থিব জীবনের কঠোর অগ্নিপরীক্ষা থেকে শুদ্ধ হয়ে বেরিয়ে আসে এবং শেষজীবনে

ভোগ থেকে ত্যাগের পথে উত্তীর্ণ হয় ও কঠিন তপস্যায় মুক্তিলাভ করে। কাহিনীর বিষয়বস্তু বেশ কঠিন হলেও পম্প কবির হাতে তা সুসংবদ্ধ রূপ লাভ করেছে। আদিনাথের প্রথম দশটি জন্মের কাহিনীতে কেবল রোমান্টিক ও মামুলী বর্ণনাই পাই না। জন্ম থেকে জন্মান্তরে চলমান এবং পূর্ণতার অভীপ্সু মানবাত্মার অভিসারের প্রতীক এই কাহিনী। কাব্যের এই গুণের মধ্যেই তার চিরন্তন আবেদন বর্তমান।

এখানে দু-একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা অসঙ্গত হবে না। আদিনাথ তৃতীয় জন্মে বজ্রজঙ্ঘ রূপে জন্মগ্রহণ করে শ্রীমতীকে বিবাহ করেন। এই শ্রীমতী পূর্বজন্মে স্বয়ংপ্রভা নামে তাঁর স্ত্রী ছিল। পূর্বজন্মের অতৃপ্তি মেটাবার জন্য এই জন্মের নবদম্পতি জীবনকে পুরোপুরি উপভোগ করেন। তাঁদের মৃত্যুকালেও তাঁরা ছিলেন পরস্পরের বাহুসংলগ্ন। ব্যাপারটি ঘটেছিল এইভাবে: একদিন রাত্রে তাঁরা সমস্ত জগৎ বিস্মৃত হয়ে যখন অত্যধিক উল্লাসে মত্ত ছিলেন, তখন পরিচারকবর্গের অবহেলায় জানালাগুলি বন্ধ থাকাতে ধূপের ধোঁয়ায় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে তাঁরা মারা যান। পম্প বলেন—এই হল আদর্শ দম্পতির মৃত্যু, কারণ ধূপের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন ও শ্বাসরুদ্ধ হয়েও তাঁরা পরস্পরের আলিঙ্গনচ্যুত হননি। একই সঙ্গে জীবন ও মৃত্যুর চেয়ে বড় ভাগ্যের বিষয় আর কী হতে পারে? এমন প্রেমের ছবি মৃত্যুকে উৎসবে পরিণত করে। এর থেকে বোঝা যায়: কিভাবে একটি মর্মান্তিক পরিস্থিতির মধ্যে কবি পম্প অনন্তের স্পর্শ উপলব্ধি করতে পেরে সেই বিয়োগান্ত ঘটনার তীব্রতাকে মৃদু পরিণতির দিকে ঘুরিয়ে দিতে পেরেছিলেন।

অন্য একটি উদাহরণ নীলাঞ্জনের নৃত্য উপাখ্যানটি। এই ঘটনার ফলেই আদিনাথের শেষ জন্মে পরম আত্মত্যাগ। কথিত আছে যে আদিনাথের তপস্যা ও আত্মত্যাগ আসন্ন বুঝতে পেরে ইন্দ্র দিব্য নৃত্যগীত নিয়ে আদিনাথকে পরিতৃপ্ত করবার জন্য রাজসভায় উপস্থিত হন। মনোমুগ্ধকর সঙ্গীতের পরে অপ্সরা নীলাঞ্জনের নৃত্য। পম্পর বর্ণনা মতে, রঙ্গমঞ্চে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে অপ্সরা সকলের হৃদয় হরণ করে এমনভাবে দাঁড়াল যেন কামদেবের পুষ্পবন প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। পর্দা সরে গেলে রমণী সেই মঞ্চের উপর পুষ্পরাশি বিছিয়ে দিল যেন কামদেব ছড়িয়ে দিল তার পুষ্পশরগুলি। নৃত্যের তালে তালে নীলাঞ্জনের পরিচ্ছদের ভাঁজগুলি এবং কেশগুচ্ছে পরিহিত মালার

মুক্তোগুলিও যেন তাল দিতে লাগল। তার নৃত্য পরিকল্পনায় সমস্তই যেন অভিনব। মঞ্চের উপর তার পিছিয়ে যাওয়া এবং এগিয়ে আসা থেকে মনে হয় নর্তকী যেন দর্শকদের হৃদয়ে প্রবেশ করে আবার বেরিয়ে আসছে। তার মধুর হাসি যেন নবীন অমৃত সিঞ্চিত করে দিল সকলের উপর। নৃত্যের চরম-ক্ষণে ঢাকির যখন হস্ত স্খলন হয়ে তালভঙ্গ হল, তখন সেই রমণীই যেন তার ভুরুজোড়া দিয়ে কাঠির কাজ করে ঢাকি হয়ে গেল। তার বক্র কটাক্ষ যেন চারদিকে ছড়িয়ে-পড়া চাঁদের আলো। তার স্পন্দিত ভুরুর শোভা যেন এক রাশি নীলপদ্ম ফোটার মতোই মনোহর। নিষ্পলকনয়নে নৃত্যদর্শক দেবতাও মানুষের চোখে মদন যে অমৃত লুকিয়ে রেখেছিল, রমণীর নাভি ও বগল যেন সেই অমৃত পানের জন্য সামনে ঝুঁকে পড়ছিল। স্বর্গের কবিরা নৃত্যের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। অগ্নিদেব আনন্দিত। কিন্তু হায়! নৃত্য যখন পুরোদমে চলছে, রমণীর জীবনদীপ নিভে গেল। বিদ্যুতের মতো আকস্মিকতায় রঙ্গমঞ্চ থেকে রমণী অন্তর্হিত। পাছে সেই আনন্দময় অভিজ্ঞতায় বাধা পড়ে, সেই ভয়ে ইন্দ্র অনুরূপ একটি রমণী সৃষ্টি করে রঙ্গমঞ্চে দাঁড় করিয়ে দিল। দেবাসুর কেউ এই পরিবর্তন কৌশলের আভাসমাত্র পেল না। কিন্তু আদিদেব সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে পেরে দেহের নশ্বর প্রকৃতি দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। 'হায়, রমণীর এই রমণীয় শরীর অকস্মাৎ হারিয়ে গেল। এত তুচ্ছ এত ভঙ্গুর এই জীবন। এই জীবনে আমার কোনো প্রয়োজন নেই।' এই বলে সে দৃঢ় সংকল্প হয়ে বলতে লাগল, 'নর্তকী কেবল বিচিত্র বর্ণময়ী নৃত্যই প্রদর্শন করে নি, সে আমাকে বেশ ভালোভাবেই দেখিয়েছে এই জীবন-নাট্যও। মানুষের সুখ-ভোগ কত অস্থায়ী। অসংখ্য সমুদ্র থেকে জলপান করা চলে, কিন্তু এই অনিবারণীয় তৃষ্ণা কি একটি শিশির বিন্দুতে মেটে ? অনেক রাজা সম্রাট হয়ে-ছিলেন কিন্তু জন্ম-মৃত্যুর এই অনন্ত আবর্তে বাঁধা পড়ে যান, কারণ তাঁরা প্রকৃত ধর্মপথ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে নিজেকে ভুলে গিয়ে ইন্দ্রিয় সুখে নিমজ্জিত হয়ে পড়েন। আমিও তো তাই করে এসেছি এতদিন। আর নয়। তাই বলে তিনি সংসার ত্যাগ করে মনকে মুক্তিকামী করে তুললেন। সমগ্র ঘটনার মধ্যে একটি রোমাঞ্চকর নাট্যগুণ বর্তমান। কবি পম্প এর পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে গিয়ে তার অফুরন্ত কল্পনাশক্তিকে কাজে লাগিয়েছেন। সম্পূর্ণ জীবন্ত চিত্রাঙ্কন করে কবি তার প্রকৃত তাৎপর্য প্রকাশ করেছেন। 'পূর্বপুরাণ' এবং 'আদি-

পুরাণ' উভয় গ্রন্থে ধর্মীয় অভিপ্রায়ের সঙ্গে কাব্যসৌন্দর্যের মিশ্রণ ঘটেছে। একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে দুখানির মধ্যে কেবল পম্প-রচিত 'আদি-পুরাণ' গ্রন্থেই এই মিশ্রণ সার্থকতা লাভ করেছে।

তৃতীয়ত, ভরত ও বাহুবলির উপাখ্যানটিও স্মরণ করা যেতে পারে। আদি-দেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র সম্রাট ভরত দিগ্‌বিজয় শেষে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতার প্রতীক যে চক্রটি ভরতের সম্মুখে চলমান থাকত, সহসা সেই চক্র রাজদ্বারে এসে থেমে গেল, কারণ তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতারা ভরতের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতে এবং তাঁকে প্রণাম জানাতে নারাজ। সবচেয়ে সাহসী ভাই তাঁকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করে। যুদ্ধে ভরত পরাজিত এবং বাহু-বলি বিজয়ী হয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, বিজয়ী বাহুবলি তার জয়লাভে উল্লসিত না হয়ে কেমন নম্র হয়ে পড়ে। ক্ষমতালিপ্সা ও দম্ভের ফলে তাঁর শক্তি-মান জ্যেষ্ঠের গমন সম্পর্কে বাহুবলি অনেকক্ষণ ভাবল, ভাবতে ভাবতে পার্থিব ক্ষমতা, ঐশ্বর্য ও আনন্দ সম্পর্কে বীতরাগ হয়ে উঠল। অতঃপর সংসার ছেড়ে তপস্যার জন্য সে বনে প্রস্থান করল। ছোট ভাইয়ের এই অসাধারণ আত্ম-ত্যাগে ভরতও কিছুকাল পরে ভাইয়ের অনুসরণ করল। পম্প উভয় চরিত্রের মনুষ্যত্ব ও মহত্ত্বকে গম্ভীর অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে উপলব্ধি করে এই উপাখ্যানটিকে বিশেষ কৌশলের সঙ্গে বর্ণনা করেছেন।

এইভাবে দেখা যায় 'আদিপুরাণ' গ্রন্থটির বেশ কয়েকটি অংশে ধর্ম ও কাব্যের দাবী মেটানো হয়েছে। বহুক্ষেত্রে ধর্ম সাম্প্রদায়িক রূপে না গিয়ে বিশ্বজনীন হয়ে উঠেছে। যেমন, পম্প যখন বলেন যে, যে-ধর্মের মধ্যে করুণা, সংযম, দানশীলতা, তপস্যা ও চরিত্রবল রয়েছে, সেই ধর্ম পার্থিব সুখভোগে মগ্ন মানুষকে উদ্ধার করে মুক্তির পথে নিয়ে যায়, তখন মনে হয় এ তো শুধু জৈনধর্মের কথা নয়, এ কথা সকল ধর্ম সম্পর্কেই সত্য। একটি বিশেষ চিত্রকল্প দিয়ে কবি ধর্ম, অর্থ ও কামের সম্বন্ধটি নির্ণয় করেছেন। বলেছেন, অর্থ হল ধর্মর ফলস্বরূপ এবং কাম হচ্ছে সেই ফলের রস। তাৎপর্য এই যে ফল ও তার রস যেমন একটি গাছের স্বাভাবিক সৃষ্টি, তেমনি অর্থ ও কাম প্রকৃতধর্মের স্বাভাবিক পরিণতি। অন্য এক স্থলে কবি স্পষ্ট করে বলেছেন যে, বিভিন্ন কৃতির জন্যই মানুষকে বিভিন্ন বর্ণে বিভক্ত করা হয়েছে নয়তো মনুষ্য মাত্রেই প্রকৃতপক্ষে এক ও অভিন্ন। হাজার বছর আগেকার এই ঘোষণা

পম্প-র উপরে দৃষ্টিভঙ্গির জোরালো প্রমাণ বলে গণ্য হতে পারে, কারণ এই ঘোষণার মধ্যে এমন একটি চিরন্তন সত্য রয়েছে যা আধুনিক যুগসহ সমস্ত যুগের মানুষকে প্রেরণা দেবে। তাই বলা যায়, 'পূর্বপুরাণ'-এর কাছে ঋণী হলেও 'আদিপুরাণ' ভাবে ও দৃষ্টিভঙ্গিতে অদ্বিতীয়। সত্য বটে বইটির স্থানে স্থানে শব্দাড়ম্বরপূর্ণ পাণ্ডিত্য সহকারে নীরস তত্ত্বের অবতারণা করাও হয়েছে। তবু মোটের উপর বলা যায়, চারিদিকে লতাপাতায় সমাচ্ছন্ন ও উই-ঢিপি পরিবৃত হয়ে গোমটেশ্বরের উন্নত মূর্তি যেমন দাঁড়িয়ে আছে, পম্প রচিত 'আদিপুরাণ'ও তেমনি ধ্রুপদী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনরূপে বিরাজমান।

পম্প-র দ্বিতীয় গ্রন্থ চম্পূ কাব্য আকারে রচিত 'পম্পভারত'। কবি এই কাব্যের যে নাম দিয়েছেন 'বিক্রমার্জুনবিজয়' তাতেই বোঝা যায় যে কবির কাহিনীতে অর্জুনকেই মুখ্য স্থান দেওয়া হয়েছে। মনে রাখা প্রয়োজন এই অর্জুন আর কেউ নন, কবির মহান পৃষ্ঠপোষক স্বয়ং রাজা অতিকেশরী। অর্জুনের গৌরব বৃদ্ধির জন্য যেসব বিশেষণ ব্যবহার করা হয়েছে তার সবগুলিই কবি তাঁর পৃষ্ঠপোষকের উদ্দেশ্যেই প্রয়োগ করতে চান। সর্বত্র এই মিল সহজ হয় নি বটে, তবু কল্পনায় ও তার রূপায়ণে কবির শ্লেষ অতুলনীয়।

'পম্পভারতে'র মূল প্রেরণা ব্যাসদেবের মহাভারত। কিন্তু পম্প ব্যাসদেবের অন্ধ অনুকরণ করেন নি। জহুরি যেমন খনি থেকে তোলা কাঁচা হীরেকে পালিশ করে রূপদান করে, পম্পও অনেকটা তাই করেছেন। পম্পর প্রতিভার বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি একাধারে সমস্ত ভারত ও সংক্ষিপ্ত ভারত রচনা করেছেন যার মধ্যে কবির সমকালীন রাজনৈতিক ছবিরও আভাস পাওয়া যায়। মূল মহাভারতের প্রধান প্রধান কাহিনী অক্ষুণ্ণ রেখে গৌণ ঘটনাগুলিকে সুলভ ও অভ্রান্ত মাত্রাজ্ঞান দিয়ে সন্নিবেশ করেছেন। কখনো কখনো একটা গোটা কাহিনীকে একটি মাত্র স্তবকে ভরে দিয়েছেন, তবু তা জীবন্ত ও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কাহিনীর অন্তর্নিহিত মানবিক সংঘাত এমন সাফল্যের সঙ্গে চিত্রিত হয় যে তা যুক্তিবাদী মনকে নাড়া না দিয়ে পারে না।

পম্প কখনো কখনো তাঁর নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী মূল থেকে সরে গিয়ে কাহিনীকে সংক্ষিপ্ত ও নতুন করে ঢেলে সাজিয়েছেন। একটা বড় পরিবর্তন হল, অর্জুনকে বীর নায়করূপে প্রতিষ্ঠিত করে পৃষ্ঠপোষক রাজা অতিকেশরীর সঙ্গে অর্জুনকে এক করে দেখা (অভিন্ন প্রতিপন্ন করা) ফলে অর্জুনের স্ত্রী

সুভদ্রা যেরূপ উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত, দ্রৌপদী তেমনি নিষ্প্রভ। মূল গল্পে সমস্ত পঞ্চ পাণ্ডব ভ্রাতাদের দ্রৌপদীই একমাত্র পত্নী। 'পম্পভারতে' সে একমাত্র অর্জুনের স্ত্রী। কিন্তু কবির ঔচিত্যবোধ গল্প বর্ণনায় দ্বিধাগ্রস্ত। দ্রৌপদীকে রাজসভায় টেনে এনে দুঃশাসন যখন অপমানিত ও লাঞ্ছিত করে, তখন কিন্তু একা ভীমই এই অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণে কৃতসংকল্প। কিন্তু যুদ্ধ শেষে পাণ্ডবদের বিজয় লাভের পরে মহারাণীর মুকুট শোভা পেল সুভদ্রার ললাটে। দুঃখকষ্ট যা কিছু দ্রৌপদীর, গৌরব ও আনন্দের ভাগ সুভদ্রার। আবার ভীম তার প্রতিজ্ঞা পূরণের পরে দ্রৌপদীর বেণী বন্ধন করে দেয়, অর্জুনকে কিন্তু তখন উত্তেজিত দেখা যায় নি। এর থেকে বোঝা যায় পম্প গল্পের জটিল জালে জড়িয়ে পড়ে তাঁর প্রস্তাবিত পরিবর্তনে সর্বদা সঙ্গতি রাখতে পারেন নি। এইটুকু বাদ দিলে, পাণ্ডব ও কৌরবদের সংঘাত ও সংকট বর্ণনায়, আখ্যান বিন্যাসে এবং বিচিত্র চরিত্রের রূপদানে কবি মোটের উপর উজ্জ্বল সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন। তাই বলা যায়, পম্প সাধারণভাবে ভারতীয় সাহিত্যে এবং বিশেষভাবে কন্নড সাহিত্যে অমূল্য উপহাররূপে একখানি মহৎ ধ্রুপদী গ্রন্থ দান করে গেছেন।

পম্পর কবিপ্রতিভা স্পর্শমণির মতো মহাভারতের গল্পতে সোনায় রূপান্তরিত করে একটি অনবদ্য চিত্ররূপ তৈরি করেছেন। কবির সংক্ষেপী-করণের ক্ষমতা এবং ঔচিত্যবোধ অসাধারণ। তাঁর সংক্ষেপ কখনো মূলের দীর্ঘ অংশের নীরস সংক্ষিপ্তসার নয়। যখন তিনি দ্রুত এগিয়ে যাবার জন্য বর্ণনা ছেঁটে দেন, তখনও তাঁর চরিত্রগুলি জীবন্ত হয়ে ওঠে। যেমন শান্তনু ও সত্যবতীর প্রেমের ঘটনা। পম্পর বর্ণনা এইরূপ: শান্তনু যখন শিকারে বেরিয়ে একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তখন সেই হরিণাক্ষীর মদির কেশের সুগন্ধ বাতাসে ভেসে ভেসে এল। নারীসৌন্দর্যে আকৃষ্ট শান্তনু সত্যবতীর প্রেমে মুগ্ধ হয়ে তার পাণি গ্রহণ করল, যেন খালি হাতে একটি তপ্তলৌহশলাকা স্পর্শ করেছে। শান্তনু আন্তরিক অনুরাগের সুরে বলল, 'এসো, আমরা দুজনে চলে যাই।' তাতে লজ্জিতা বালা উত্তর দিল, 'আমার অনুরোধ, আপনি আমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করুন।' এখানে দেখছি, রূপোন্মত্ত শান্তনুর তীব্র আকাঙ্ক্ষা, সেই আকাঙ্ক্ষা প্রকাশের ইঙ্গিত এবং সর্বোপরি সত্যবতীর প্রেমপূর্ণ, লজ্জাজড়িত, সংযত ও কৌশলী উত্তর—সব কিছু কবি একটিমাত্র

স্তবকের মধ্যে প্রকাশ করেছেন। যখন আমরা মহাভারতের মূল উপখ্যানের সমস্ত ঘটনা স্মরণ করি, তখন পিতার সম্মতিলাভের জন্য শান্তনুর কাছে সত্যবতীর প্রার্থনা বিশেষ তাৎপর্য লাভ করে। এই কাহিনীতেই পাণ্ডব-কৌরবের সংঘাতের বীজ নিহিত, এখানেই ভীষ্মের প্রতিজ্ঞার মূল। একথা সুবিদিত যে সত্যবতীর পিতা শ্যান্তনুর প্রস্তাবে সম্মতি দেওয়ার আগে একটি শর্ত রেখেছিলেন যে, এই বিবাহের সন্তান শান্তনুর সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হবে। এরই ফলস্বরূপ ভীষ্মের উদার প্রতিশ্রুতি ও শপথ গ্রহণ এবং কুরুক্ষেত্রের রক্তস্নান পর্যন্ত সমস্ত ঘটনা-পরম্পরা সজ্জিত। পম্প-কবির প্রতিভা-গুণে ক্ষুদ্র একটি বাক্যের মধ্য দিয়ে অতি সহজে পরবর্তী বিয়োগান্ত ঘটনাবলীর পূর্বাভাস পাওয়া গেল। সংক্ষেপীকরণের আর একটি দৃষ্টান্ত হল পাণ্ডুরাজের মৃত্যু। একদিন বসন্তের মনোরম পরিবেশে মুনি-অভিশাপগ্রস্ত পাণ্ডুরাজ স্বীয় পুষ্পাভরণ সজ্জিতা পত্নী মাদ্রীকে দেখে কামমোহিতের অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণে যেন মৃত্যুব সঙ্গে কোলাকুলি করতে চাইছে এমনি করে স্ত্রীকে আলিঙ্গন পাশে আবদ্ধ করলেন। 'তখন কঠিন বাহুবন্ধন শিথিল হয়ে গেল, পাণ্ডুরাজের মুখ একপাশে ঝুলে পড়ল, উজ্জ্বল চোখ দুটি ধীরে ধীরে মুদ্রিত হল এবং শ্বাস বন্ধ হয়ে গেল। স্বামীকে মূর্ছিত অবস্থায় পড়ে যেতে দেখে মাদ্রী ভয়ে আর্তনাদ করে উঠল, 'আমার *প্রিয়স্বামী* কি ক্লান্ত না মূর্ছিত?' তখনও মাদ্রীর একান্ত আশা তাঁর স্বামী বেঁচে আছেন। এখানেও আমরা দেখতে পাই অত্যুগ্র কামনার পরিণামে সংঘটিত মর্মান্তিক দুঃখের প্রাণস্পর্শী চিত্র।

মহাভারতের কয়েকটি সঙ্কটপূর্ণ দৃশ্য রচনায় পম্পর কবিপ্রতিভাকে আরও সমুন্নতরূপে দেখা যায়। এর একটি চমৎকার উদাহরণ দ্যূতক্রীড়ার উপাখ্যান। পম্প তাঁর শব্দের ঐশ্বর্য ও বৈচিত্র্য দিয়ে প্রবল আবেগ ভরে এই দৃশ্যটি সবিস্তারে উপস্থাপিত করেছেন। শকুনির পরামর্শে দুর্যোধন একদা যুধিষ্ঠিরকে একটি মনোরম অবকাশের দিনে সঙ্গদানের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে নানাবিধ আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করে। একদিন যুধিষ্ঠির প্রভৃতি অন্যেরা পাশাখেলা দেখছিলেন। কিছুক্ষণ পরে শকুনি বলে উঠল, 'কেবল দর্শনে কী মজা! তোমরাও খেলে দেখো না।' এইভাবে যুধিষ্ঠির নিজের অজ্ঞাতসারে জালে আবদ্ধ হন। শকুনির ষড়যন্ত্রমত এই ছলনার নাট্য শেষে যুধিষ্ঠির বাজি

ধমে রাজ্য ও দ্রৌপদীকে হারিয়ে বসেন। দুর্যোধনের আদেশে দুঃশাসন দ্রৌপদীকে রাজসভায় টেনে এনে ভীষ্ম প্রমুখ প্রবীণদের উপদেশ অগ্রাহ্য করে তীব্র ঘৃণাভরে দ্রৌপদীকে বলে, 'তুমি তো ক্রীতদাসী, ক্রীতদাসীর উঞ্ছবৃত্তিই তোমার প্রাপ্য।' এই বলে দুঃশাসন যেন মৃত্যুকে আলিঙ্গন করছে এইভাবে দ্রৌপদীর বেণী আকর্ষণ করতে থাকে। এখান থেকে শুরু করে এই উপাখ্যানটুকু বাকি অংশে পম্পর প্রতিভা একেবারে উত্তুঙ্গ হয়ে উঠেছে। রাজসভায় সমবেত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রকৃতি ও দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী তাঁদের তীব্র প্রতিক্রিয়া বর্ণনা যেমন জীবন্ত হয়ে উঠেছে, তেমনি দ্রৌপদী ও ভীমের চূড়ান্ত ঘৃণামিশ্রিত ক্রোধের প্রকাশও উজ্জ্বলরূপে চিত্রিত। দ্রৌপদী যখন দেখতে পেল যে তার আকুল আবেদন ব্যর্থ করে দিয়ে কেউ তার সাহায্যে এগিয়ে এল না, সে তখন তার আলুলায়িত বেণীকুন্তলের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে গর্জন করে উঠল, 'যতদিন পর্যন্ত না কোনো বীরপুরুষ আমার কেশাকর্ষণকারী শয়তানকে বধ করে তার নাড়ীভুঁড়ির গ্রন্থি দিয়ে আমার বেণীবন্ধন করে, তকদিন আমার চুল এমনি এলোমেলো থাক।' ভীম কতক্ষণ দ্বিধাগ্রস্ত ছিল এই ভেবে যে সে তার জ্যেষ্ঠের সত্যপরায়ণতার বিরুদ্ধ-বাদী হবে কিনা। কিন্তু যখন তার কানে দ্রৌপদীর জ্বালাময়ী শব্দ গিয়ে পৌঁছল তখন ধূপ যেমন ভূতকে তাড়া করে ভীমও তেমনি বিচলিত হয়ে আত্মসংবরণে অসমর্থ হল। তৎক্ষণাৎ তার কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়ে উঠল, 'দ্রৌপদী, বেশি নয়, তোমার একটি ক্রোধপূর্ণ বাক্যই যথেষ্ট। আমার কথা শোনো। প্রবল বিধ্বংসী অগ্নির জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ডের মতো আমার গদার প্রচণ্ড আঘাতে দুঃশাসনকে ধরাশায়ী করে আমি তোমার ইচ্ছানুযায়ী তার নাড়ী-ভুঁড়ি দিয়ে তোমার বেণীবন্ধন করব। কেবল তাই নয়, আমি তার বক্ষ বিদীর্ণ করে ঢক ঢক করে রক্ত পান করব। ঐ যে উজ্জ্বল রত্নখচিত দুর্যোধনের মুকুট, ঐ মুকুট চূর্ণ করে রক্তচক্ষু পাপিষ্ঠের উরুভঙ্গ করব। আমাকে বিশ্বাস করো দ্রৌপদী, ঐ শত্রুদের দিকে যখনই তাকাই, আমার চোখ থেকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ও জ্বলন্ত কয়লা বেরিয়ে আসছে।' ভীমের এই ভয়ঙ্কর শপথ পম্পর কাব্যে এমন শক্তি নিয়ে প্রকাশিত যে অন্য ভাষায় তার অনুবাদ সম্ভব নয়। প্রলয়ের দিনে ঝড়ের মেঘের মতো ভীম পুনরায় তার প্রতিজ্ঞার

কথায় ভীষ্ম প্রমুখ প্রবীণদের সম্মুখে গর্জে উঠল। প্রবলবাত্যা যে শক্তিতে মেঘকে উড়িয়ে নেয়, পম্পর এই অংশে সেই শক্তিরই প্রকাশ।

পরে পাণ্ডবদের বনগমনকালে কবির সেই প্রচণ্ড শক্তি অকস্মাৎ স্তব্ধ ঝড়ের মতো মৃদু-মধুর বাক্যরাশিতে পরিবর্তিত হয়ে নির্বাসিত পাণ্ডবদের জন্য সাধারণ মানুষের সহানুভূতি ব্যক্ত করে। পঞ্চ পাণ্ডব যখন নগর পরিত্যাগ করে, তখন পথের দুইপার্শ্বে সারিবদ্ধ নাগরিক উচ্চকণ্ঠে বলে উঠল, 'কী সুদুর্লভ পুরুষ ধর্মরাজ! কী অজেয় বীর ভীম, অর্জুন এবং তাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা নকুল ও সহদেব! হায়, আজ তাদের সম্মুখে এই বিপদ। মূর্খ দুর্যোধন পাশা খেলার জয়ে মত্ত হয়ে ভূমি অধিকার করে কর্তব্যবিস্মৃত! সে দেখতে পায় না তার মাথার পক্ককেশে অদৃশ্য উদ্যত যমদণ্ড, সে দেখছে কেবল সামনে তার দুগ্ধ পাত্র। এই প্রবাদতুল্য বাক্যটি আসন্ন যুদ্ধে দুর্যোধনের চরম সর্বনাশের ইঙ্গিত।

পম্পর সমুচ্চ প্রতিভার প্রকাশ ঘটেছে যেমন চরিত্রসৃজনে তেমনি ঘটনা-সংস্থানে। মহাভারতের সমস্ত চরিত্র সম্পর্কে তিনি গভীর বোধশক্তির পরিচয় দিয়েছেন এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রকৃত অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে সেগুলিকে চিত্রিত করেছেন। কাব্যের শেষভাগে যদিও কবি ঘোষণা করেছেন যে এক-একটি চরিত্রকে তিনি এক-একটি দোষ বা গুণের প্রতিমূর্তিরূপে দেখিয়েছেন (যেমন দুর্যোধন অদম্যতার প্রতিমূর্তি, কর্ণ সত্যপরায়ণতার, ভীম বীর্যবত্তার ইত্যাদি), তবু বলা উচিত তারা কোনো একটি গুণের বা দোষের ছাঁচে ঢালাই হয়নি, তারা জটিল ব্যক্তিত্ব সমন্বিত আসল জীবন্ত মানুষ। দুর্যোধন যখন ভীমকে কৌরববাহিনীর সেনাপতিত্ব দিয়ে সম্মানিত করবে স্থির করল, তখন ভীষ্ম ও কর্ণচরিত্রের পার্থক্য খুব লক্ষণীয়। বার্ধক্যবশত ভীষ্ম সেনাপতিত্ব লাভের সম্পূর্ণ অযোগ্য বলে কর্ণ তাচ্ছিল্য প্রকাশ করলে, দ্রোণ তাকে এই বলে ভর্ৎসনা করেন, 'তুমি যে ভীষ্মের মতো একজন প্রধান ব্যক্তি সম্পর্কে এরূপ কদর্য ভাষায় কথা বলছ, তাতে বোঝা যায় তোমার জন্ম অতি নীচ কুলে।' তৎক্ষণাৎ কর্ণ ক্রোধে জ্বলে উঠে বলল, 'আপনি অনেকক্ষণ যাবত কুলের বড়াই করছেন। কুলের কী প্রয়োজন? আমাকে যে কেউ আক্রমণ করুক, আমি তাকে গ্রাস করব। সে শক্তি আমার আছে। 'কুল' প্রকৃত কুল নয়, 'চল' (অর্থাৎ দৃঢ়তাই) প্রকৃত কুল। 'কুল' মানে মেধা,

আত্মসম্মান ও বীর্যবত্তা। কুল সম্পর্কে আপনার ধারণা এই যুদ্ধে আপনাকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাবে।' কর্ণের এই সমস্ত কথার উত্তরে ভীষ্মের উক্তি যেমন সংযত তেমনি মহিমান্বিত, 'ওহে কর্ণ', তোমার মতো আমি কি অমিত বীর্যের অধিকারী, অথবা আমার আছে যৌবনের মত্ততা অথবা রাজার প্রত্যয় ও বাহুর শক্তি? এই ভারতযুদ্ধে আমাদের মুখোমুখি হতে হবে যে বীর পুরুষের তার নাম অর্জুন। তুমি মর্মাহতের মতো কথা বলছ কেন? এই মহান যুদ্ধক্ষেত্রে তুমিও তোমার সুযোগ পাবে।' ভীষ্মের শেষ বাক্যটিতে যে বক্রোক্তি, তা একদিকে যেমন শান্ত, অন্যদিকে তেমনি সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ। ব্যঞ্জনা এই যে 'আজ আমি (অর্থাৎ ভীষ্ম) যেমন কর্তৃত্ব পেয়েছি, একদিন তুমিও তেমনি সেনাপতি হবে। কিন্তু তা কেবল যুদ্ধ করে শেষ হয়ে যাবার জন্য, জয়ের জন্য নয়।' কবির ইঙ্গিত এই যে ভীষ্ম তাঁর দূরদৃষ্টি দিয়ে বুঝতে পেরেছিলেন যে এই যুদ্ধে পাণ্ডবদের জয় অবশ্যম্ভাবী। কাহিনীর শেষভাগে কর্ণচরিত্রে হঠকারিত ও দম্ভের পরিবর্তে দেখতে পাই নম্রতা ও আত্মত্যাগ। পাঠকের সামনে এসে দাঁড়ায় এক মহৎ ব্যক্তিত্ব—সত্যপরায়ণ, দানশীল, অনুগত ও কর্তব্যনিষ্ঠ। কৌরববাহিনীর সেনাপতিরূপে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশের পূর্বে কর্ণ শরশয্যাশায়ী ভীষ্মের কাছে গিয়ে ললাট দিয়ে সেই বৃদ্ধের চরণে প্রণাম করে ক্ষমা প্রার্থনা করল।

কর্ণের অনুতাপ দর্শনে ভীষ্ম গভীরভাবে অভিভূত হন। পূর্ব তিক্ত কথা ভুলে গিয়ে শান্ত মর্যাদাপূর্ণ ভঙ্গীতে উত্তর দিলেন। চরিত্রের অন্তর্দৃষ্টি সম্পর্কে এই দৃশ্যটি কবির পরীক্ষাস্থল। এখানে আমরা দেখতে পাই অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে চরিত্র গড়ে ওঠে এবং জীবন্ত মানুষরূপে দেখা দেয়। কাব্যের শেষাংশ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে কর্ণের প্রতি কবির শ্রদ্ধা ও অনুরাগ ছিল গভীর। কর্ণের সেনাপতিত্ব লাভ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কবি তাঁকে এতটা জায়গা দিয়েছেন যেন কর্ণই এই কাব্যের নায়ক। অর্জুনের শরাঘাতে কর্ণের পতনের মুহূর্তে কবি তাঁর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। শেষ স্তবকে পম্প যা বলেছেন তা একজন নায়কের প্রতি কবির শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধার্ঘ্য। পাঠককে সম্বোধন করে কবির উক্তি, 'হে তাতঃ, মহাভারতে আর কোনো ব্যক্তিকে স্মরণ করবার প্রয়োজন নেই। তুমি যদি অনন্যমনা হয়ে একটি চরিত্রকে স্মরণ করতে চাও, তবে কর্ণকে স্মরণ করো। মহত্ত্বে, সত্যনিষ্ঠায়, বীর্যে ও আত্মত্যাগে কর্ণের সমকক্ষ কে? লোকে

কর্ণের কথা বললে মহাভারতের কাহিনী 'কর্ণরসায়ন' (কর্ণে অমৃতের মতো মধুর) হয়ে ওঠে।

'পম্পভারতে'র আর একটি স্মরণীয় কীর্তি দুর্যোধনের চরিত্র। ব্যাসদেবের দুর্যোধন বড় যোদ্ধা ছিল বটে, সেই সঙ্গে ছিল লোভী, দুষ্ট, আত্মম্ভরি ও গোঁড়া। সংস্কৃত ও অন্যান্য ভাষার অপর কবিরা দুর্যোধনের চরিত্র নিজ নিজ ভঙ্গীতে রূপায়িত করেছেন। পম্প যদিও ব্যাসদেবের মূল কাহিনীকে অনুসরণ করেছেন তথাপি কাব্যের শেষাংশে তিনি নতুন আলোকপাত করে মূল মহাভারতের কিছু কিছু অসঙ্গতি দূর করবার চেষ্টা করেছেন। কেউ কেউ দুর্যোধনকে মহাত্মা বলে মনে করেন, কিন্তু বস্তুত সে ছিল প্রবল পক্ষপাতসম্পন্ন অতি উচ্চাকাঙ্ক্ষী নায়ক। পম্পর বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি দুর্যোধনের লোভ ও ঘৃণার কথা না বলে তার ব্যক্তিত্বের কয়েকটি মহৎ গুণাবলীর উল্লেখ করে চরিত্রটিকে উচ্চে তুলে ধরেছেন। প্রথম দিককার লোভী ও ঈর্ষ্যাপরায়ণ দুর্যোধন শেষের দিকে বহু মনোরম গুণসম্পন্ন নায়কে পরিণত হয়ে তার পূর্ব রূপকে ভুলিয়ে দেয়। কর্ণের মৃত্যুর পরে দুর্যোধনের বিলাপ স্মরণীয়: 'আমাদের দেহ ভিন্ন হলেও আত্মা প্রাণ ছিল এক। আমি তোমাকে ভালোবেসেছিলাম আমার নিজের কাজের জন্য (অর্থাৎ স্বার্থপরতা বশত)। সুতরাং আমিই তোমার নিধনের কারণ।' দুর্যোধন কখনো হতাশ্বাস হয় নি এবং তার পিতামাতা পাণ্ডবদের সঙ্গে শান্তি স্থাপনের কথা বললেও সে সম্মত হয় নি। বাবা-মায়ের উদ্দেশ্যে দুর্যোধনের উক্তি, 'এমন নয় যে নিরীহ পাণ্ডবদের সঙ্গে আমি শান্তিতে থাকতে পারি না, কিন্তু শত্রু শত্রু, তাকে যেমন করে হোক প্রতিরোধ করতে হবে, এই পৃথিবীর জন্য আমার কোনো অনুরাগ নেই কারণ এই পৃথিবীর মাটি কর্ণের রথকে গ্রাস করেছে।' দুর্যোধন রীতিমতো যুদ্ধক্ষেত্রে সমস্ত অশুভ লক্ষণ ও দৈব দুর্যোগের সম্মুখীন হয়েছে। বৈশম্পায়ন সরোবর থেকে উত্থানের পরে ভীমের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে দুর্যোধন ভগ্ন উরু ও চূর্ণ মুকুট সমেত ভূপতিত হয়। তার মৃত্যু বীরের মৃত্যু। সে যা বলেছে শেষ পর্যন্ত তা পালন করেছে, যা সে করতে চেয়েছে তার থেকে ভয় পেয়ে সে পিছিয়ে আসে নি। যা সে শপথ করেছে, দেহপতন পর্যন্ত তা পূর্ণ করবার চেষ্টা করেছে। কী দাম্ভিক বীর! এই হল কর্ণ সম্পর্কে পম্প বর্ণিত স্তুতি।

'পম্পভারত' কন্নড কাব্য সাহিত্যের একখানি চিরায়ত গ্রন্থ। যে কোনো

দিক থেকে পরীক্ষা করা যাক না কেন, গ্রন্থখানিতে নতুন অর্থ ও নতুন আনন্দের উৎস পাওয়া যায়। চিত্রকল্পের ঐশ্বর্য, শব্দ প্রয়োগের সাবলীলতা ও ঔচিত্য-বোধ, ধ্বনিগৌরব, ছন্দোবৈচিত্র্য এবং প্রচলিত বাগ্‌বিধি ও প্রবাদের উপর অধিকার—যে কোনো দিক দিয়ে অধ্যয়ন করা যাক, বিস্ময়বোধ পাঠককে অভি-ভূত না করে পারে না। এই হল মহৎ কাব্যের লক্ষণ। পম্প নিজেই বলেছেন, কবিতার জগৎ হবে সমুদ্রের মতো চিরনবীন ও চিরগম্ভীর। কবিতায় থাকবে জীবনের সারবস্তু এবং কবিতা প্রচার করবে প্রকৃত ধর্ম ও সংস্কৃতির বার্তা। 'আদিপুরাণ'-এর মতো 'পম্পভারতে'ও মহৎ কবিতার গুণাবলী বর্তমান। বরং বলা চলে 'পম্পভারত' অধিকতর পরিণত এবং শিল্পগুণে মহত্তর। যদিও বাহ্যত ধর্ম-নিরপেক্ষ তথাপি এই গ্রন্থে ধর্ম ও সংস্কৃতি জগতের কথা বিদ্যমান। উদাহরণ স্বরূপ, বনবাসীর সৌন্দর্য বর্ণনা করা হয়েছে যে চারটি স্তবকে, সেখানে পম্প আদর্শ মানুষের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন যে সেই মানুষ হবে একাধারে ত্যাগী ও ভোগী, বিদ্বান ও সংস্কৃতিমান, সঙ্গীতপ্রিয় ও সামাজিক। এই সমন্বয় পম্প কর্ণাটকের সংস্কৃতিতে লক্ষ্য করেছেন এবং নিজের ব্যক্তিত্বে আত্মস্থ করবার চেষ্টা করেছেন।

চতুর্থ অধ্যায়
প্রাচীন যুগ ২
পোন্ন-রন্ন

দশম শতাব্দীর দুই কবি পোন্ন ও রন্ন মহাকবি পম্পর প্রায় সমকালীন ছিলেন। যেহেতু এই তিনজনেই তাঁদের 'পুরাণ' রচনায় জৈন চিন্তাধারার বিশদ আলোচনা করেছেন, তাই তাঁরা একসঙ্গে 'রত্নত্রয়' নামে অভিহিত। পম্প ও রন্নর ন্যায় পোন্নও ঐতিহ্য অনুযায়ী একখানি লৌকিক ও একখানি ধর্মীয় গ্রন্থ রচনা করেন বলে মনে হয়। লৌকিক গ্রন্থের নাম 'রামকথে' অথবা 'ভুবনৈকরামাভ্যুদয়', ধর্মীয় গ্রন্থের নাম 'শান্তিপুরাণ'। 'রামকথে' বইটি অপ্রাপ্য, যদিও ইতস্তত সেই গ্রন্থের কিছু শ্লোক পাওয়া যায়।

আমাদের হাতে এসে পৌঁচেছে পোন্নর একখানি গ্রন্থ 'শান্তিপুরাণ'। জৈনপুরাণ রীতি অনুসরণে বইটি শান্তিনাথ তীর্থঙ্করের জীবনচরিত। বইটির বেশির ভাগ শান্তিনাথের পূর্ব পূর্ব একাদশ জন্মের বিস্তৃত জটিল বিবরণে পূর্ণ। প্রায় সর্বত্র কবি আড়ম্বরপূর্ণ ভাষায় বর্ণনা এবং সম্প্রদায়ের কথা ব্যাখ্যা করেছেন। পম্পর 'আদিপুরাণ'-এর মতো এখানে এমন একটি দৃশ্য নেই যা আকৃষ্ট করে, এমন একটি চরিত্র নেই যা মনে দাগ কাটে। তবে তাঁর কৃতিত্বের কথা এইটুকু বলা যায় যে মামুলী প্রথার মধ্য দিয়েও কখনো একটি উজ্জ্বল চিত্রকলা, কখনো-বা একটি সুন্দর পদ বা পদগুচ্ছ রন্নর কবি-প্রতিভার আভাস দেয়। তাঁর অন্য গ্রন্থখানিতে হয়তো কবি নিজেকে প্রকাশের অধিকতর সুযোগ পেয়েছিলেন। সেই গ্রন্থ না পাওয়া পর্যন্ত পোন্নর প্রতি হয়ত সুবিচার করা হবে না।

কবি রন্ন কন্নড কাব্যজগৎকে তাঁর অনন্য দীপ্তিতে উদ্‌ভাসিত করে মহা-কবিরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। উত্তর কর্ণাটকের এক স্বর্ণকার পরিবারে তাঁর জন্ম। দক্ষিণের জৈন বিদ্যাকেন্দ্রে ঘুরে ঘুরে তিনি ব্যাকরণ ও ধ্রুপদী সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। জন্মভূমিতে প্রত্যাবর্তন করে তিনি চালুক্য সম্রাট সত্যাশ্রয়ের সভাকবিরূপে মনোনীত হন। তাঁর ব্যক্তিত্বে আমরা দেখতে পাই এক সাহসী কবিকে যিনি প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই করে নিজের চেষ্টায় নিজের ভাগ্য গড়ে তুলে ছিলেন। আত্মপ্রশংসায় তিনি অকুণ্ঠ ছিলেন। তাঁর

উৎসাহ ছিল অপরিমিত, প্রেরণা ছিল বাধাবন্ধহীন। জীবনে তথা সাহিত্যে কপটাচার ও শব্দাড়ম্বর তাঁর কাছে ঘৃণার বস্তু ছিল। তাঁর প্রকাশভঙ্গিমায় পাই অনন্য শক্তি ও খোলাখুলিভাব। অগ্রণী কবি পম্পকে অনুসরণ করে তিনি 'অজিতপুরাণ' নামে একখানি ধর্মগ্রন্থ এবং 'গদাযুদ্ধ' নামে একগানি ধর্ম নিরপেক্ষ গ্রন্থ রচনা করেন। তৎকালের বিখ্যাত দানশীলা রমণী আত্তিমাব্বে (যিনি 'দীনচিন্তামণি' উপাধি লাভ করেছিলেন)-র আদেশক্রমে কবি দ্বিতীয় তীর্থঙ্কর অজিতনাথের জীবনী লেখেন 'অজিতপুরাণ'। 'অজিতপুরাণে'র বৈশিষ্ট্য এই যে এখানে 'ভাবাবলি' (অর্থাৎ বহু জন্মের বৃত্তান্ত) অনুপস্থিত। এখানে অজিতস্বামীর কেবল একটি পূর্বজন্মের কথা বিবৃত। অজিতস্বামীর মাতৃগর্ভে প্রবেশ থেকে জৈনপ্রথা অনুযায়ী পঞ্চ 'কল্যাণ' (জীবনের বিভিন্ন স্তর)-এর সবিস্তার বর্ণনা করে অবশেষে মোক্ষলাভে এসে কবি কাহিনী শেষ করেছেন। বর্ণনায় মানবিক স্পর্শ বা গল্পরস বিশেষ কিছু নেই। সব কিছুই অসাধারণ, সব কিছুই বিস্ময়কর। তবে সগর সম্রাটের কাহিনীতে আমরা পাই মানুষের বীর্য ও মানুষের বিয়োগ বেদনার একটি জীবন্ত ছবি। এতে পাওয়া যায় রন্নর প্রতিভার ক্ষমতা ও উদ্দীপন শক্তি, অনুন্নত কল্পনা ও শব্দশাস্ত্রের অধিকার। বোঝা যায় পরবর্তী রচনায় তিনি অধিকতর সাফল্য লাভ করবেন।

সেই সাফল্যের পরিচয় তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ 'গদাযুদ্ধ' অথবা 'সাহসভীম-বিজয়'। এই বইটিকে বলা হয় তাঁর 'কৃতিরত্ন' বা শ্রেষ্ঠ রচনা। চম্পূকাব্যের আকারে রচিত এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু মহাভারতের শেষ ভাগ। সাধারণভাবে 'পম্পভারত' এবং বিশেষ করে তার ত্রয়োদশ আশ্বাস (বা অধ্যায়) রন্নকে প্রভাবিত করে। মনে হয় তিনি বিশেষ শ্রদ্ধা ও অনুরাগ সহকারে বার বার 'পম্পভারত' অধ্যয়ন করে তার কলাকৌশল আয়ত্ত করেছিলেন। তাই তাঁর কাব্যে দেখা যায় 'পম্পভারতে'র কিছু ভাব ও পদগুচ্ছের প্রায় আক্ষরিক পুনর্লিখন, অবশ্য অন্যত্র তিনি অগ্রজ কবির রচনার উপর নিজস্ব কল্পনার আলোক বিকীর্ণ করতে পেরেছেন। সংস্কৃত নাট্যকার ভাস-এর 'ঊরুভঙ্গ' এবং ভট্ট-নারায়ণের 'বেণীসংহার' থেকেও তিনি ইঙ্গিত পেয়েছিলেন। সব মিলিয়ে চক্ষু কর্ণের প্রীতিবর্ধক কাব্যিক ও নাটকীয় উপাদান মিশিয়ে দুর্লভ শিল্পকৃতির সৃষ্টি করেছেন। একথা অবিসংবাদিত সত্য যে নানাদিক থেকে প্রভাব আত্মস্থ করে রন্ন কন্নড কাব্যসাহিত্যকে এমন একটি বস্তু উপহার দিয়েছেন যাতে

পুরোনো গল্পকে নতুন করে বলা হলেও যার মৌলিক উজ্জ্বলতা অস্বীকার করা চলে না।

কবি পম্প যেমন তাঁর মহাভারতের নায়করূপে পৃষ্ঠপোষক রাজা অতি-কেশরীর কথা ভেবে অর্জুনের সঙ্গে তাঁকে অভিন্ন করে দেখেছিলেন, কবি রন্নও তেমনি তাঁর পৃষ্ঠপোষক সত্যাশ্রয়কে ভীমের সঙ্গে অভিন্ন কল্পনা করে তাকে কাব্যের নায়ক পদে উন্নীত করেছেন। পম্পর কাব্যের নাম 'বিক্রমার্জুন-বিজয়', রন্নর কাব্যের নাম 'সাহসভীমবিজয়'। গ্রন্থশেষে পম্প অর্জুনকে সিংহাসনে অভিষেক করেন, রন্নও গ্রন্থশেষে ভীমকে সিংহাসনে বসালেন। রাজার প্রতি অত্যধিক আনুগত্য দেখাতে গিয়ে রন্ন তাঁর পৃষ্ঠপোষকের কুলুজি দেখিয়েছেন ভীম থেকে, যেমন দেখিয়েছেন অর্জুন থেকে। এর ফলে সৌন্দর্যের অনেকটা হানি হয়েছে সন্দেহ নাই। তবে মোটের উপর বলা যায় এক্ষেত্রে রন্ন অধিকতর ঔচিত্যবোধের পরিচয় দিয়েছেন। কারণ, দ্রৌপদীকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে ভীম তার বেণীবন্ধন করে দেয় এবং রাজমুকুট পরিধানের যোগ্য সম্মান অর্জন করেন।

'গদাযুদ্ধ' বইটিতে 'পম্পভারতে'র মতো মহাকাব্যোচিত বিস্তৃতি নেই বটে, তবে অল্পপরিসরে এতে কাব্যগুণেরও অভাব নেই। 'গদাযুদ্ধ' শ্রব্য কাব্য হিসাবে রচিত হলেও বইটির অধিকাংশ জুড়ে নাট্যগুণের প্রকাশ। এখানেই তার চমৎকারিত্ব। সমস্ত কাব্যখানিকে আটটি কি দশটি দৃশ্যে বিভক্ত করা চলে এবং তার প্রতিটি দৃশ্যে সংলাপের চাতুর্যে মনে না হয়ে পারে না যে রন্ন ছিলেন একজন জাত-নাট্যকার। উদাহরণস্বরূপ, প্রথম দৃশ্যেই দ্রৌপদীর বাক্যে প্ররোচিত ভীম যে অগ্নিগর্ভ ভাষায় প্রতিজ্ঞা করেন তাতে লক্ষ্য করা যায় ক্রোধের ক্রমবর্ধমান বেগ। তাছাড়া দৃশ্যের সংলাপ রচনায় রন্ন নাটকের স্পষ্ট আবেদন সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন।[১] দুঃশাসন বধ করে ভীম তার রক্ত পান করলেও দুর্যোধন সম্পর্কে তার প্রতিজ্ঞা তখনও অসম্পূর্ণ। তাই তাকে দেখা গেল প্রলয়কালের কৃতান্তের মতো মহাভয়ঙ্কর।

দ্রৌপদীর আশঙ্কা হয়তো দুর্যোধনের সঙ্গে শান্তিচুক্তি হতে পারে। দ্রৌপ-দীর উক্তি : 'যদি শান্তি স্থাপনই লক্ষ্য হয়, আপনি বনে ফিরে যেতে পারেন।

১. রন্ন : গদাযুদ্ধ ১।৫৫-৭০

আমার কথা যদি বলেন, আমি আগুন থেকে জন্মেছি, আগুনেই লয় পেয়ে যাব।' দ্রৌপদীর এই তীব্র উক্তিতে মূর্তিমান প্রতিশোধের মতো উগ্র ভীমের মধ্যে প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। সে বলে, 'তুমি যদি হও অগ্নি-কন্যা, আমি তবে পবন-পুত্র। আমরা যদি একত্র হই, তবে শান্তি হবে কী করে? বায়ু ও আগুন এই দুটি বস্তু সম্মিলিত হয়ে শত্রুকে কি দগ্ধ করবে না? দ্রৌপদী, তোমার এই কেশরাশি অপমানের ধোঁয়ায় মলিন। এ কেবল কৃষ্ণবর্ণ কেশ নয়, এ হল মৃত্যুর রহস্যময় হাত যা কুরু বংশের জীবনীশক্তি শোষণের জন্য প্রসারিত। আমি সমস্ত কৌরব ভাইকে বধ করেছি, এই হতভাগ্য কৌরবের (দুর্যোধনের) ভাই-এর রক্ত পান করেছি। এইভাবে দুটি প্রতিজ্ঞা আমি পূর্ণ করেছি। বাকি দুটি পূর্ণ না করে আমি কি নীরবে বসে থাকব? আমি দুর্যোধনের উরু ভঙ্গ করে, মুকুট চূর্ণ করে তোর বেণীবন্ধন করে দেব।' ভীমের এই উক্তির মধ্যে কেবল কাল্পনিক আস্ফালন নয়, আমরা পাই এমন এক সত্য শক্তির প্রমাণ যা অভিনীত হলে অসামান্য ফলপ্রসূ হতে পারে।

দুর্যোধন যখন যুদ্ধক্ষেত্রে সঞ্জয়ের কাছে তার মনের কথাগুলো বলছে, তখন তার পিতামাতা ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী পুত্রের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছেন। তাঁদের সামনে মুখ দেখাতে না পেরে দুর্যোধন মূর্ছিত হয়ে পড়ে। পিতামাতার ক্রন্দন যে শেষ বংশধরও বেঁচে থাকল না। যখন দুর্যোধনের জ্ঞান ফিরে আসে, তাঁরা দুর্যোধনকে অনুরোধ করেন পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি করতে। মাতৃসুলভ কণ্ঠে গান্ধারী বলেন, 'এই যুদ্ধবিগ্রহ পরিত্যাগ করে গৃহে ফিরে এসো। মৃত পুত্রদের জন্য ভেবে লাভ নেই, তুমি একাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। যারা চলে গেছে তাদের কি আর ফিরিয়ে আনতে পারি?' দুর্যোধন এমন প্রস্তাব কানে শুনতেও প্রস্তুত নয়। তার কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসে প্রতিহিংসার স্ফুলিঙ্গ, 'অর্জুনকে পরাভূত করে আমি ভীমের উদর থেকে কর্ণ ও দুঃশাসনকে টেনে বার করব। পাণ্ডবেরা নিরপরাধ হতে পারে, কিন্তু আমি ধর্মরাজের সঙ্গে শান্তিতে বাস করতে পারব না।' এই কথাগুলির পূর্ণ তাৎপর্য কেবল অভিনয় কালেই বোঝা যায়। দুর্যোধনের মুখে প্রথমে অর্জুনের নাম, পরে ভীমের নাম উচ্চারণ হতেই হঠাৎ তার মনে পড়ে যায় প্রিয় বন্ধু কর্ণ ও প্রিয় ভাই দুঃশাসনের কথা— যারা অর্জুন ও ভীমের হাতেই মৃত্যুবরণ করে। রন্নর কাব্যের এই হল বৈশিষ্ট্য যে নাটকীয় আকস্মিকতার ফলে কাব্য বিশেষগুণে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে।

ভীষ্মের পরামর্শে দুর্যোধন বৈশম্পায়ন হ্রদে লুকিয়ে রইল। প্রাণপণ অনুসন্ধানের পরেও দুর্যোধনকে না পেয়ে ভীম ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। গুম্ফ কামড়াতে কামড়াতে সে গর্জন করে ওঠে, 'পাপিষ্ঠকে খুঁজে বার করতে আর কী করতে পারি? দেবতারা যে অমৃত পান করেছে আমি কি জোর করে তাদের সেই অমৃত বমন করাব? পাপিষ্ঠ কি পাতালে গেল অথবা পৃথিবীর শেষ প্রান্তে? নাকি ব্যাটা আবার মাতৃগর্ভে প্রবেশ করল? দেবতাদের শরণাগত হলেও আমি তাকে খুঁজে বের করে ফালি ফালি করে কেটে ফেলব।' ভীম তখন শত্রু শিবিরে গিয়ে ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সদম্ভে বলে, 'আমি তোমাদের শত পুত্রকে নাশ করেছি, এখন দুর্যোধনকে শেষ করতে এসেছি।' এই কথা শুনে ভীমের কাছে গান্ধারীর কাতর আবেদন, 'শত-পুত্রের মৃত্যু যন্ত্রণায়ও আমাদের প্রাণ বহির্গত হয় নি। ভীম, আমাদের এই উপকারটুকু করো, প্রথমে আমাদের হত্যা করে অবশেষে দুর্যোধনকে মারো।' মাতৃহৃদয় থেকে নির্গত কী সরল অথচ কী মর্মভেদী এই আবেদন। গান্ধারী চরিত্রে রন্ন মাতৃত্বকে মূর্ত করে তুলেছেন।

অবশেষে দুর্যোধনের সন্ধান পাওয়া গেল হ্রদের মধ্যে। অন্যান্য পাণ্ডবদের ডাকে সে বাইরে এল না, ব্যর্থ হল তাদের আহ্বান, ভীম বুঝতে পারল তার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেই শত্রু বেরিয়ে আসবে। তখন সে রাশি রাশি অপমানকর ও প্ররোচনামূলক শব্দ উচ্চারণ করতেই তৎক্ষণাৎ ফল হল। দুর্যোধন যখন সেই সিংহগর্জন ও মেঘগর্জনের চেয়েও ভয়ঙ্কর কণ্ঠ শুনল, ক্রোধে তার চোখ রক্তবর্ণ হল এবং জলের মধ্যে ডুবে থাকলেও তার সমস্ত শরীর ঘর্মাক্ত হয়ে উঠল। দুর্যোধনের ক্রোধ প্রকাশের জন্য কবি ঠিক উপযুক্ত চিত্রকল্পটি ব্যবহার করেছেন। জলের মধ্যে থেকে কেউ কি ঘর্মসিক্ত হতে পারে? কিন্তু ক্রোধাগ্নি যখন জলকেও নিঃশেষ করে জ্বলে ওঠে, তখন অসম্ভবও সম্ভব হয়। দুর্যোধনের পক্ষে আর জলে থাকা সম্ভব হল না। প্রলয়াগ্নির মতো পাতাল থেকে জেগে উঠে দুর্যোধন প্রশ্ন করল, 'কোথায় রে ভীম?' চতুর্দিকে তাকিয়ে সে যখন তার ভারী গলা ঘোরাল, তখন তার চোখ নিজের তৃতীয় নেত্রের মতো জ্বল জ্বল করতে লাগল। এইভাবে রৌদ্ররস বীররসের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে ক্রমশই উচ্চ থেকে উচ্চতর হয়ে উঠতে থাকে। বীরত্বপূর্ণ উত্তর-প্রত্যুত্তরে এবং অবশেষে দুই বীরের দ্বন্দ্বযুদ্ধে কবি রন্ন সেই ভয়াবহ সঙ্গীতকে উচ্চতম গ্রামে নিয়ে গেলেন।

'পম্পভারতে'র শেষ অংশের মতো সমগ্র 'গদাযুদ্ধ'-এ দুর্যোধন পাঠককে আকৃষ্ট না করে পারে না। তার অবিচলিত ধৈর্য, ভ্রাতৃপ্রেম, আদর্শ, বন্ধু-বাৎসল্য, একক শৌর্য—এই সমস্ত গুণ পাঠকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। শত্রু-পুত্র অভিমন্যুর মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে দুর্যোধন তার আন্তরিক শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করে। সে বলে ওঠে, 'যুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শন করে আমিও যেন তোমার মতো মৃত্যুবরণ করি।' অভিমন্যু বালক হলেও দুর্যোধন সেই বীরের কাছে মাথা নত করে। ভগ্ন-উরু দুর্যোধন যখন মুমূর্ষু অবস্থায় ভূপতিত, তখন হঠকারী অশ্বত্থামা পাণ্ডব পুত্রদের হত্যা করে তাদের ছিন্ন মুণ্ডগুলি দুর্যোধনের সামনে রেখে বলল, 'এই দেখুন, পাণ্ডবদের মুণ্ড।' 'মহানুভব' দুর্যোধন মুণ্ডগুলির দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে গভীর দুঃখে বলে উঠল, 'এখানে ভীমের মাথা নেই। যদি থাকত তবে কি সে এমন নির্বিকার দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থাকত? সমস্তই বৃথা। তুমি তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছ। এগুলি পাণ্ডবদের মুণ্ড নয়, তুমি নির্বোধের মতো তাদের পুত্রদের বধ করেছ।' কবি রন্ন 'ভীমের মুণ্ড নয়' বলে দুর্যোধনের মুখে যে কারণ দিয়েছেন, তা তাঁর প্রতিভার চমৎকার নিদর্শন। তবে তিনি যে দুর্যোধনকে 'মহানুভব' আখ্যা দিয়েছেন এটা নিশ্চয়ই অতিশয়োক্তি। আমাদের মতে, মহাভারতের দুর্যোধন ঠিক শয়তান ছিল না। তার চরিত্র একটু জটিল। একদিকে সে ছিল আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন দাম্ভিক প্রকৃতির মানুষ, অন্যদিকে লোভী ও ঘৃণ্য। দুর্যোধন চরিত্র চূড়ান্ত রূপ পেয়েছে 'পম্পভারতে' রন্নর 'গদাযুদ্ধ' কাব্যে তার কিঞ্চিৎ অবনমন ঘটেছে। রন্ন যদিও সাধারণত দুর্যোধনের প্রকৃতিকে উন্নত করে দেখাবার চেষ্টা করেছেন, তথাপি তাকে ক্ষেত্রবিশেষে মানবিক রূপ দিয়ে স্বীয় অত্যুক্তিকে কিছুটা খর্বও করেছেন। এবং এইখানেই দুর্যোধনের চরিত্রদৃষ্টিতে রন্ন কবির দান অতুলনীয়।

অন্যান্য কবি

দশম শতাব্দীর অন্যান্য লেখকের মধ্যে গদ্যশিল্পী হিসাবে চৌণ্ডরায় বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখেন। পম্পর ন্যায় তিনি একাধারে ছিলেন কবি ও যোদ্ধা। রাজা রাজমল্লর সৈন্যাধ্যক্ষরূপে তিনি বাহুযুদ্ধে জয়লাভ করেছেন। শ্রবণবেলগোলায় গোমটেশ্বরের বিরাট মূর্তি স্থাপন তাঁরই কীর্তি। তাঁর গ্রন্থ 'চৌণ্ডরায়-

পুরাণ' জৈনধারার ৬৩ জন শলাকপুরুষের জীবন ও উপাখ্যান নিয়ে লিখিত। লেখকের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সংস্কৃতে লিখিত প্রসিদ্ধ 'মহাপুরাণ' গ্রন্থটিকে সংক্ষেপে কন্নড ভাষায় রূপদান করা। জৈনধর্ম ও ঐতিহ্যের ব্যাপারেই তিনি বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। তাঁকে ঠিক সৃজনধর্মী লেখক বলা চলে না, তিনি ছিলেন ঐতিহ্যের নির্ভুল ইতিবৃত্তকার। তিনি তাঁর বিষয়বস্তুর সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় উপাদানটি বেছে নিয়ে তাকে বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে যথাযথভাবে বর্ণনা করে গেছেন। তাঁর গ্রন্থের মূল্য মূলত তার অতুলনীয় গদ্যরীতির জন্য। কয়েক শতাব্দী ধরে কন্নড ভাষায় আখ্যায়িকা বর্ণনা এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে লেখা স্বতন্ত্রভাবে গড়ে উঠেছিল। চৌগুরায়ের রচনায় এই দুই রীতির প্রথম সমন্বয় দেখতে পাই। এই গ্রন্থে মিশ্রিত হয়েছে আখ্যানমূলক গদ্যের স্বাভাবিক প্রবাহের সঙ্গে প্রাত্যহিক ভাষার নমনীয়তা, এবং সে মিশ্রণে রয়েছে বৈজ্ঞানিক গদ্যের বাস্তবতা ও যাথার্থ্য। তাই চৌগুরায় কন্নড সাহিত্যে স্থান পেয়েছেন আখ্যানশিল্পীরূপে ততটা নয়, যতটা গদ্যরীতিকাররূপে।

প্রথম নাগবর্মার জীবৎকাল দশম শতাব্দীর শেষভাগ। তাঁর সাল তারিখ ও গ্রন্থাদি নিয়ে অনেক বিতর্ক রয়েছে। আমরা ধরে নিচ্ছি তিনি অন্তত দু'খানি গ্রন্থ লিখে গেছেন—'ছন্দোম্বুধি' এবং 'কর্ণাটক কাদম্বরী'। কন্নড ভাষায় প্রথম প্রাপ্ত ছন্দোবিষয়ক গ্রন্থ 'ছন্দোম্বুধি'। এতে স্পষ্ট ভাষায় কন্নড ছন্দশাস্ত্রের কথা বলা হয়েছে এবং সংস্কৃত ছন্দের পাশাপাশি কন্নড ছন্দের বৈশিষ্ট্য নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে। সংস্কৃত ভাষায় রচিত বাণভট্টের প্রসিদ্ধ 'কাদম্বরী' বইটির কন্নড অনুবাদ হল 'কর্ণাটক কাদম্বরী'। কাদম্বরীর উন্নত সংস্কৃত গদ্যশৈলী যে কোনো অনুবাদকের পক্ষে চ্যালেঞ্জ স্বরূপ। নাগবর্মা এই দুঃসাধ্য কাজে ব্রতী হয়ে কাদম্বরীকে কন্নড চম্পূ কাব্যের রূপদানে যথেষ্ট সাফল্য লাভ করেছেন বলা চলে। একদিকে যাতে ভাবানুবাদের ফলে মূল থেকে অনেক দূরে সরে না যায়, অন্যদিকে আবার মূলানুগামিতার ফলে কৃত্রিম না হয়—এই দুটো দিকেই নাগবর্মা বিশেষ লক্ষ্য রেখেছিলেন। এইভাবে মধ্যপন্থা বেছে নিয়ে তিনি আদর্শ অনুবাদের দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। বাণভট্টের মূল গল্পের সারাংশ রক্ষায় তিনি যেমন যত্নবান, তেমনি তাঁর বর্ণনার সৌন্দর্য, চরিত্রের মহত্ত্ব এবং চিত্রকল্পের মাধুর্য রক্ষাতেও তৎপর। মূল গ্রন্থ বার বার পড়ে আত্মসাৎ করে লেখা নাগবর্মার অনুবাদ অনেকটা সহজ মৌলিক

রচনার মতো লাগে। যা হতে পারত নিতান্তই অনুবাদ, নাগবর্মার রচনাগুণে তা হয়ে উঠেছে অনুসৃষ্টি—নিজস্ব রূপ ও রসে অনেকটা মৌলিক সৃষ্টি। মূলের কিছু অংশ বর্জিত, কিছু অংশ সংক্ষিপ্ত, কিছু অংশ সম্প্রসারিত। আদর্শ অনুবাদকরূপে তিনি এমন সব কাব্যভাব সংযোজন করেছেন যা মূলের চেয়ে সূক্ষ্মতর। মূলের যে বেশ কিছু বর্ণনা বাদ দেওয়া হয়েছে তার কারণ অনুবাদকের ঔচিত্যবোধ ও মাত্রাজ্ঞান। তাঁর ভাষা সরল সহজ ও শ্রুতি-মধুর—স্বচ্ছ গভীর স্রোতস্বিনীর মতো প্রবাহিত। মূলের অত্যধিক সংস্কৃত শব্দের ভার থেকে মুক্ত। নাগবর্মার নিজস্ব সংস্কৃত শব্দ রচনাশৈলীকে দুর্বোধ্য ও জটিল কন্নড়ে পরিণত করেনি। বাণভট্টের কাদম্বরীর রোমাণ্টিক বিষয়টি নাগবর্মার জন্যই কন্নড পাঠকদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। একথা নিশ্চিত করে বলা যেতে পারে, যে প্রাচীন কন্নড়য় কোনো অনুবাদ এই গ্রন্থের কাছা-কাছি আসতে পারে নি।

একাদশ শতাব্দীতে এসে মনে হয় কাব্য জগতে উঁচু দরের লেখকদের যুগ শেষ হয়ে গেছে। দশম শতাব্দীতে ভাগ্যক্রমে পম্প ও রন্নর মধ্যে দুজন শক্তি-শালী কবির সাক্ষাৎ পাই। জীবনে তথা সাহিত্যে অসাধারণ জীবনীশক্তির প্রকাশ ঘটে। বড় কবিদের সংখ্যা বেশি ছিল না সত্য, কিন্তু চম্পূ কাব্য সৃষ্টিতে উৎকৃষ্ট মানের কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়ে গেছেন। একাদশ শতাব্দীতে এসে দেখি কবিদের সংখ্যাও কম এবং কিছু ব্যতিক্রম ছেড়ে দিলে তাঁদের রচনাও নিম্নমানের। কিন্তু একটা শুভ প্রবণতা এই সময়ে দৃষ্টিগোচর হয়। আগেকার কবিদের বিষয়বস্তু ধর্মীয়ই হোক বা ধর্মনিরপেক্ষই হোক, তাঁরা লিখতেন শব্দাড়ম্বর পূর্ণ চম্পূরীতিতে। একাদশ শতাব্দীতে এসে দেখা যায় কাহিনী সাধারণ মানুষের জীবনের কাছাকাছি এসে গেছে। এর আগেই অবশ্য 'বড্ডারাধনে' বইটিতে গদ্যগল্পের সাক্ষাৎ পাই। কিন্তু সেই গল্পগুলিতে যেন পুরানো জগতের স্বাদগন্ধ, সেখানে গল্পরসের স্বাদুতা কম।

একাদশ শতাব্দীতে নতুন ভাবের নির্দেশকরূপে যে দুজনকে চিহ্নিত করা চলে, তাঁরা হলেন দুর্গসিংহ ও নয়সেন। দুর্গসিংহ পম্পর মতো যোদ্ধা-কবি। একাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে চালুক্যরাজ জগদেকমল্লর রাজসভায় তিনি ছিলেন সেনাধ্যক্ষ। তাঁর নামে রচিত একটি গ্রন্থ মাত্র পাওয়া যায়—সংস্কৃত 'পঞ্চতন্ত্রে'র অনুবাদ। তিনি ভূমিকায় বলেছেন যে তাঁর কন্নড 'পঞ্চতন্ত্র' অন্যান্য

প্রচলিত পঞ্চতন্ত্র থেকে পৃথক, কারণ এই বইটি বসুভাগভট্ট লিখিত পঞ্চতন্ত্র অবলম্বনে রচিত। বসুভাগভট্ট নাকি গুণাঢ্য কর্তৃক পৈশাচক ভাষায় লিখিত পাঁচটি গল্পের কাছে ঋণী। লেখক সংস্কৃত সাহিত্যে সুপরিচিত বিষ্ণুশর্মার 'পঞ্চতন্ত্রে'র কোনো উল্লেখ করেন নি। আমরা দুর্গসিংহের 'পঞ্চতন্ত্র' থেকেই বসুভাগভট্টের কথা জানতে পারি। সেদিক থেকে দুর্গসিংহের বইটি সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যে একটি বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে। গবেষণায় জানা গেছে সংস্কৃত 'তন্ত্রোপাখ্যান'-এর কথা এবং বসুভাগভট্টর আখ্যায়িকায় যবদ্বীপীয় সংস্করণের কথা। এই সমস্ত সংস্করণের তুলনামূলক আলোচনা এখনও চলছে। আপাতত একথা অনুমান করা যেতে পারে যে, যে-সমস্ত গল্প বিষ্ণুশর্মার 'পঞ্চতন্ত্রে' নেই অথচ দুর্গসিংহের রচনায় আছে, সেগুলি বসুভাগভট্টের গ্রন্থ থেকে সংকলিত। আর এক কথা, দুর্গসিংহ বৈদিক ধর্মের অনুগামী হয়েও বিষ্ণুশর্মায় অপ্রাপ্য জৈন মত ও শব্দাদির ব্যবহার করেছেন। এর থেকে মনে হয় বসুভাগের মূল পঞ্চতন্ত্রে জৈনধর্মের প্রতি অনুকূল মনোভাব ছিল। দুর্গসিংহের দাবী যে তিনি নতুন ধরনে তাঁর গ্রন্থ রচনা করেছেন। বসুভাগের গ্রন্থ না পাওয়া পর্যন্ত আমরা সে দাবীর সারবত্তা পরীক্ষা করতে পারছি না। আপাতত এইটুকু বলা যায় যে দুর্গসিংহ মূল রচনার গল্প ও মেজাজ বজায় রেখেছেন এবং মাঝে মাঝে তার আখ্যান ও বর্ণনাকে সম্প্রসারিত করেছেন।

দুর্গসিংহের চম্পূকাব্য সম্পর্কে একটি কথা বলা প্রয়োজন। এখানে পদ্য অপেক্ষা গদ্যের পরিমাণ বেশী। পম্প এবং অন্যান্য কবির চম্পূকাব্য থেকে দুর্গসিংহের চম্পূকাব্য বিষয়বস্তু ও রীতিতে পৃথক। নাগবর্মা যেমন বাণভট্টের 'কাদম্বরী'র ভাবানুবাদ করে তাঁর নিজস্ব মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন, দুর্গসিংহও তেমনি 'পঞ্চতন্ত্রে'র অনুবাদে তাঁর নিজস্বতা প্রদর্শন করে থাকবেন। একথা বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে সংস্কৃতের পুরোপুরি অথবা মুখ্যত গদ্যগ্রন্থকে কন্নড রূপ দিতে প্রত্যেক কবিই যাঁর যাঁর প্রয়োজন চম্পূর রূপগত পার্থক্য ঘটিয়েছেন। কিন্তু কবিদের ভাবানুবাদে কৃতিত্ব এক পর্যায়ভুক্ত নয়। যদিও উত্তম ভাবানুবাদের উপযোগী বিদ্যা ও প্রতিভা দুর্গসিংহের ছিল. কিন্তু তিনি নাগবর্মার কবিত্বশক্তি ও পরিণত রচনাশৈলীর অধিকারী ছিলেন না। তাঁর বর্ণনায় ও শব্দপ্রয়োগে তিনি চম্পূ-র সঙ্গে গদ্যকথার মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। বিশুদ্ধ কন্নড বাগভঙ্গির প্রতিও তাঁর ঝোঁক ছিল। অভিনব পরীক্ষারূপে ধ্রুপদী

ও লৌকিক রীতির মিশ্রণের প্রয়াস প্রশংসার হতে পারে বটে, কিন্তু একথা স্বীকার্য যে তিনি উভয়ের সমন্বয় ঘটাতে পারেন নি। নাগবর্মা কন্নড সাহিত্যকে দিয়েছেন প্রসিদ্ধ সংস্কৃত গদ্যকাব্য কাদম্বরীর স্বচ্ছন্দ ও মনোরম অনুবাদ, আর দুর্গসিংহ অনুবাদ করেছেন কতগুলি সংস্কৃত উপকথা। সংস্কৃত গ্রন্থের কন্নড অনুবাদকদের মধ্যে দুর্গসিংহকে মধ্যবর্তী স্থানের অধিকারী বলা চলে।

একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে আবির্ভূত কবিদের মধ্যে অন্যতম প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন নাগচন্দ্র। তাঁর জীবন সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান সীমিত। মনে হয় তিনি হোয়সল ও চালুক্য বংশীয় রাজাদের দ্বারা সম্মানিত হয়েছিলেন, কিন্তু কে বা কারা তাঁর রাজকীয় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন সে কথা নির্দিষ্ট করে বলা যায় না। নাগচন্দ্র নিজেই বলেছেন যে তিনি বিজয়পুরে (আধুনিক বিজাপুরে) মল্লিজিনের জন্য একটি মন্দির নির্মাণ করেছিলেন এবং সেই তীর্থঙ্করকে নিয়ে একটি গ্রন্থ রচনাও করেছিলেন। তিনি ছিলেন একজন ভক্ত জৈন। তাঁর রচনার মধ্যেই তাঁর ধর্মীয় উৎসাহ এবং গুরু ও জিনের প্রতি শ্রদ্ধা পরিস্ফুট। তিনি কবিতার অন্যতম রস শান্তরসের মহান প্রবক্তা ছিলেন। তাঁর রচিত দু'খানি গ্রন্থের সন্ধান পাই—'মল্লিনাথপুরাণ' এবং 'রামচন্দ্র চরিত পুরাণ'। 'মল্লিনাথপুরাণ' তাঁর প্রথম রচনা বলে অনুমিত। পূর্বসূরী পম্প তাঁর 'আদিপুরাণ' কাব্যে যে জৈনপুরাণের ধারা সৃষ্টি করে গেছেন, সেই ধারায় নাগচন্দ্র উনবিংশ তীর্থঙ্কর মল্লিনাথের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। কাহিনীর গল্পাংশ অতি সামান্য হলেও কবি তাকে অসংখ্য স্তবকে সমাপ্ত চৌদ্দটি সর্গে ব্যাপ্ত করে দিয়েছেন। বৈশ্রবণ নামে এক রাজা পার্থিব সুখসম্ভোগের চূড়ান্ত সময়ে দেখলেন একটি বিরাট বটবৃক্ষ বজ্রাহত হয়ে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল। বিস্ময়-স্তব্ধ রাজা মনুষ্য জীবনের অসারতা উপলব্ধি করে তপশ্চর্যার জন্য বনে গমন করেন এবং স্বর্গলোকে গিয়ে অহমিন্দ্র হলেন। পরবর্তী জন্মে তিনি মল্লিনাথ রূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং অতি অল্প বয়সে সংসার পরিত্যাগ করে তপস্যায় বসে তীর্থঙ্কর পদে উন্নীত হন।

নাগচন্দ্র তাঁর এই পুরাণে যেন একটি পত্রবিরল ক্ষুদ্র নিকুঞ্জকে লতিকা-তুল্য বর্ণনা বাহুল্যে এবং ত্যাগ ও ভোগের বিচিত্র চিত্রণে ঢেকে দিতে চেয়েছেন। স্থাপত্য কৌশলের অভাব নেই বটে, কিন্তু পাঠকের হৃদয়কে গভীরভাবে নাড়া

দেওয়ার মতো দৃশ্য পাওয়া ভার। যে দু-একটি দৃশ্য আমাদের আকর্ষণ করে, তারাও বিস্তৃত বর্ণনা অথবা দার্শনিক চিন্তাপ্রকাশের ছল মাত্র। উদাহরণস্বরূপ, রাজা বৈশ্রবণ যখন বটবৃক্ষের আকস্মিক পতন দেখতে পান, তখন তিনি এই ভেবে বিস্মিত হন যে মানুষ কি তার শরীরের উপর আস্থা স্থাপন করতে পারে যে শরীর যে কোনো সময়ে ঐ বটবৃক্ষের দশাপ্রাপ্ত হবে। এই ভাবে রাজার চিন্তা সংসার ত্যাগের পথে ধাবিত হয়। চিন্তার পরে চিন্তা, সব চিন্তাই পার্থিব জীবনের ব্যর্থতাকে কেন্দ্র করে। এই চিন্তায় আবিষ্ট রাজা পূর্ণ শান্তিতে শয্যা গ্রহণ করে এবং পরদিন প্রভাতে তিনি তাকিয়ে দেখেন আকাশ যেন একটি আশ্রমের মতো শুদ্ধ ও পবিত্র। এ তো শুধু অলস কল্পনা নয়। বিশুদ্ধ হৃদয়ে রাজা তপস্যার জন্য বাণপ্রস্থ গ্রহণ করতে আকুল হয়েছেন—এই হল তাৎপর্য। যখন তিনি তাঁর সংকল্প ঘোষণা করলেন, তখন অন্তঃপুরে ক্রন্দনের রোল। বিলাপ করতে করতে রাণীরা ভূলুণ্ঠিত। কিন্তু রাজার সিদ্ধান্ত অটল। সূর্য যেমন প্রভাতের কোমল কিরণ দিয়ে পদ্মপত্রের উপর শিশির-বিন্দুকে শুষে নেয়, রাজাও তেমনি তাঁর পুত্রের অশ্রুমোচন করে বললেন, 'পুণ্য হ্রাসে মানুষ দুঃখ করবে, পুণ্য লাভে কি তার দুঃখ করা উচিত?' কন্নড সাহিত্যে এমন দীর্ঘ কাব্যের অভাব নেই যাতে গল্পাংশ অতি ক্ষীণ অথবা অনাবশ্যক শব্দে ভারাক্রান্ত, বর্ণনা সুপ্রচুর। কেবল কল্পনা-বিলাস, কেবল আড়ম্বরপূর্ণ শব্দের খেলা—এই সবের মাঝে মাঝে কদাচিৎ কখনো কাব্যগুণ দেখা যায়। নাগচন্দ্র রচিত 'মল্লিনাথপুরাণ'কে অবশ্যই সেই শ্রেণীভুক্ত করা চলে না, এই কাব্যের অর্থগৌরব যেমন বেশি, তেমনি প্রশংসনীয় এর গঠন কৌশল। তৎসত্ত্বেও বলতে হয়, এমন কোনো দৃশ্য নেই যেখানে চরিত্র চিত্রণ ও প্রাণ স্পন্দন পাঠককে মুগ্ধ করতে পারে। কাব্যটির স্থলে স্থলে কাব্য সমুন্নতির পরিচয় পাওয়া গেলেও একে উৎকৃষ্ট কাব্যরূপে গণ্য করা চলে না।

নাগচন্দ্রের দ্বিতীয় গ্রন্থ (এবং অপেক্ষাকৃত পরিণতও বটে) হল 'রামচন্দ্র-চরিতপুরাণ'। নাগচন্দ্র নিজেকে গর্বভরে 'অভিনবপম্প' নামে পরিচিত করেছেন বলে তাঁর এই গ্রন্থটি সাধারণত 'পম্পরামায়ণ' নামে অভিহিত হয়। 'কবিরাজমার্গ' গ্রন্থে কিছু উদ্ধৃতি থেকে মনে হয় এর পূর্বেও কন্নড ভাষায় রামায়ণ ছিল। পোন্ন কবির 'রামকথে' আজও পাওয়া যায় নি। সুতরাং 'পম্প-রামায়ণ'ই প্রথম প্রাপ্ত রামায়ণ। আকারেও বইটি বেশ বড়-সড়। তবে

বাল্মীকি রামায়ণ থেকে কবি প্রেরণা লাভ করেন নি। কবির প্রেরণাস্থল বিমলস্থরি কর্তৃক প্রাকৃত ভাষায় রচিত জৈনরামায়ণ 'পউমচরিঅ'। নাগচরিত এই প্রাকৃত রামায়ণকে বিশেষ নিষ্ঠাভরে অনুসরণ করেও তাঁর স্বীয় কাব্যকে বলেছেন 'অপূর্ব'। বাল্মীকি রামায়ণের সঙ্গে তুলনা করলে অবশ্যই অপূর্ব। কিন্তু 'পউমচরিঅ'-র সঙ্গে তুলনা করলে নাগচন্দ্রের 'পম্পরামায়ণ'কে অপূর্ব বলা চলে না। খুব নিপুণভাবে পাঠ করলে ছোট ছোট অংশে কিছু নতুনত্ব দেখতে পাই। মূল গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার হলেও 'পম্পরামায়ণ' বইটি মোটেই ছোট নয়। ১৬টি 'আশ্বাস' বা অধ্যায়যুক্ত একটি বিস্তৃত চম্পূকাব্য। ঐতিহ্য-বাদী কবির ধরনে নাগচন্দ্র তাঁর ধর্মীয় ও কাব্যিক প্রেরণা তৃপ্তির জন্য বিষয়-বস্তুকে সম্প্রসারিত করেছেন। গঠন-কৌশল ও চরিত্র সৃজনের এই প্রসারের জন্য 'পম্পরামায়ণ' চরিত্রের ফল কিছু ভিন্ন হতে বাধ্য।

'পম্পরামায়ণে'র সব চরিত্রই তাদের দোষগুণ নিয়ে বিমলস্থরির কাব্যের আধারে গঠিত। বিমলস্থরির মতে, আধ্যাত্মিক বিবর্তনের পথে রাম তাঁর জীবনচক্রের শেষ জন্মে উপনীত, সুতরাং তিনি কখনও হিংসার আশ্রয় নিতে পারেন না। লক্ষ্মণের পক্ষে হিংসার পথ নিতে বাধা নেই। সুতরাং রাবণ-বধের দায়িত্ব লক্ষ্মণের এবং এই কাজের জন্য তাকে কিছু কাল নরকদণ্ড ভোগ করতে হয়। অবশেষে তার মুক্তি ঘটে। মূল প্রাকৃত গ্রন্থকে বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করতে গিয়ে যে সমস্ত অসঙ্গতি দেখা দিয়েছে, নাগচন্দ্র তা এড়াবার চেষ্টা করেন নি। তাঁর রামচন্দ্রের আচরণ মোটেই ক্ষত্রজনোচিত নয়। তথাপি তিনি এই কাব্যের নায়ক। অন্যদিকে, লক্ষ্মণের শৌর্য অসামান্য। বহু যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে সে কয়েকজন সুন্দরী রমণীর পাণিগ্রহণ করে। কিন্তু কাব্যে রামের তুলনায় তার গুরুত্ব অনেক কম।

সীতা চরিত্রের আবেদন সর্বত্রই সমান। বাল্মীকির সীতার মতোই 'পম্প-রামায়ণে'র সীতা প্রেমে ও পতিভক্তিতে একনিষ্ঠ। কিন্তু রাম ও লক্ষ্মণ যখন বহুবিবাহে কোনো বিবেকের দংশন বোধ করেন না, তখন সীতার ঐ সতীত্ব নিষ্ফল আদর্শবাদে নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে। বাল্মীকি রামায়ণে রাম ও সীতার পারস্পরিক প্রেম ও অনন্য নিষ্ঠা দাম্পত্য জীবনে চির প্রেরণাস্থল। 'পম্প-রামায়ণে' সে নিষ্ঠা কোথায়? এখানে রাবণ-পত্নী মন্দোদরী রাবণের ভালো-

বাসা স্বীকার করে নেবার জন্য সীতাকে পরামর্শ দিয়ে নিজের চরিত্রকেই কলঙ্কিত করে।

'পম্পরামায়ণে'র রাবণ চরিত্র পাঠকের মনে দাগ কাটে। বাল্মীকির রাবণ থেকে বিমলসূরির রাবণ ভিন্ন ধরনের। বিমলসূরির রাবণ পুণ্যাত্মা ও মহানুভব। কেবল এক কুক্ষণে সে সীতার জন্য কামাতুর হয়ে পড়ে। তাকে লঙ্কায় নিয়ে গিয়ে রাবণ তার ভালোবাসা পাওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে। কিন্তু যখন সে বুঝতে পারে রামের প্রতি সীতার নিষ্ঠা কত অবিচল, তখন সে অনুতপ্ত হয়ে পশ্চাৎ অপসরণ করে। রাবণ চরিত্রের এই কল্পনা নাগচন্দ্রের নিজস্ব এবং কাব্যে তার রূপায়ণও মহনীয়। কবির চিত্রণ কৌশলের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। বিশ্ববিজয়ে বহির্গত হয়ে রাবণ গিয়ে উপস্থিত হয় নলকুবরর দুর্ভেদ্য দুর্গের শাসনে। কী করে এই দুর্গ দখল করা যায় রাবণ যখন এই চিন্তায় নিমগ্ন, নলকুবরর স্ত্রী উপরম্ভা রাবণের প্রতি আসক্তা হয়ে তার কাছে দূতী প্রেরণ করে। রাবণ কিন্তু দুর্গ অধিকারের কৌশল আরম্ভ করার জন্য উপরম্ভাকে সাদরে আহ্বান করে তার প্রতি কৃত্রিম প্রেম প্রদর্শন করে। বলে—'তুমি আমার গুরু, কারণ তুমি আমাকে দুর্গ দখলের কৌশল শেখালে। অনন্য মানসা হয়ে তুমি তোমার শক্তির সঙ্গে বাস করে দাম্পত্যজীবনে সুখী হও।' পরে রাবণ 'বারাঙ্গণা বিরতি' (পরস্ত্রী বিমুখ প্রবৃত্তি) ব্রত ধারণ করে পুণ্যাত্মা এবং মহৎ ব্যক্তিরূপে দেশ-দেশান্তরে শ্রদ্ধা লাভ করে। রাবণ চরিত্রের এই পটভূমিকায় সীতা-হরণের বৃত্তান্তটি বিচার করতে হবে।

রাবণ যখন শুনল যে লক্ষ্মণ তার ভগিনী-পুত্রকে বধ করেছে, তখন ক্রোধোন্মত্ত রাক্ষসরাজ প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে পুষ্পক বিমানে আরোহণ করল। বিপরীত দিক থেকে প্রবাহিত বাতাসে বিমানের পতাকা পশ্চাৎ দিকে আন্দোলিত হয়ে যেন রাবণকে পশ্চাৎ গমনের জন্য ইঙ্গিত করল। ঘণ্টার টুংটাং ধ্বনি যেন তার কাজের অনৌচিত্য প্রকাশ করল। মেঘ থেকে ঝরে পড়া মুক্তাসম বিন্দু যেন রাবণের 'পুণ্যদেবতা' (রাবণের সৎকর্মের দেবতা)-র অশ্রু হয়ে ঝরে পড়ল। রামের পার্শ্বে উপবিষ্টা সীতা রাবণের দৃষ্টিতে মনে হল যেন প্রলোভনের ফাঁদ এবং হীরকের তৈরি শেকল। তার মন বিচলিত হল। কামদেব তার উপর তীর ছুঁড়ে সবিদ্রূপে জিজ্ঞাসা করল,

'তোমার যে-মনকে পৃথিবীর এমন কি স্বর্গের সুন্দরী রমণীরা চঞ্চল করতে পারে নি, সেই মনের আজ কী হল ?' স্ফুলিঙ্গের অঙ্গারে পরিণত হওয়ার মতো রাবণের সমস্ত পুণ্যবল ক্ষীণ হয়ে গেল। কুক্ষণের পরিণাম। সমুদ্রও কখনো-সখনো তার সীমা অতিক্রম করে। রাবণের বিবেক হল 'অবলোকিনী বিদ্যা'। সেই বিদ্যাকে আবাহন করে রাবণ জানতে চাইল কী করে রামের কাছ থেকে সীতাকে বিচ্ছিন্ন করা যায়। বিদ্যা কেঁপে উঠল। রাবণকে প্রলোভনের বিরুদ্ধে সতর্ক করল। কিন্তু রাবণ সে কথায় কর্ণপাত করল না। একাকিনী সীতার কাছে উপস্থিত হয়ে তাকে বলপূর্বক অপহরণ করল। নাগচন্দ্র রচিত এই করুণ দৃশ্যটি খুব মর্মস্পর্শী। সীতাকে প্রলুব্ধ করবার জন্য রাবণের নিদারুণ প্রয়াস কবির কল্পনাকে আলোড়িত করেছে। এই প্রসঙ্গে রাবণ তার ঐশ্বর্যের চিত্র বর্ণনা করে সীতাকে বশীভূত করার উদ্দেশ্যে বলছে : 'তুমি যে বিছানায় শয়ন করবে তার বিবরণ শোনো। আমার সঙ্গে যুদ্ধকালে ইন্দ্রের একটি হাতির দাঁত ভেঙে যায়। সেই গজদন্ত নির্মিত আমার পালঙ্ক। দিকপালেরা ব্রহ্মার রাজহংসকে বধ করে তার নরম লোম সংগ্রহ করেছিল, সেই তুলতুলে লোমের নরম শয্যায় শুয়ে তুমি যখন ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠবে, তখন স্বর্গের গায়ক-গায়িকারা তোমার প্রভাতী-বন্দনা গাইবে।' কবি নাগচন্দ্র যে বিলাসিতা বস্তুটিকে কী ক্ষমতাবলে জীবন্ত বাক্-প্রতিমা দিয়ে রূপায়িত করে তুলেছেন, উল্লিখিত স্তবকটি তার নিদর্শন।

এই ঝলমলে প্রলোভনেও সীতা ভুলল না। রাবণ তখন অদ্ভুত রূপ ধারণ করে সীতাকে ভীতি প্রদর্শনের চেষ্টা করল। কিন্তু বাতাসে যেমন রত্নের ঔজ্জ্বল্য অকম্পিত থাকে, সীতাও তেমনি তার রসনাগ্রে জিনের পবিত্র নাম উচ্চারণ করতে করতে অবিচল হয়ে রইল। কর্দমাক্ত জল যেমন ধীরে ধীরে তার পঙ্কিলতা হারিয়ে বিশুদ্ধ ও নির্মল হয়ে ওঠে, রাবণও তেমনি রামের জন্য সীতার অপরিবর্তনীয় প্রেমের গভীরভাবে অভিভূত হয়ে নিজের দুর্বলতাকে জয় করল। এইভাবে কন্নড় কবি নাগচন্দ্র প্রাকৃত কবি বিমলসূরি কর্তৃক অনুপ্রাণিত হয়ে রাবণের চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব নতুন করে সৃষ্টি করেছেন। পম্প ও রন্নর গ্রন্থে দুর্যোধন যেমন তার জটিল মানসিকতা সত্ত্বেও মহৎ বীরের তুল্য মর্যাদা লাভ করেছে, নাগচন্দ্রের গ্রন্থে পাপিষ্ঠ রাবণও তেমনি অনুতাপে সংশোধিত গুণ নিয়ে নিষ্পাপ রূপে প্রতিভাত।

নাগচন্দ্র নিজেকে 'অভিনব পম্প' রূপে অভিহিত করেছেন বলে তাঁর রামায়ণ 'পম্পরামায়ণ' নামে পরিচিত। নিজেকে দ্বিতীয় পম্পরূপে চিন্তা করা নাগচন্দ্রের পক্ষে অতিরঞ্জিত আত্মস্তুতি ছাড়া আর কি! এই দুই কবির মধ্যে মিলের চেয়ে অমিলই বেশি। পম্প দু'রকম লেখা লিখে গেছেন—ধর্মীয় ও ধর্ম-নিরপেক্ষ। পম্পর মহাভারত ধর্মনিরপেক্ষ লৌকিক কাব্য। পক্ষান্তরে নাগচন্দ্রের রামায়ণ পুরোপুরি জৈনধর্মের আবরণে মোড়া। বিষয়-বস্তুর বিন্যাসে ও রচনারীতিতেও দুই কবির পার্থক্য সুগভীর। পম্পর রচনারীতি সংক্ষিপ্ত ও সংহত এবং খানিকটা অপরিচ্ছন্ন। নাগচন্দ্রের রচনা-রীতি স্বচ্ছ ও সুবোধ্য। নাগচন্দ্রের পম্পর ন্যায় কবি-প্রতিভা ছিল এবং সংহতি-কৌশলও তাঁর অজানা ছিল না। কিন্তু তাঁর দুটি গ্রন্থের কোনোটিই যে পম্পর কোনো রচনার সমতুল্য হতে পারে নি তার কারণ বোধ করি সাম্প্রদায়িক ধর্ম ও নীতিশাস্ত্র নিয়ে নাগচন্দ্রের বিশেষ ব্যস্ততা। তাঁর গ্রন্থদ্বয়ে মাঝে মাঝে মহৎ কবিতার ঝলক পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সমগ্রভাবে কোনোটিই মহৎকাব্যের পর্যায়ভুক্ত নয়।

মহিলা কবি কান্তিকে নাগচন্দ্রের সমকালীন বলে ধরা হয়। নাগচন্দ্রের রচনায় এই মহিলা কবির বিশেষ উল্লেখ নেই।··তাঁর প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ষোড়শ শতাব্দীর পরবর্তীকালে। কন্নড সাহিত্যে এমন কিছু শ্লোক পাওয়া যায় যা কান্তি ও হম্প-র ধাঁধা বলে পরিচিত। কান্তির নামে প্রচলিত ধাঁধা-গুলি সত্যই তাঁর রচনা কিনা বলা কঠিন হলেও এই মহিলা কবির অস্তিত্বকে অলীক বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। পরবর্তী গবেষণায় তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয় প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি কন্নড সাহিত্যে প্রথম মহিলারূপে গণ্য হবেন।

নয়সেন

নয়সেন ছিলেন দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের সন্ন্যাসী কবি। জৈনধর্মের চৌদ্দটি ব্রতের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে তিনি যে চৌদ্দটি গল্প লিখেছেন তার সংকলনটি 'ধর্মামৃত' নামে পরিচিত। যদিও গ্রন্থটি চম্পূ কাব্যের আকারে রচিত, এর রচনা ভঙ্গিটি কিন্তু ধ্রুপদী নয়, লৌকিক। যদি আমরা তাঁর হালকা জনপ্রিয় ভঙ্গিতে গল্প বলার নৈপুণ্যের কথা ভাবি, যদি ভাবি তাঁর

ব্যঙ্গরসবোধের কথা এবং তৎসহ লোকায়ত বাগ্‌ভঙ্গি ও প্রবচনের সুপ্রচুর প্রয়োগের কথা, তাহলে তাঁর গ্রন্থকে সাধারণ মানুষের জন্য লিখিত প্রকৃত জৈনপুরাণ বলে অভিহিত করতে পারি। একথা ঠিক যে তাঁর বর্ণনায় তিনি যেমন সাম্প্রদায়িক উৎসাহের পরিচয় দেন, তেমনি লোক প্রচলিত শব্দসম্ভার প্রয়োগেও কিছুটা বাড়াবাড়ি করেন। চিরায়ত যুগে লোকায়ত ভঙ্গির প্রতি পক্ষপাত নিয়ে ব্যঙ্গরসাত্মক গল্প লেখকদের মধ্যে তিনি অন্যতম প্রাচীনতম। বস্তুত পক্ষে কন্নড কবিতায় সংস্কৃতের অতিরিক্ত ব্যবহারের বিরুদ্ধে তিনিই প্রথম প্রতিবাদ জানান। খাঁটি কন্নডর পতাকা তিনিই প্রথম তুলে ধরেন, যদিও তাঁর পদ্যে সংস্কৃত শব্দ ও পদগুচ্ছ প্রয়োগের দোষ থেকে তিনি একেবারে মুক্ত নন। তাঁর বর্ণনা কৌশলের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল তাঁর গদ্য রচনায় উপমার ছড়াছড়ি। এই জাতীয় রচনায় যেমন আছে ঔচিত্যবোধ ও রসবোধ, তেমনি আছে জনজীবনের অন্তরঙ্গ সাহচর্য। কিন্তু নয়সেন মাঝে মাঝে মাত্রাজ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। উপমা প্রয়োগের বাহুল্যে বর্ণনায় বাধা পড়ে এবং রচনারীতি বাগাড়ম্বরে পরিণত হয়।

ব্রহ্মশিব নামে দ্বাদশ শতকের মধ্যভাগের অপর একজন লেখক 'সময় পরীক্ষা' নামে একটি পদ্যাত্মক গ্রন্থ রচনা করেন। বইটি নিঃসন্দেহে লড়াই করার মনোভাব নিয়ে লিখিত। এর একমাত্র উদ্দেশ্য হল জৈন ধর্মের মতো অপরাপর ধর্মের নিন্দা ও বিদ্রূপ করে জৈনধর্মের শ্রেষ্ঠত্বকে তুলে ধরা। এ গ্রন্থের গল্প, চরিত্র বা বর্ণনা কিছুই উল্লেখযোগ্য নয়। বক্তব্যে যুক্তিবাদী এবং সুরে ব্যঙ্গাত্মক এই বইটির ব্যঙ্গ বড়ই তীক্ষ্ণ, অন্যান্য ধর্ম ও বিশ্বাসের প্রতি অসহিষ্ণু। কিন্তু তৎকালীন আচার-আচরণ, রীতি-নীতি ও কুসংস্কারের একটি দুর্লভ দলিল বলে বইটিকে গণ্য করা চলে। মধ্যযুগীয় কর্ণাটকের সমাজতত্ত্ব ও ধর্মতত্ত্ব নিয়ে যাঁরা অধ্যয়ন করবেন, তাঁদের পক্ষে এই তথ্যপূর্ণ বইটির মূল অপরিসীম।

দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আবির্ভূত দ্বিতীয় নাগবর্মা ছিলেন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও মেধাবী কবি। কন্নডভাষী কবি হন, সমালোচক হন—সকলের পক্ষে প্রয়োজনীয় অভিধান, ছন্দশাস্ত্র, অলঙ্কার শাস্ত্র, ব্যাকরণ প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ের গ্রন্থ তিনি তাঁর অপরিসীম জ্ঞানভাণ্ডারের সাহায্যে রচনা করেছেন। নাগবর্মার বিদ্যাবত্তাকে পণ্ডিতী বলা ভুল হবে, তিনি ছিলেন প্রগতিশীল

দৃষ্টিভঙ্গি সমেত যথার্থ বিদ্বান। তৎকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমালোচক বলে তাঁকে সম্মানিত করা হয়।

উপরের পর্যালোচনায় ৫০০ থেকে ১২০০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত কন্নড সাহিত্যের আলোচনা করা হয়েছে। বিশেষভাবে বলা হয়েছে কয়েকজন প্রসিদ্ধ লেখক এবং কন্নড সাহিত্যে তাঁদের দানের কথা। এই যুগ কন্নড কাব্যের স্বর্ণযুগ এবং চিরায়ত কাব্যের যুগ বলে পরিচিত। এই যুগের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় শ্রেণী হচ্ছে চম্পূকাব্য। বিশিষ্ট কবিদের লেখা কয়েকখানি ধর্মীয় ও লৌকিক গ্রন্থ চম্পূকাব্যের চরমোৎকর্ষ ঘটেছিল। লৌকিক গ্রন্থগুলিতে কাব্যের বিষয়বস্তুর সঙ্গে সমকালীন ইতিহাসের চমৎকার মিশ্রণ হয়েছিল। ঐতিহাসিক বিষয়ের প্রত্যক্ষ আলোচনা থেকে পৃথক এই যে রচনাপদ্ধতি, সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যে এই পদ্ধতি বোধ করি একটি অভিনব ব্যাপার ছিল। এই যুগের শেষাশেষি গল্প সাহিত্য গদ্যে-পদ্যে মেশানো সরল চম্পূ আকারে লিখিত হতে থাকে। এর আগে যে কেবল পণ্ডিতজনের বোধগম্য শব্দাড়ম্বর পূর্ণ ভাষায় চিরায়ত সাহিত্য রচিত হয়েছিল, শেষের দিককার চম্পূকাব্যগুলি যেন চিরায়ত সাহিত্যের অতিমাত্রায় সংস্কৃত প্রয়োগের প্রতিক্রিয়ার ফলে রচিত। এই নতুন সাহিত্য সংস্কৃতের প্রতিবাদে জনজীবনের সাঁধা খাঁটি কন্নড-র কথা তুলে ধরে। তাহলে দেখা যাচ্ছে পরবর্তী যুগের সাহিত্যে যে বৈপ্লাবিক দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রকাশের স্বাধীনতা আসন্ন, এই সাহিত্যে তারই বীজ বোনা হয়েছে। কন্নড ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্য 'বচন সাহিত্য' (দ্রষ্টব্য পঞ্চম অধ্যায়) নামে পরিচিত। এই বচন সাহিত্যের ঐশ্বর্য দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দেখা দিলেও তার আগেই আলোচ্য যুগের শেষভাগে যে বচন সাহিত্যের সূচনা হয়েছিল তার প্রমাণ রয়েছে। কন্নড সাহিত্যেব প্রাচীন যুগ প্রধানত ধ্রুপদী সাহিত্যের যুগ এবং এই যুগের শেষ দিকে একটা আমূল পরিবর্তনের আভাস দেখা দেয়।

পঞ্চম অধ্যায়

মধ্যযুগ

প্রাচীন বচন সাহিত্য

দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কন্নড-সাহিত্যের দিগন্তে এক নতুন নক্ষত্রপুঞ্জের আবির্ভাব ঘটে। তার প্রত্যেকটি নক্ষত্রই নিজস্ব দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়েও একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল না। একটি অপরটি থেকে পৃথক অথচ আবার ঐক্যবদ্ধ। একই উত্থানশীল আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে তারা একই দ্বন্দ্বে সম্মুখে অগ্রসরমান। এই গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন অল্লমপ্রভু, বাসবেশ্বর এবং অন্যান্য বচন সাহিত্যকার। 'বচন' অর্থাৎ ভাঙা ভাঙা কাব্যাত্মক গদ্য। তাঁদের আত্মপ্রকাশের বাহনই ছিল এই গদ্য-পদ্যের লিখিত রীতি নয়, কথ্য রীতি। কোনো কোনো বচন কবিদের নিজেদের হাতেই লিখিত হয়ে থাকবে, কোনো কোনো বচন আবার অপরের দ্বারা লিখিত। কিন্তু প্রধানত এগুলি ছিল প্রেরণা-লব্ধ বাণী—গভীর উপলব্ধির ফলে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বেরিয়ে আসা শব্দগুচ্ছ।

একটা বিশেষ রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় পটভূমিকায় এই বচন সাহিত্যের সৃষ্টি। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দেখা যায় কল্যাণের চালুক্যদের গৌরব ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের সময়ে চরম উন্নতি লাভ করে এই কালে পতনোন্মুখ। চালুক্যদের এক সামন্তরাজ বিপুল দুর্বল শাসককে সরিয়ে দিয়ে বলপূর্বক সিংহাসন দখল করে বসে। ধীরে ধীরে সে শক্তিশালী স্বতন্ত্র রাজা হয়ে ওঠে এবং ঐতিহ্যবদ্ধ প্রতিষ্ঠান ও বিধিবিধানের দ্বারা প্রভাবিত হয়। সামাজিক বৈষম্য তখন চরম। যজ্ঞ এবং গ্রাম্যদেবতার কাছে অর্ঘ্যের নামে হিংসার প্রাদুর্ভাব ঘটে। বৈদিক ও জৈনধর্মের মধ্যে নিয়মিতভাবে তীব্র লড়াই চলছে। ব্রাহ্মণ্যধর্ম তখন নিষ্প্রাণ জড়বৎ এবং চতুর্দিকে কপটাচারের খেলা। বহু-দেবতার উপাসনা করে সাধারণ মানুষ জীবনের আসল দেবতাকেই ভুলতে বসেছে। কিছু চিন্তাশীল ব্যক্তি বুঝতে পারলেন যে সমাজটা নড়বড়ে হয়ে গেছে এবং সাধারণ মানুষের জ্ঞান বা সাহস নেই যে এই অবস্থার সম্মুখীন হতে পারে। এই সঙ্কটকালে বচনকার গোষ্ঠী আবির্ভূত হয়ে ধর্মীয় ও সামাজিক বিপ্লবের বীজ চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিলেন। তাঁরা শোনালেন বিদ্যুৎ-

সঞ্চারী বাণী—সাম্য, এক দেবতা এবং কঠোর নীতিবোধের বাণী। এসব কথা তাঁরা প্রথমে নিজেদের শোনালেন এবং তারপরে ঘনিষ্ঠ লোক-জনদের। প্রচারের আগে সেই উপদেশগুলি নিজেরাই প্রথমে পালন করে দেখলেন। কর্ণাটকের মানুষকে তাঁরা এক আধ্যাত্মিক ও নৈতিক সংস্কৃতির সম্পদ উপহার দিলেন।

দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সাহিত্যের বাহনরূপে 'বচন' নানা বৈচিত্র্য ও সম্পদ নিয়ে পরিণত রূপ লাভ করে। তবে বচন সাহিত্য যে খুব সীমিতরূপে হলেও প্রায় এক শতাব্দী আগেই উন্মেষিত হয়েছিল তার নিদর্শন রয়েছে। বাসবেশ্বরের রচনায় 'অদ্য' অর্থাৎ আদি বচনকারদের উল্লেখ আছে। একাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে আবির্ভূত বচনকার দেবর দাসিময়্যা-র কথাও তিনি বলেছেন। দেবর দাসিময়্যাও তাঁর সমকালীন ও পূর্বজ বচনকারদের কথা উল্লেখ করে গেছেন। দাসিময়্যার সংক্ষিপ্ত অথচ সারবান বাণীতে আমরা যে আধ্যাত্মিক বস্তুর আভাস পাই, একশ বছর পরে তার পূর্ণ বিকাশ। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যায়, 'জরাক্রান্ত মানুষের জিভে টাটকা দুধ বিস্বাদ লাগে' এই শ্লেষাত্মক উক্তি, অথবা 'ভণ্ডের ভক্তিতে বিশ্বাস করো না, ও হল ইঁদুর ধরা মঠের বেড়াল।' এই তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ। মাঝে মাঝে তাঁর ব্যঙ্গ অতিশয় কঠোর এবং ভাষা অত্যন্ত রুক্ষ হয়ে ওঠে। তাছাড়া, বচন সাহিত্যের সূক্ষ্ম ছন্দ-লয় ও কোমলতাও তাঁর রচনায় অনুপস্থিত। বাসবেশ্বরের সমকালীন বচনকারদের মধ্যে সকলেশ মাদরস ছিলেন বয়োজ্যেষ্ঠ। তিনি প্রায় একশ বচনের রচয়িতা। পূর্বেকার বচন থেকে এগুলি উৎকৃষ্ট এবং বাসবেশ্বরের সমাজদর্শন ও অতীন্দ্রিয়-বাদের পূর্ব সূচনা।

অল্লমপ্রভু

এ যুগের অন্যতম বিশিষ্ট ব্যক্তি অল্লমপ্রভু। বাসবেশ্বর ও অন্যান্য সাধক-দের অপেক্ষা তিনি যে কেবল বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন তাই নয়, জ্ঞানে ও বিচক্ষণতায় তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁর জীবনকাহিনী রহস্যাবৃত, তবে তিনি যে একজন জ্ঞানী ও অনাসক্ত পুরুষ ছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। যে সমস্ত সাধক 'শরণ' জীবনের পথিক, তিনি ছিলেন তাঁদের স্বাভাবিক নেতা এবং 'অনুভব-মণ্ডপ' নামক আধ্যাত্মিক সংস্থার সভাপতি।

এতৎসত্ত্বেও বলা দরকার, তিনি বিশেষ কোনো ধর্মবিশ্বাস বা ধর্মমতকে আঁকড়ে ছিলেন না। সমস্ত পথ এবং সমস্ত সাধকের তিনি গুণগ্রাহী ছিলেন। আবার তাঁদের দোষত্রুটির সমালোচনা করতেও কুণ্ঠিত হতেন না। বীরশৈব সমেত যখনই কোনো ধর্মমত মুখ্যবস্তুকে বাদ দিয়ে গৌণ অযৌক্তিক ধারণা এবং বাহ্য আচার অনুষ্ঠানে আবদ্ধ হত, তখনই তিনি সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠতেন। কিন্তু তিনি সত্যানুরাগী জ্ঞানী ছিলেন বলে তাঁর কঠোর সমালোচনার মুখ্য প্রেরণা ছিল সর্বজনহিত এবং নির্দিষ্ট পথে সাধকের অগ্রগতি। তাই তাঁর সমালোচনা সকলেই মেনে নিত।

তাঁর রচিত অনেকগুলি বচন ঠিক সুবোধ্য নয়। গভীর অতীন্দ্রিয় অনুভব এবং সুউচ্চ সত্যচেতনার বলে তাঁর উচ্চারিত বাণী কেবল শব্দের সমষ্টি নয়, ছিল মন্ত্রস্বরূপ। তাঁর বচন সমূহের প্রাণকেন্দ্র হচ্ছে এই উক্তি যে শব্দ হল 'জ্যোতির্লিঙ্গ'। অনির্বচনীয় সত্যের উপলব্ধি তাঁর হয়েছিল। তিনি বলেছেন, 'অজ্ঞেয় বিরাটকে যাঁরা জেনেছেন, তাঁরা অজ্ঞজনের মতোই শান্ত ও নীরব। সেই বিরাটের দর্শন পেয়ে মন যখন শব্দ দিয়ে তাঁকে প্রকাশ করে, তখন সেই শব্দ উপলব্ধিকে ঠিক ঠিক বোঝাতে পারে না। হায়, 'নিরাল' (অনন্ত) নামের কোনো শিশুকে কেউ কোনোদিন কি ভোজন করিয়েছে বা নাম ধরে ডেকেছে? আহা, লাজুক শব্দাবলীর বিহ্বলতার দিকে তাকিয়ে দেখো।' তিনি যখন বলেন যে সেই দিব্য অনুভব কিরূপ অনির্বচনীয়, তখন তাঁর কথাগুলি নিজস্ব শক্তি ও বিরল কল্পনাবলে আমাদের নাগালে এসে পৌঁছয়। মাটির সন্তানকে মানুষ নাম ধরে ডাকতে পারে। কিন্তু এই অনন্ত (নিরাল)-কে যথাযথ নাম দিতে পারে কে? শব্দকে যদি বলা হয় এই কাজ করতে, শব্দ বিব্রত ও লজ্জিত হয়ে পড়বে। কারণ কে জানে একাজ তার শক্তির বাইরে। অল্লমপ্রভুর এই বাণী কী প্রাণবন্ত।

তৎসত্ত্বেও নববধূর লজ্জা যেমন ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়, শব্দও তেমনি নিজের অক্ষমতা থেকে মুক্ত হয়ে যথাশক্তি সেই বিরাটকে বর্ণনার চেষ্টা করে। অল্লমের উক্তিগুলির মধ্যে আমরা এইরূপ বর্ণনা পাই। কতগুলি উক্তি তাদের অদ্ভুত অদ্ভুত প্রতীকের ব্যাখ্যা ব্যতীত সাধারণত বোঝা যায় না বলে সেগুলি প্রহেলিকা বলে গণ্য হয়। সাহিত্য হিসাবে সেগুলির চিত্রকল্পের অনির্দেশ্যতার জন্যই প্রাঞ্জলতা বর্জিত। এইরূপ কিছু বচনের কথা ছেড়ে দিলে অবশিষ্ট বচন-

গুলি যেমন স্বচ্ছ ও মনোহর তেমনি সূক্ষ্ম অর্থযুক্ত। যেমন, 'ঐ মানুষগুলির শ্রান্তিক্লান্তি ও মানসিক যন্ত্রণা দেখো। ওরা যা দেখে তা বোঝে না, যা বলতে পারে না তাই খুঁজে বেড়ায়। একটা গোটা পর্বত যখন শীতে কাতর তখন তাকে ওরা কোন্ শীতবস্ত্রে ঢেকে দেবে? বিশাল প্রান্তর যখন নগ্ন উন্মুক্ত, তখন তাকে ওরা কীভাবে আবৃত করবে? ভক্ত যদি নাস্তিক হয়, তবে কার সঙ্গে তার তুলনা করবে?'

অল্লমপ্রভুর সমস্ত বচনের মধ্যে নিহিত স্নিগ্ধ কিরণে তাঁর ব্যক্তিত্ব উজ্জ্বল এবং তা আমাদের মনের কোণে অবস্থিত সমস্ত ধুলোবালি ও মালিন্যকে দূর করে দেয়। আমাদের সম্মুখে অজানা দিগন্ত দেখা দেয় এবং আমাদের কথায় ও কাজের সমস্ত অসঙ্গতি চিহ্নিত করে। এ যেন আমাদের অজ্ঞতা ও অহমিকার পক্ষে বজ্রস্বরূপ। কিন্তু এ বজ্রাঘাত ধ্বংসকারিণী নয়, জীবন-দায়িনী। যেমন, 'আহা, ওরা অন্তঃকরণ প্রক্ষালন করতে জানে না, বাহ্য গাত্রাদি মার্জনা করে জলপান করে। মানুষের হাতে প্রতিষ্ঠিত এক মন্দিরে দেবতার মূর্তি দেখে আমি বিস্মিত। অনন্ত অব্যয়ের নিত্য উপাসনার ব্যবস্থা করে মানুষ নিজেই ভোগ বিলাসে মগ্ন দেখে আমি বিস্ময়ে হতবাক। ওরা পাথরের মধ্যে ঈশ্বরের পূজা করে (ঈশ্বর ভেবে পাথরকে পূজা করে)। তা কি সম্ভব? এ যেন যে-শিশু আগামীকাল জন্মাবে, আজই তাকে স্তন্য দান করা। তোমার দেহের মধ্যে যখন দেবতার মন্দির রয়ে গেছে, তখন আবার বাইরের মন্দির কেন, হে প্রভু, তুমিই যদি প্রস্তরীভূত হও, আমি তবে কী হব? সাধারণ বিশ্বাস এই যে মন্দির তৈরি করা ও সেই মন্দিরে দেবতার মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করা পুণ্য কর্ম। এর ফলে মোহ জন্মে যে দেবমূর্তিই বুঝি পরম সত্তা। অল্লমপ্রভু তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে এই বুদ্‌বুদে খোঁচা দিলেন। সাধকবৃন্দ আবহমানকাল বীর মাহেশের আভ্যন্তরীণ শুদ্ধি ও ঈশ্বরের সর্বব্যাপকতার উপর জোর দিয়েছেন। এই সত্যকেই অল্লমপ্রভু তাঁর অতুলনীয় ভঙ্গিতে এমনভাবে প্রকাশ করেছেন যে তার মধ্যে যেমন সূক্ষ্ম কল্পনা আছে তেমনি আছে বিদ্রূপের স্পর্শ। সেই বিদ্রূপ একই সঙ্গে বিদ্ধ করে এবং প্রসন্ন করে। আমরা গতানুগতিক বাস্তব সত্য থেকে পরম সত্তার জন্য উন্মুখ হই। যারা কেবল প্রস্তর নির্মিত দেবতার পূজা করে তারা অজ্ঞ ও মূর্খ। ভগবান পাথরের মধ্যে নেই, তিনি আছেন

আমাদের অন্তরে। নিরন্তর প্রয়াসে ও সাধনায় তাঁকে উপলব্ধি করতে হবে। সেই হল আগামীকালের শিশু।'

অপর একটি বচনে অল্লমপ্রভু আত্মোপলব্ধির গুণকীর্তন করেছেন। আত্ম জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ গুরু, উচ্চতম দেবতা। অন্য কতগুলি বচনে তিনি ঐতিহ্যের প্রতি অন্ধ নিষ্ঠাকে স্পষ্টভাবে কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেছেন। 'বেদ তো অপৌরুষেয় নয়, একখানি পাঠ্যগ্রন্থ মাত্র। বিজ্ঞান হল বাজারের গালগল্প। পুরাণ হল উপদ্রবকারীদের সমাবেশ। তর্কশাস্ত্র হল ভেড়ার লড়াই। ভক্তি হল বাহ্যাড়ম্বরের মুনাফাখোরী। একমাত্র প্রভু জগদিশ্বরই পরম সম্পদ। ভস্ম মেখে নগ্ন হয়ে থাকলেই কি ব্রহ্মচারী হয়? ভোজ্য দ্রব্যাদি গ্রহণ করে এবং কু-অভ্যাসে রত থেকেও কি ব্রহ্মচারী হওয়া যায়? যখন চিন্তা শূন্য, মন স্থির, কেবল তখনই 'সহজনির্বাণ'-এর (আত্মোপলব্ধির) স্বাভাবিক অবস্থা। অল্লমপ্রভুর বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গির এই একটি সুন্দর উদাহরণ। তিনি ছিলেন 'সহজনির্বাণ'-এর জ্ঞানী, দিব্য বাক্যে আলোক দর্শনকারী ঋষি, সুউচ্চলোক থেকে জীবন পর্যবেক্ষণ দ্রষ্টা। তাই তাঁর বচন থেকে এমন আলো বিকীর্ণ হয় যা স্নিগ্ধ করে জাগিয়ে তোলে। মনে হয় তিনি অনেক পথ, অনেক মতের রহস্য জেনে সকলের ঊর্ধ্বে বিরাজমান ছিলেন।

'হঠযোগ প্রদীপিকা' গ্রন্থে অল্লমপ্রভুদেব বলে তাঁর উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর গুরু ছিলেন বোধ করি নাথপন্থের অনিমিষ। কিন্তু কখনই গোঁড়া সংকীর্ণ-মনা হতে চান নি। তাই আমরা বিস্মিত হইনা যখন তাঁর মতো উদার ও স্বাধীন-চেতা পুরুষ বিশেষ কোনো ধর্ম ও মতের ঊর্ধ্বে উঠে বলতে পারেন: 'যদি কেহ বাসনা ও মোহকে দগ্ধ করতে পারে, তাহলে সে যোগী অথবা ভোগী, শৈব না সন্ন্যাসী তাতে কী আসে যায়? যে লোভ ও আসক্তি বিসর্জন করতে পারে ভগবানের চোখে সে বড়। যারা নিজেকে নিয়ে বড়াই করে, তারা কি সত্যিই বড়ো? এইসব মহাপুরুষের মহত্ত্ব কোথায়? তিনিই প্রকৃত 'শরণ' যাঁর মধ্যে ছোট-বড়র পার্থক্য শেষ হয়ে গেছে।' অন্যত্র তিনি তাঁর আদর্শের কথা বলেছেন এই ভাবে—'ঝড়ের মতো চলবে না, চলবে বাতাসের মতো। ঝড় গাছপালা ভেঙে দেয়, বাতাস যেখানেই যায় সুগন্ধ বহন করে চলে।' তিনি ঝড়ের মতো ধ্বংসকারী হতে চান না, মৃদুমন্দ বায়ুর মতো শান্তি দিতে চান। যে ঔজ্জ্বল্য চোখ ধাঁধায় ও বিনাশ করে তাকে তাঁর প্রয়োজন নেই। যে শান্ত

স্নিগ্ধ দ্যুতি চতুর্দিকে প্রেম ও আনন্দ বিকিরণ করে তিনি তারই অনুরাগী। অল্লমপ্রভুর বচনগুলি পড়ে মনে হয় তিনি সেই দ্যুতি লাভ করেছিলেন। একটিমাত্র দিন অতীতের অনন্ত ও ভবিষ্যতের অনন্তকে আচ্ছন্ন করেছে। সত্য উপলব্ধি করেছেন এমন দুর্ভাবনাহীন পুরুষ, মৃত্যুঞ্জয় শক্তিশালী মানুষ, বিশালকে দর্শন করেছে এমন মহৎ ব্যক্তি, ভূমায় নিমগ্ন আনন্দময় মানুষ'… এরূপ সমুন্নত মানুষের নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাসেই মহৎ বচন সাহিত্যের জন্ম। বচনাকারে অল্লমপ্রভুর স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি কেবল কন্নড সাহিত্যেই অদ্বিতীয় দান নয়, ভারতীয় তথা বিশ্ব-সাহিত্যে দুর্লভ উপহার।

বসবেশ্বর

বসবেশ্বর ছিলেন কর্ণাটকের একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষ, বৈপ্লবিক চিন্তাবীর, আমূল সংস্কারক এবং শক্তিশালী লেখক। দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ যখন অশান্তি ও বিক্ষোভে পরিপূর্ণ, তখন বসবেশ্বরের মতো একজন মহান ব্যক্তির আবির্ভাব অপেক্ষিত ছিল। তখন সমাজজীবন অসাম্যের বিষে জর্জরিত এবং জড়তায় অসাড়। তখন কেবল দুটি পথ খোলা ছিল: একটি পথ হল চোখকান বন্ধ রেখে প্রাচীন পন্থার অনুসরণ এবং দ্বিতীয়টি হল চোখ খোলা রেখে কোনো রকমে তৎকালীন অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে চলা। তৃতীয় পথও একটি ছিল, তা হল বিদ্রোহ, তৎকালীন অবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। সে পথ বীরের পথ, কষ্টসহিষ্ণুর পথ। প্রকৃত বীরের মতো বসবেশ্বর সেই পথের যাত্রী হতে চাইলেন। শৈশবে তাঁর পল্লীগ্রাম বাগেওয়াডিতে উপনয়নের বিরুদ্ধাচরণ করেন, কারণ যজ্ঞোপবীত ধারণ তাঁর চোখে অর্থহীন। কূডল সঙ্গমে গুরুর নির্দেশে তিনি তৎকালের সমস্ত বিদ্যা আয়ত্ত করেন এবং ভক্তির পথে বিলক্ষণ অগ্রসর হন। কল্যাণে উপস্থিত হয়ে তিনি বিজ্জল রাজের মন্ত্রিপদ লাভ করেন। সাম্য ও প্রেমভিত্তিক সমাজদর্শন প্রচার করেন। এই দর্শনের সঙ্গে আধ্যাত্মিক ও ভক্তিভাবের স্পর্শ লাগালেন। তাঁরই নির্মিত অনুভব মণ্ডপে তিনি যে শিক্ষা প্রচার করতে থাকেন, তারই অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণে কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিদ্বান ও সত্যসন্ধানী মানুষ দলে দলে আসতে থাকেন। রাজা হলেন সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসী রাজা। এমনি একজন রাজা ছিলেন 'শূন্য সিংহাসন'-আরোহী অল্লমপ্রভু। এই আধ্যাত্মিক

পরিবেশে উচ্চনীচভেদ ঘুচে গেল। আধ্যাত্মিক উন্নতি ও সাধনার পথে স্ত্রী ও পুরুষ সমান স্বাধীনতা পেল। 'কর্মই ধর্ম (পূজা)' এই ছিল সে দিনের নীতি-বাক্য ; কোনো কাজকেই বড় বা ছোট মনে করা হত না। মানুষের কেমন বিশ্বাস জন্মেছিল যে, যে-কাজই সে করুক না কেন, সেই কাজের নিয়মনিষ্ঠ পূর্ণতায় স্বর্গীয় আনন্দ ও শান্তি বিরাজমান। চিন্তাপদ্ধতি বা আচরণ বিধির দিক থেকে বিচার করলে বীর শৈবমত কোনো নতুন জিনিস ছিল না। তবে একটি নির্দিষ্ট সামাজিক পরিবেশে বসবেশ্বর এর পুনরুদ্ভাবন করেন। তিনি এবং শিবের অন্যান্য ভক্তগণ পুরানো মতে পুনর্জীবন সঞ্চার করেন এবং নিজেদের চেষ্টায় ও সাধনায় সেই মতকে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করেন।

ভগবদ্‌ভক্ত বসবেশ্বর 'ভক্তিভাণ্ডারী' রূপে পরিচিত ছিলেন। মননে ও সাধনায় বড় হয়ে তিনি এই মর্যাদা প্রাপ্ত হন। আমরা তাঁর রচনার মধ্যে এর নিদর্শন লক্ষ্য করি। সাধনার পথে তাঁর অগ্রগতি ও বিকাশ এক দিক থেকে তাঁর নিজস্ব বস্তু ছিল। তিনি তাঁর হৃদয় উন্মুক্ত রেখে চলতেন, কারও কাছ থেকে কোনো কিছু লুকোবার প্রয়োজনবোধ করতেন না। বার বার তিনি তাঁর মানসিক যন্ত্রণাকে প্রকাশ করেছেন, নিজের দোষত্রুটিগুলিকে একটু বেশি বেশি করেই লোক সমক্ষে তুলে ধরেছেন এবং অসঙ্কোচে তাঁর ভুলগুলি স্বীকার করেছেন। সরল ও অবাধ অন্তর্দর্শনের প্রতি তাঁর একটি ঝোঁক ছিল, এমন তীব্র ঝোঁক অন্য বচনকারদের মধ্যে বড় একটা দেখা যায় না। তাঁর একটি বিশিষ্ট বাণীতে তিনি বলেছেন, 'আমার চেয়ে ছোট কেউ নয় এবং ভগবদ্‌ভক্তের চেয়ে বড় কেউ নয়।' এই সংক্ষিপ্ত উক্তির মধ্যে কেবল বিনয় নয়, তাঁর ব্যক্তিত্বের মর্মকথা উদ্‌ঘাটিত। সমগ্র কন্নড সাহিত্যে ভক্তির ব্যাকুলতায় ও অন্তর্দর্শনের সাহসিকতায় বসবেশ্বরের বচনকে অতিক্রম করে গেছে এমন উক্তি দুর্লভ। যেমন, 'শস্যশ্যামল প্রসন্ন ভূমি আজ প্রলয়পঙ্কে নিমজ্জিত। আমি কিছু জানি না, আমি সতর্ক হতে পারি না। হে ঈশ্বর, আমার দুর্বলতারূপ সকল পঙ্ক দূর কর। আমাকে তুমি উদ্ধার কর, আমি হাল ছেড়ে দিয়ে তোমার পথে অগ্রসর হব। পঙ্কে মগ্ন মূক প্রাণীর মতো আমি তোমায় চিৎকার করে বলছি। হায়, আমাকে দেখবার মতো কেউ নেই। আগুন যদি চুল্লিতে থাকে তবে কষ্ট সহ্য করা যায়, কিন্তু সমস্ত পৃথিবীতে যদি আগুন ছড়িয়ে পড়ে, তখন তো অসাধ্য। জলাশয়ের বাঁধ যদি জল শোষণ করে, বাগানের বেড়া যদি

গাছের ফল খেয়ে ফেলে, ঘরের গৃহিণী যদি ঘরের জিনিস চুরি করে এবং মায়ের স্তন্য যদি বিষ হয়ে শিশুর মৃত্যুর কারণ ঘটে, তবে আমি কার কাছে নালিশ জানাব? আমাকে অত খুঁটিয়ে দেখো না। দেখলে পরে আমি ফাঁপা শূন্যগর্ভ প্রমাণিত হব। আমার কর্ম ও বাক্য এক নয়। আমার মধ্যে পবিত্রতার লেশমাত্র নেই। যে কুকুর মিষ্টি ভেবে তৃণাঙ্কুর চিবোয়, আমি সেই কুকুরতুল্য।' এই জাতীয় বচনসমূহে বসবেশ্বর যেন সাধারণ মানুষ হয়ে আমাদের কাছাকাছি এসে আমাদের মধ্যে বিচরণ করেন এবং আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করেন। এই সমস্ত বচনে সাধারণ মানুষ যেন তাদের হৃদয়-স্পন্দন শুনতে পায়। আবার একথাও বুঝতে পারে যে কবির অনুভূতি তাদের অনুভূতি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক।

মহাপুরুষেরা যখন দেখেন যে তাঁদের হৃদয়ে পোষিত মহৎ আদর্শগুলি তাঁদের জীবৎকালে পুরোপুরি চরিতার্থ হলনা তখন তাঁরা বড় অসুখী বোধ করেন। এমনকি ছোটখাটো ভুলগুলিও তাঁদের কাছে সাংঘাতিক ভুল বলে বোধ হয়। কখনো কখনো সেই ভুলগুলিকে তাঁরা অতিরঞ্জিত ভাষায় বর্ণনা করেন। এসব আর কিছুই নয়, তাঁদের সাধনার পথে অগ্রগতির প্রেরণা। একথা মনে রাখতে হবে তাঁদের আত্মসমালোচনা সাধারণ মানুষের আত্মনিন্দা থেকে আলাদা। বসবেশ্বরের বচনগুলিকে এই দৃষ্টিতে বিচার করতে হবে। ঐ বস্তুগুলিতে আকাঙ্ক্ষাজনিত অতি তীব্র যন্ত্রণা এবং একপ্রকার আত্মধিক্কারের প্রকাশ। যে ভাষায় এই সমস্ত ভাব প্রকাশিত, তার মধ্যে পাই অকপট আন্তরিকতা, স্বতঃস্ফূর্ততা এবং মহৎ সাহিত্যের কাব্যগুণ। যেমন, পূর্বে উদ্ধৃত 'প্রলয়পঙ্কে মগ্ন পৃথিবী' ইত্যাদি অংশ সারগর্ভ অর্থে পূর্ণ। যে ভূমি প্রচুর শস্য জন্মাবার ক্ষমতা রাখে, যেখানে প্রতিটি শস্যমঞ্জরী রসে পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে, সেই ভূমি প্রলয় পঙ্কে নিমজ্জিত। প্রলয়কালে যে পঙ্ক সজ্জিত হয়, পুনরায় প্রলয় ব্যতীত সে পঙ্ক ধুয়ে যায় না। আর ধুয়ে না গেলে নতুন শস্য জন্মাবে না। পূর্বজন্মের কামনা-বাসনা এবং স্বার্থপর ভাবগুলি আত্মাকে অনুসরণ করে তার প্রগতির পথ রুদ্ধ করে। লুকোনো অবস্থা থেকে তারা বেরিয়ে এসে উদীয়মান আত্মাকে নিচে আকর্ষণ করে। যখন আমরা এই সব খুব মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করি এবং ঐ সব ভাবের প্রাবল্যের কথা চিন্তা করি, তখনই আমরা বুঝতে পারি কবির 'প্রলয়পঙ্ক'-এর

বর্ণনা কতদূর সার্থক ও সমীচীন। আন্তরিক উপলব্ধি বসবেশ্বরের বচনসমূহে যে কীভাবে উপযুক্ত চিত্রকল্প এবং নির্মল বাক্যের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে, 'প্রলয়পঙ্ক' কবিতাটি তারই নিদর্শন।

নিরন্তর প্রয়াসে ও সাধনায় বসবেশ্বর প্রকৃত ভক্তে পরিণত হন এবং ঈশ্বরের কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করেন। পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের ভাব তাঁর দেহে মনে প্রাণে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি নিজেকে বলেন ঈশ্বরের যন্ত্র ও ভৃত্য। নিম্নলিখিত বচন দুটিতে আত্মসমর্পণের আনন্দ অতি মর্মস্পর্শী ভাষায় রচিত : 'তোমার নামামৃত আমার বাক্য পূর্ণ করে দিয়েছে, তোমার মূর্তি আমার দৃষ্টি জুড়ে বসেছে, তোমার চিন্তায় আমার চিত্ত ভরপুর এবং তোমার কীর্তিতে আমার শ্রবণ জুড়িয়েছে। হে প্রভু কূডল সঙ্গম, আমি তোমার চরণ-পদ্মের ভ্রমর মাত্র।' এই বচনে ব্যবহৃত 'তুম্বি' শব্দটি শ্লেষালঙ্কারের উদাহরণ। বিশেষ্যরূপে কথাটির অর্থ হল 'ভ্রমর', ক্রিয়াপদরূপে অর্থ হল 'পূর্ণ করেছে'। আর একটি বচন : 'হে প্রভু, আমার দেহকে তোমার বীণা (বীণার দীর্ঘ অংশ) করো, আমার মাথাকে করো বীণার নিম্নাংশ (লাউ), আমার স্নায়ুকে করো তার এবং আমার আঙুলকে স্বর তোলার যষ্টি। বত্রিশটি রাগেই তুমি গান ধরো। তোমার বুকে চেপে আমার দেহবীণাকে বাজাও, প্রভু।' উল্লিখিত বচন দুটি আকারে সংস্কৃত হলেও পূর্ণাঙ্গ নীতি-কবিতার মতো ভক্তির পূর্ণ অবস্থাকে প্রকাশ করেছে এবং বচন সাহিত্যের মহত্ত্ব ঘোষণা করেছে।

মন্ত্রীরূপে বসবণ্ণা অত্যন্ত প্রভাবশালী ছিলেন। আবার নতুন সমাজ ব্যবস্থার চিন্তায় অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি বিপ্লবের বীজ বপন করে একটা নতুন আন্দোলন পরিচালনা করেন। রাজনীতির বিভিন্ন দিক থেকে এবং সমাজের রক্ষণশীল সম্প্রদায় থেকে প্রচণ্ড বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল তাঁকে। তাঁর ভক্তির আদর্শ প্রতিদিন বিচারের বিষয় হয়ে ওঠে। তিনি ভালোভাবেই জানতেন যে 'ভক্তি হল এমন একটা জিনিস যার যোগ্যরূপে জীবন স্পর্শ করা কঠিন। করাতের মতো আসতে যেতে উভয় দিকেই কাটে। তুমি যদি একটা বিষধর সর্পকে ধরো, সে কি কখনো তোমাকে ছেড়ে দেবে?' এখানে প্রদত্ত উপমাগুলি তাদের নতুনত্ব ও ঔচিত্যে আমাদের অন্তরে আবেদন সৃষ্টি করে। কয়েকটি বচনে দেখা যায় তাঁর নির্ভীক অচঞ্চল মনোভাব। যেমন, 'আমাদের ভাগ্যে যা ঘটতে যাচ্ছে, আজই তা ঘটে যাক। আজ যা

ঘটবার, তা এক্ষুণি ঘটুক। কে তার ভয়ে ভীত? আমি তো কেবল অন্নের জন্য বেঁচে নেই। আমি বেঁচে আছি একটি ব্রত নিয়ে। ভীরু সৈন্যের মতো আমি মঞ্চ ছেড়ে পালিয়ে যাব না। হে প্রভু, কোনো ব্রতের জন্য মৃত্যুবরণ উৎসবের মতোই আনন্দদায়ক।' এর থেকে বোঝা যায়, তিনি কোনো সন্তুষ্টপূর্ণ মুহূর্তকে এড়িয়ে চলার মতো পলায়নী মনোবৃত্তির লোক ছিলেন না। যাই ঘটুক না কেন, তাঁর সাহসী চিন্তাধারার পরিণাম ভোগের জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন। তাঁর বৈপ্লবিক চিন্তায় আহত ও ক্রুদ্ধ হয়ে রক্ষণশীল সমাজ তাঁকে সমাজচ্যুত করবার জন্য ভয় দেখিয়ে থাকবে। কিন্তু তিনি তাতে ভেঙে পড়েননি, নিরুৎসাহ হননি। কয়েকটি বচন নির্ভুলভাবে দেখিয়ে দেয় তাঁর অবিচল আত্মবিশ্বাস ও ভয়শূন্যতা। 'ক্রোধ দিয়ে কে আমার অনিষ্ট করবে? সমস্ত নগরবাসী ক্রোধোদ্দীপ্ত হলেও বা আমার কী হবে? তারা যেন আমার ছেলের কাছে তাদের মেয়ের বিয়ে না দেয়। তারা যেন থালায় করে আমার কুকুরকে খেতে না দেয়। যতক্ষণ ভগবান সহায় থাকে, ততক্ষণ কি হস্তী-আরোহী কোনো মানুষকে কুকুরে কামড়াতে পারে? যখন দুধের ননী আমার পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে তখন সামান্য গোরুর কাছে আমি কেন যাব? আমি কেন লজ্জিত হব? প্রভু কূডলসঙ্গম যতদিন সহায় ততদিন বিমলরাজের রাজস্বদপ্তরের জন্য আমার তৃষ্ণা কেন? বসবেশ্বরের প্রতি অভিযোগ করা হত যে তিনি বিজ্জলের রাজকোষ থেকে টাকা নিয়ে সেই টাকায় ভক্তজনকে খাওয়াতেন এবং সমাজ-সংস্কারের কাজ চালিয়ে যেতেন। জনসাধারণের টাকা নয়-ছয় করার কোনো অধিকার তাঁর নেই। এই অভিযোগের উত্তর পাওয়া যাচ্ছে উল্লিখিত বচনে। অবশ্য কয়েকটি বচনে এমন ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ আছে যাতে তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটে এবং যে সমস্ত কাজের দায়িত্ব তিনি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছিলেন সেই সব কাজের বর্ণনা পাওয়া যায়।

তাঁর রচনাবলীতে যেমন তিনি তাঁর মানসিক অবস্থাকে পরিষ্কার ফুটিয়ে তুলেছেন, তেমনি তাঁর সমকালীন সামাজিক অবস্থাকেও স্পষ্টভাবে চিত্রিত করেছেন। সরল ও খোলাখুলিভাবে তিনি সমাজের দোষত্রুটির প্রতি অভ্রান্ত অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। তাছাড়া নতুন সমাজ ব্যবস্থার জন্য নীতিনির্দেশও করে গেছেন। আমাদের দেশবাসী কোনো এক বিশেষ দেবতায় অটল বিশ্বাস

না রেখে বহু দেবতার অন্বেষণে ঘুরে বেড়াতে অভ্যস্ত ছিল। কোনো একটা লোক অসুস্থ হলে যত বেশি সম্ভব ডাক্তার-বদ্যির সমাবেশ ঘটিয়ে সবরকম ওষুধ প্রয়োগ করা হত। তাছাড়া গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে দিয়ে প্রসন্ন করতে হত। ধর্মের ক্ষেত্রেও কথাটি সমানভাবে সত্য। পাপ ক্ষালনের জন্য কিংবা দুঃখ কষ্ট দূর করার জন্য বহু দেবতার পূজা করেও তৃপ্তি হত না। তেমনি বহু-সংখ্যক সম্প্রদায়ের বহুসংখ্যক গুরুর পথ অনুসরণ করেও তৃপ্তি হত না। বসবন্না বলেন, 'যখন তুমি শিবভক্ত দেখ তখন তোমার মস্তক মুণ্ডন কর। একজন জৈন সন্ন্যাসী দেখলে তুমি নিজেকে অনাবৃত কর। ব্রাহ্মণ দেখলে হরিনাম গান কর। যাকেই দেখ, তাকেই অনুসরণ কর। এই সব লোক যারা কূডলসঙ্গমের উপাসক, তারা যখন অন্যান্য দেবতার সামনে মাথা নুইয়ে ভাবে তারা প্রকৃত ভক্ত, তখন আর আমি এই সব অজ্ঞ মানুষকে কী বলব?' আর একটি দোষ বসবন্না ব্যক্তিজীবন ও গোষ্ঠীজীবনে দেখেছিলেন, তা হল মানুষের ভণ্ডামি। শিবভক্তই হন অথবা অন্য লোকই হন, মানুষের এই কপটতা দেখলেই তিনি নিন্দা করতেন, ভৎর্সনা করতেন। 'উনোনের ছাইএর উপর বেশি গুরুত্ব দিও না। যেমন খুশি ভস্ম মাখো। যখন তোমার অন্তরে কোনো সততার চিহ্ন মাত্র নেই, তখন বাইরে ভস্ম মেখে লাভ কী? ভগবান সেই সব ভণ্ডকে ভালোবাসে না যারা একটা কথা বলার অভিপ্রায় নিয়ে বহু কথার অবতারণা করে। ভক্তিবিহীন পূজা, ভালোবাসা ছাড়া কাজ—এ সবই চিত্রবদ্ধ মূর্তির সৌন্দর্যের মতোই অবাস্তব। এ সমস্তই একখণ্ড কাগজের উপর সুন্দর করে আঁকা ইক্ষুর মতো। যদি তুমি জড়িয়ে ধরো তো আনন্দ পাবে, কিন্তু যদি খেতে চাও মোটেই মিষ্টি স্বাদ পাবে না। চিত্রিত ইক্ষুদণ্ডের মতোই দেখাবে শুধু।' প্রাত্যহিক জীবন থেকে গৃহীত এই উপমাটি বেশ হৃদয়গ্রাহী।

বসবন্না তাঁর সমকালীন সমাজজীবনে যে দোষত্রুটি দেখেছিলেন, তার মধ্যে একটি বড় দোষ হল মানুষের পক্ষে তার নিজের দোষ উপেক্ষা করে অন্যের দোষ সংশোধনে অত্যধিক আগ্রহ। ভয়-পীড়িত ও কৃত্রিম সমাজে আমরা আত্মসমালোচনার এই দুঃখজনক অভাব দেখতে পাই, দেখতে পাই নিজের চোখের দোষের কথা ভুলে অন্যের চোখের ধুলোবালি দূর করার প্রবণতা। এইভাবে জীবনের মূল্য ওলট পালট হয়ে যায়। বসবন্না বেশ নিপুণভাবে

এই সামাজিক অসুস্থতার কারণ নির্ণয় করেছেন। তিনি বলেছেন, 'কেন তুমি পৃথিবীর উন্নতিসাধনের জন্য (সংস্কার সাধনের জন্য) ঘুরে বেড়াও? নিজের দেহ ও মন সম্পর্কে সাবধান থাকো। যারা খালি প্রতিবেশীর দুঃখে কাঁদে, ঈশ্বর তাদের ভালোবাসেন না।…গৃহের কর্তা কি গৃহের ভিতরে? গৃহের প্রবেশ পথে ঘাস গজিয়েছে, ঘরের মধ্যে ধুলো জমেছে, বলি গৃহকর্তা কি বাড়ির ভিতরে আছে না নেই? না, মিথ্যাময় শরীর এবং আকাঙ্ক্ষাময় মন নিয়ে সে সেখানে নেই।' দ্বিতীয় রচনাটির প্রশ্ন ও চিত্রকল্প খুব অর্থবহ। আজকের সভ্য সমাজের রীতিনীতির দিকে তাকালে ঐ একই প্রশ্ন করতে প্রবৃত্তি হয়।

নিচের কয়েকটি বচনে পূজা, জাতপাত ইত্যাদি নিয়ে কুসংস্কারকে তুলে ধরা হয়েছে। 'ওরা প্রস্তরে খোদিত সাপের মাথায় দুধ ঢালতে ত্বরান্বিত হয়ে ওঠে। কিন্তু যখন তারা সত্যিকার সাপ দেখে তাকে মারবার জন্য তেড়ে যায়। ওরা অন্নের পাত্র 'লিঙ্গে'র কাছে নিবেদন করে, কারণ তার খাবার ক্ষমতা নেই। কিন্তু যে জীবন্ত ভক্ত নৈবেদ্য ভোজন করতে পারে সে যখন সশরীরে উপস্থিত হয় তখন তাকে অবজ্ঞাভরে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। যে ঘাতক, সে প্রকৃত জাতিচ্যুত। যে নোংরা বস্তু ভোজন করে, সে নোংরা মানুষ। তাদের আবার জাত কিসের? যাঁরা সমস্ত জীবিত প্রাণীর কল্যাণ ছাড়া অন্য কিছু কামনা করেন না সেই শিব ভক্তরাই প্রকৃত 'শরণ'। সত্য বটে বসবেশ্বরের কিছু সামাজিক অবস্থার সমালোচনার সুর অত্যন্ত রুক্ষ, কিন্তু তার প্রেরণা নিরপেক্ষ ধর্মপরায়ণ ক্রোধ। যারা বৈদিক পথের অনুগামী এবং বীরশৈবসহ যারা বেদ-বিরোধী পথের অনুগামী, তাদের সকলের মিথ্যা-প্রবঞ্চনা প্রদর্শন করাই এই সমালোচনার লক্ষ্য। কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ঘৃণার দ্বারা প্রণোদিত না হয়ে বসবেশ্বর অসাম্য ও অবিচারে পরিপূর্ণ তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার প্রতি নিদারুণ বিরক্তি প্রকাশ করেছেন। তাঁর স্বপ্ন ও আদর্শ ছিল করুণা ও সাম্যের-ভিত্তিতে নতুন সমাজ গড়ে তোলা। তাই তিনি যজ্ঞ প্রভৃতি যে সমস্ত অনুষ্ঠানে অযথা হিংসার প্রশ্রয় দিয়ে দেবতার কাছে পশু বলিদান করে সেগুলির নিন্দা করেছেন। সামাজিক বৈষম্য সৃষ্টি হয় বলে বর্ণাশ্রম ব্যবস্থাও তিনি গ্রহণ করতে পারেন নি। যখন এই ব্যবস্থার প্রথম প্রচলন হয় তখন তার গুণ বা প্রয়োজনীয়তা যাই থাক,

পরবর্তীকালে এই ব্যবস্থা এক অন্ধ প্রথা অবমানিত হয়ে দুর্নীতি ও অধর্মের জন্ম দিয়ে আসছে। এই অধঃপতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা খুবই জরুরী হয়েছিল।

বসবণ্ণার অনেক বচনেই দেখা যায় সমস্ত নিন্দা সমালোচনার পশ্চাতে জীবন সম্পর্কে তাঁর একটি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। তিনি বলেছেন, 'এই মর্ত্য পৃথিবী ঈশ্বরের টাঁকশাল। এখানে যারা খাঁটি, ওখানে (পরলোকেও) তারা খাঁটি থাকবে। যারা এখানে খাঁটি নয়, তারা পরলোকেও মেকি বলে বিবেচিত হবে। এই পৃথিবী হল ঈশ্বরের টাঁকশাল। টাঁকশালের খাঁটি মুদ্রা বহির্জগতেও খাঁটি, মেকি মুদ্রার বেলাতেও সেই একই নিয়ম।

পৃথিবীতে মনুষ্যজীবন যদি নীতিসম্মত ও ধর্মসম্মত হয়, তবেই স্বর্গে উপযুক্ত সমাদর ও পুরস্কার নিশ্চিত হবে, নইলে নয়। 'প্রেম ও করুণা ব্যতীত কি কোনো ধর্ম হতে পারে? সমস্ত জীবিতর প্রতি ভালোবাসা চাই। ভালো-বাসাই সমস্ত ধর্মের মূল।' প্রেমের জন্য যদি প্রেম না হয়, যদি প্রেম পবিত্র না হয়, তবে কিসের প্রেম? 'স্মরণ রেখো, স্বর্গ বা মর্ত্য বলে কোনো জায়গা নেই। যখনই তুমি সত্য কথা বলো, তখনই স্বর্গ। যখনই মিথ্যা বলবে, তখনই মর্ত্য। সদাচারই স্বর্গ, কদাচারই নরক।' বসবেশ্বর তিনটি জিনিসের উপর জোর দিয়েছেন—মৃদুভাষণ, সত্যবাদিতা এবং সদাচার। 'তুমি যদি অন্যকে 'আইয়া' (মহাশয়) বলে সম্বোধন কর, সে-ই স্বর্গ। তুমি যদি বলো 'এলরো' (লোকটা), সে-ই নরক।' এই সংক্ষিপ্ত মন্তব্যে কবি এক কথায় বলেছেন যে শিষ্ট বাক্য ও সদাচারই সাধারণ মানুষের বিশ্বাস উৎপাদন করতে পারে।

সাহিত্য হিসাবে বসবেশ্বরের বচনসমূহের মূল্য নির্ধারণের চেষ্টা করা হল। এক-একটি করে পরীক্ষা করলেও তাদের স্বতঃস্ফূর্ত কল্পনা শক্তি, অনুভূতি ও প্রকাশভঙ্গি দেখেও আমরা বিস্মিত হই। নিম্নলিখিত বচনেই তার পরিচয় মেলে। 'আমি হলাম সেই নববধূর মতো, যে তৈলাবগাহন করে উজ্জ্বল পরিচ্ছদ ও সোনার রত্নাদি ধারণ করেছে, কিন্তু স্বামীর হৃদয় জয় করতে পারে নি।' এই চিত্রকল্পটি এই অর্থে ব্যঞ্জনাময় যে এতে ভগবদ্‌ভক্তের মানসিক অবস্থা নববধূর মনের সঙ্গেই তুলনীয়। ভক্ত যত রকমের সম্ভব সাধনা করে দেখেছেন, কিন্তু ভগবৎ প্রাপ্তির সর্বোত্তম আনন্দ লাভ করতে পারেন নি।

যে সমস্ত বচন আভ্যন্তরীণ সচেতনতার গভীরতাকে ব্যক্ত করে এবং যে সমস্ত বচন অতীন্দ্রিয় রহস্যবাদের উচ্চলোক থেকে নিঃসৃত, সেইগুলির মধ্যে পাই ঔপনিষদক বাণীর শক্তি ও সৌন্দর্য। সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত প্রবাদ ও বাগ্‌ধারা প্রয়োগের ফলে বচন সাহিত্যের কিছু কিছু সূক্ষ্ম চিন্তাও সহজে বোঝা যায়। অল্লমপ্রভুর কিছু কিছু বচন দুর্বোধ্য, বসবেশ্বরে তেমন দুর্বোধ্যতা নেই। স্বচ্ছ নির্মল এই বচনগুলিতে উচ্চচিন্তার সঙ্গে আন্তরিকতার মণিকাঞ্চন যোগ ঘটেছে।

মধ্যযুগের ভারতবর্ষে বসবেশ্বর নিঃসন্দেহে এক শ্রেষ্ঠ পুরুষ। তাঁর যে সমস্ত বচনে বীরশৈব ধর্মমত তথা বিশ্বজনীন ধর্ম বিশ্বাসের সারাংশ প্রতিফলিত সেগুলি কন্নড তথা বিশ্বসাহিত্যের সম্পদ-স্বরূপ।

অক্কমহাদেবী ও অন্যান্য বচনকার

অক্কমহাদেবী

বচনকারদের নক্ষত্রপুঞ্জে অক্কমহাদেবী (মহাদেবী দিদি) একটি উজ্জ্বলতম নক্ষত্র। অনুপম ব্যক্তিত্ব ও উন্নত কবিত্বশক্তির গুণে এই মহিলা কবির শ্রেষ্ঠত্ব অনস্বীকার্য। কন্নড সাহিত্যের ইতিহাসে তিনিই প্রথম মহিলা কবি। পূর্বে উল্লিখিত কান্তি যদি কল্পিত না হয়ে বাস্তবে মহিলাও হয়ে থাকেন, তবু তাঁর যে সামান্য রচনা আমাদের হাতে এসে পৌঁচেছে, সেগুলিকে বড়জোর পদ্য রচনার নিদর্শন বলা চলে, প্রকৃত উপলব্ধিজাত হৃদয়-সংগীত নয়। যাঁরা উন্নত আধ্যাত্মিক উপলব্ধিকে কবিত্বপূর্ণ গদ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশ করতে পেরেছেন, অক্কমহাদেবী সেই দলের অন্যতম পথিকৃৎ। রোমাঞ্চকর তাঁর জীবন কথা। দরিদ্র পরিবারের সুন্দরী কুমারী মহাদেবীকে দেখে কামাসক্ত রাজা কৌশিক তাঁকে বিয়ে করতে চায়। পরবর্তী ঘটনায় দ্বিমত আছে। কেউ বলেন, মহাদেবী রাজার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে তাঁর আরাধ্য দেবতা চেন্ন মল্লিকা-র্জুনের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েন। মতান্তরে, মহাদেবী তিনটি শর্তে রাজাকে বিবাহ করেন। বিবাহের পরে যখন দেখা গেল রাজা শর্তগুলি অমান্য করে মহাদেবীর ধর্মজীবনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াল, তখন এই রমণী রাজপ্রাসাদ ছেড়ে সংসারজীবন পরিত্যাগ করেন। উল্লিখিত দুটি মতের যেটিই সত্য হোক আসল কথা এই যে মহাদেবী তাঁর প্রকৃত প্রেমিক আরাধ্য দেবতা চেন্ন মল্লিকা-

র্জুনকে লাভের ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষায় কঠোর সাধনায় ব্রতী হন। পূর্ণ আত্ম-সমর্পণের ফলে আরাধ্য দেবতাকে পেয়ে তিনি দিব্য সুখলাভ করেন। যেখানে অল্লমপ্রভু ও বসবেশ্বর 'অনুভবমণ্ডপ' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, মহাদেবী প্রথমে সেই কল্যাণ নামক স্থানে উপনীত হয়ে তাঁর আধ্যাত্মিক জ্যোতি বিকিরণ করে অবশেষে শ্রীশৈলতীর্থে গিয়ে আরাধ্য দেবতার সঙ্গে মিলিত হন।

মহাদেবীর বচনগুলিতে অতি সূক্ষ্ম সংবেদী বা অনুভূতিশীল ও দুঃসাহসী আত্মার আবেগপূর্ণ অভিব্যক্তি। অনুপম চিত্রকল্প ও উৎকৃষ্ট সাহিত্যিক ভাষায় নিবদ্ধ বচনগুলি মহাদেবীর সাধনার বিভিন্ন সূক্ষ্ম স্তর এবং তাঁর উপলব্ধির পথে দুঃখ-আনন্দকে প্রতিফলিত করেছে। উপযুক্তভাবে প্রকাশ করেছে তাঁর পরমানন্দ ও পবম উপলব্ধি। তাঁর অবলম্বিত সাধনার প্রথম পদক্ষেপেই দেখতে পাই পার্থিব জীবনের প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণা এবং আরাধ্য দেবতার উদ্দেশে কাতর প্রার্থনা: 'রেশমী পোকা যেমন নিজের তৈরী সুতোয় জড়িয়ে মারা যায়, আমিও তেমন আমার অবাধ্য আকাঙ্ক্ষায় দগ্ধ হচ্ছি। হে প্রভু, তুমি আমাকে এই উচ্ছৃঙ্খল কামনা থেকে মুক্ত করে আমার চিত্তকে তোমার দিকে ফিরিয়ে নাও। আমার অসার দম্ভ দূর করো, দূর করো আমার দেহের অন্ধকার (কলুষ), হরণ করো আমার আত্মার আলস্য। আমাকে মুক্ত করো এই পৃথিবীর জটিল জাল থেকে।' পার্থিব জীবন সম্পর্কে এই সাধারণ অনুভব থেকে তিনি দিব্য প্রেমিকার মানসিক সত্তার দিকে অগ্রসর হন। প্রেমের উচ্চতমরূপ, উন্মত্ততা, বিরহজনিত যন্ত্রণা, অবিরত অন্বেষণ, মিলনের আনন্দ—এই সমস্তই তাঁর বচনে চূড়ান্ত রূপ লাভ করেছে। যেমন, 'প্রভু আমার, তুমি শোনো আর নাই শোনো, আমি তোমার বিষয়ে গান গাইবই। প্রভু আমার, তুমি সাড়া দাও আর নাই দাও, আমি তোমার স্তুতি থেকে বিরত হতে পারি না। প্রভু আমার, তোমার ভালো লাগুক আর নাই লাগুক, আমি তোমাকে আলিঙ্গন না করে পারি না। তুমি আমার দিকে তাকাও আর নাই তাকাও, আমি তোমার দিকে চেয়ে চেয়ে আনন্দ বোধ না করে পারি না। দুঃখকাতর হৃদয় আমার বিপর্যস্ত। শীতল বায়ু দগ্ধ করছে। জ্যোৎস্না হয়ে গেছে দাব-দগ্ধ দিনের মধ্যাহ্ন সূর্যালোক। শহরের প্রবেশপথে শুল্ক সংগ্রাহকের মতো আমি মর্ম-যন্ত্রণায় ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছি। হে ভ্রমর, হে অলি, হে কোকিল, হে জ্যোৎস্না, তোমাদের সকলের কাছে আমার একটি প্রার্থনা, আমার প্রভুকে

দেখাও। দেহহীন সীমাহীন আমার প্রেমিকের সাহচর্যে আমি সুখী হয়েছিলাম। আমি আর কিছু চাই না। আমার মনে হয়েছিল যেন নতুন জল এসে ভাসিয়ে দিল একটি শুকনো দগ্ধ জলাশয়কে ; যেন প্রবল বৃষ্টি জল ঢেলে দিল একটি শুষ্ক মৃতপ্রায় মরা গাছে। এমনি করে তিনি আমাদের ভগবৎ-প্রীতির যাবতীয় কথা শোনালেন।' তাঁর বচন সংখ্যা বেশি নয়, কিন্তু প্রত্যেকটি এক-একটি উৎকৃষ্ট রত্ন।

পরে, অক্কমহাদেবী তাঁর আধ্যাত্মিক বিবাহের বর্ণনা দিয়েছেন, বলেছেন দীর্ঘ তপস্যার পরে শিবকে পতিরূপে পাওয়ার কথা ; 'হে প্রভু, তোমাকে স্বামীরূপে পাওয়ার জন্য আমি অসংখ্য বছর তপস্যা করেছি। জলের উপর তৈরী মণ্ডপ, ছাত আগুনের, শিলাপিণ্ড নির্মিত আসন। তাদের বিবাহ হল, পদবিহীন বধূ, মস্তকহীন বর। আমার স্বামী চেন্নমল্লিকার্জুনের সঙ্গে আমার বিয়ে হল—বিচ্ছেদবিহীন মিলনের জন্য।' এই সমস্ত বচনের মূলভাব হল অধ্যাত্ম শৃঙ্গার। নানা অনুষঙ্গী ব্যভিচারী ভাবসহ প্রকাশিত হয়ে মামুলী প্রচলিত কামরসের বৈচিত্র্যহীন ক্লান্তি থেকে মনে নবরসের উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। অক্কমহাদেবীর শিক্ষা ও ভক্তি তাঁকে চিন্তা-ভয় বর্জিত এক অদ্বিতীয় মুক্তি দান করেছে। নিম্নলিখিত বচনগুলি থেকে বোঝা যায় সাধনার পথে তিনি কী আত্মিক শক্তি সংগ্রহ করে নিন্দা, কলঙ্ক ও ঘৃণার সম্মুখীন হয়েছিলেন। পাহাড়ের শিখরে ঘর করে বন্য জন্তুকে ভয় করলে চলবে কেন? মানুষ তীরে ঘর বেঁধে জোয়ার-ভাঁটাকে ভয় করবে? হাটের মধ্যে ঘর করে গোলমালকে ভয় করলে কেমন হয়? হে প্রভু, এই পৃথিবীতে জন্ম নিয়ে নিন্দা-স্তুতিকে ভয় না করে শান্তচিত্তে অবস্থান করব। যদি ক্ষুধা পায় ভিক্ষা করে ক্ষুন্নিবৃত্তি করব। যদি পিপাসা লাগে পুকুর ও কূপের জল পান করব। নিদ্রা পেলে পুরানো ভগ্ন মন্দিরে শয়ন করব। হে প্রভু, নিরন্তর তুমি আমার আত্মার সঙ্গী ছিলে। তোমার কেউ রক্ষক নেই বলে দুঃখ করো না। যাই ঘটুক না কেন, আমি ভীত নই। শুষ্ক পত্র খেয়ে আমি জীবন ধারণ করব। তরবারির উপর মাথা রেখে শয়ন করব। যদি আমার প্রভু আমাকে ভূপাতিত করেন, আমি আমার এ দেহপ্রাণ তাঁর চরণে সমর্পণ করে বিশুদ্ধ চিত্তে বেরিয়ে আসব। যদি আমার চারিদিকে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ উড়ে বেড়ায়, আমি বলব আমার ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবারিত। আকাশ যদি মুষলধারে বর্ষণ করে, আমি বলব

আমাকে স্নান করাচ্ছে। পাথর যদি ভেঙে পড়ে আমার উপরে, আমি বলব আমাকে সাজাবার জন্য এটা ফুল। হে প্রভু, যদি আমার শিরশ্ছেদ ঘটে, আমি বলব তোমার চরণে আমার প্রাণ নিবেদিত।' এই বচনগুলি স্পষ্ট দেখিয়ে দেয় কী অসাধারণ সাহসে তিনি জীবনের অগ্নি পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন। তাঁর স্থৈর্য, নির্ভীকতা, উদ্‌বেগহীনতা অবিচলিতভাবে শীর্ষস্থানে আরোহণ করেছে। যে সহজ সরল ও স্বতঃস্ফূর্ত শব্দ ও চিত্রকল্প কবির আত্মিক শক্তির অভিব্যক্তি ঘটিয়েছে, তার চেয়ে তাঁর উপলব্ধির উৎকৃষ্টতর নিদর্শন আর কিছু হতে পারে না।

কয়েকটি উক্তির মধ্যে তিনি সংক্ষিপ্ত ও লক্ষণীয় বাক্‌প্রতিমার সাহায্যে তাঁর জীবন-স্বপ্নের কথা বলেছেন। 'যদি তুমি সাপের বিষ-দাঁত ভেঙে তার সঙ্গে খেলা করতে পার, তার সংসর্গ মন্দ নয়। ভগবানের চিন্তা নিয়ে নরকে বাস করলেও মুক্তি, ভগবৎ-চিন্তাবিহীন স্বর্গও নরকতুল্য। তোমার-প্রেমবিহীন সুখ ও দুর্গতি, তোমার ভালোবাসার দুঃখও মহানন্দ। নিজেকে যদি না জান, তবে অন্য সব কিছু জেনে লাভ কী?' এ ছাড়া, তিনি মাঝে মাঝেই তাঁর স্বভাবসিদ্ধ স্পষ্টভাষায় তৎকালীন সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। ত্রিপদী ছন্দে রচিত 'যোগাঙ্গত্রিবিধি' মহাদেবীর একগুচ্ছ ক্ষুদ্র অথচ অর্থযুক্ত কবিতা। এতে পাই তাঁর অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার অন্তরঙ্গ পরিচয়। মোটের উপর শৃঙ্গার ভাবের সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার মিশ্রণ ঘটিয়ে তাকে বচন কবিতার নমনীয় রূপে প্রকাশ করে অক্কমহাদেবী তাঁর অতুলনীয় ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। কর্ণাটক তথা ভারতবর্ষের মহীয়সী রমণীদের তিনি যথার্থই উচ্চস্থানে অধিষ্ঠিত হওয়ার যোগ্য।

অন্যান্য বচনকারদের মধ্যে বসবেশ্বরের ভাগিনেয় চেন্নবসবেশ্বর কি অল্লম-প্রভু 'মহাজ্ঞানী' বলে প্রশংসা করেছেন। বীর শৈবধর্মের দার্শনিক মর্মবস্তুর বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করে প্রচার করাতেই তিনি সমধিক পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। তাঁর রচিত বচন কবিতাগুলি সাহিত্যরস বর্জিত না হলেও উৎকৃষ্ট সাহিত্য স্তরে উঠতে পারে নি। অপর একজন সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি হলেন সোন্নলিগে-র সিদ্ধরাম। ইনি একাধারে যোগী ও কর্মী ছিলেন। অল্লমপ্রভু ও চেন্ন-বসবেশ্বরের আশীর্বাদপূত সিদ্ধরাম ছিলেন জ্ঞানী ও কর্মযোগী। তাঁর বাণী থেকে তাঁর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে কিছু জানা যায়। ইনি এক সময়ে পুকুর ও

মন্দির নির্মাণে খুব আনন্দ পেতেন। পরে বুঝতে পারেন ঈশ্বর পাথরের মধ্যে নেই। একটি বচনে তিনি বলেছেন: 'এই ক্ষুদ্র মানুষগুলি মাথা নেড়ে নেড়ে বলে ঈশ্বর পাথরের মধ্যে বিরাজমান। যদি বলা হয় ভগবান পাথরে আছেন, মাটিতে নেই, তাহলে তা নিশ্চয়ই সর্বব্যাপক ঈশ্বরের ত্রুটি।' এইভাবে তিনি আলোর সন্ধান পান, এবং এইভাবেই তিনি কর্মে নৈপুণ্য ও অনাসক্তি যোগ শিক্ষা করেন।' তাঁর বচনগুলিকে উজ্জ্বল সাহিত্যিক সৃষ্টির পর্যায়ে ফেলা যায়। এতে তাঁর অনুভব সম্পদ ও ব্যক্তিত্ব বিকাশেরও পরিচয় আছে।

আরও কয়েকজন অতীন্দ্রিয়বাদী নরনারী কন্নড সাহিত্যের এই সর্বাপেক্ষা ফলপ্রসূ যুগে বাস করতেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন ছিল উচ্চশ্রেণীর—রাজপুত্র, মন্ত্রী এবং পণ্ডিত। কিন্তু বেশির ভাগ ছিলেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃত্তিতে নিযুক্ত এবং প্রধানত নিরক্ষর সাধারণ লোক। তথাপি আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভের জন্য এবং আত্মপ্রকাশে তাঁদের উৎসাহ ছিল বিস্ময়কর। সৌভাগ্যক্রমে তাঁদের সমস্ত বচনই আমাদের হাতে পৌঁচেছে। এইসব বচনকার বৃত্তির উঁচু-নীচু ভেদভাব নিয়ে মাথা ঘামাতেন না, 'কায়কবে কৈলাস' (কর্মই ঈশ্বরের আবাসস্থল) জিহ্বাগ্রে এই মূলমন্ত্র তাঁরা যে-যার বৃত্তিতে নিযুক্ত থাকতেন। এঁদের নাম থেকে নিজ নিজ সেবার পরিচয় মেলে। অম্বিগর (জেলে / পাটনী) চৌডয়্যা, মোলিগেয় (কাঠুরে) মারয়্যা, মুলিয়া (তাঁতী) চন্দয়্যা, মডিবল (ধোপা) মাচয়্যা ইত্যাদি। 'শিবানুভবমণ্ডপ' নামে এই অতীন্দ্রিয় সাধকদের পরিষদে সকলেই সাদরে গৃহীত হতেন। অক্কমহাদেবীর সঙ্গে মহাদেবী, বিজ্জলদেবী, কালম্বে, নীলম্মা প্রভৃতি অন্যান্য সাধিকারাও সমভাবে সম্মানিত হতেন। বচনকারদের নাম থেকে বোঝা যায় সংখ্যায় তাঁরা দুশো-র বেশি ছিলেন। দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কর্ণাটকের আধ্যাত্মিক ভূমিতে অভূতপূর্ব ভক্তিসাহিত্যের সৃষ্টি হয়। এ যুগে সামান্য সামান্য লোকও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সংস্পর্শে মানসিক ও নৈতিকগুণে সমুন্নত হয়। নিজেদের সাধনা শক্তিতে তারাও 'শরণ' শ্রেণীভুক্ত হয়। সাধারণভাবে বলা যায়, সমস্ত বচনকারের বচনেই কতগুলি বিশেষ বিষয় স্থান পেয়েছে। যেমন, ত্যাগ, ভক্তি, অতীন্দ্রিয় অনুভব, ধর্মের মত ও সাধনা, সামাজিক কপটতার সমালোচনা এবং শরণদের প্রশংসা ইত্যাদি। বেশ কিছু সংখ্যক বচন অগ্রজ লেখকদের নিষ্প্রাণ অনুসরণ ও সাহিত্য গুণবর্জিত। কিন্তু এমন অনেক

বচনও আছে যেগুলি প্রকৃত অতীন্দ্রিয় অনুভব শক্তি ও আন্তরিকতা গুণে রসোজ্জ্বল।

বেশির ভাগ বচন তিন-চারটি বাক্যের সমবায়ে গঠিত ক্ষুদ্র গীতিকবিতা বিশেষ। প্রতিটি বচনের শেষে বচনকাব্যের বিশেষ দেবতার প্রতীক দিয়ে লেখকের নাম শনাক্ত করা যায়। অল্প কিছু বচন বেশ দীর্ঘ আকৃতির। সিম্মলিগেয় চেন্নরাম-রচিত নিম্নলিখিত বচনটি গল্পাকারে লিখিত এবং বিশেষ ব্যঞ্জনাময়।

'একটি লোক গভীর বনপথ দিয়ে যেতে যেতে নানাপ্রকার বিপদের সম্মুখীন হয়। কখনো বাঘ, কখনো দাবাগ্নি, কখনো রাক্ষসী, কখনো বা বন্যহস্তী - বিভিন্ন দিক থেকে এসে একে একে তাকে পরাভূত করে। এই দৃশ্যে ভীত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় লোকটি একটি পুরানো পরিত্যক্ত কুয়ো দেখে আত্মরক্ষার জন্য তার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে গিয়ে কুয়োর মধ্যে একটি ফণা-তোলা সাপ দেখে অবাক হয়ে যায়। ইঁদুরে কামড়ানো একটি লতা আঁকড়ে ধরে লোকটি শূন্যপথে ঝুলে থাকে। যখন মৌমাছিগুলি তাকে হুল ফোটাতে থাকে, তখন তার নাকের আগায় পড়া এক ফোঁটা মধু জিভ দিয়ে চেটে নেয়।'

যখন আমরা সাপটির কথা চিন্তা করি, বুঝতে পারি দুঃখের আগার এই জীবনে সমস্ত সুখ ঐ পথিকটির আনন্দের মতো, যে চতুর্দিকে বিপদ পরিবেষ্টিত হয়ে কিছু মধু পান করতে পারছে।

সমগ্রভাবে এই বচন সাহিত্যের সাহিত্য রূপ এবং তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যের বিচার করা যাক। সংক্ষেপে বলা যায়, এগুলি আধ্যাত্মিক গীতিকাব্য, রহস্যময় ভাঙা গদ্যে লেখা এবং মধ্যযুগের কন্নড বাগ্‌ধারায় সমৃদ্ধ। বিশ্ব-সাহিত্যে এই শ্রেণীর তুল্য সাহিত্যরূপ পাওয়া দুষ্কর। যদিও বাইবেলের মধ্যে à Kempis এবং Marcus Aurelius-এর লেখায় সহজ সাহিত্যিক গদ্য, চিন্তামূলক গদ্য এবং আংশিক গীতিকাব্যের গুণ মেশানো গদ্য পাওয়া যায়, তথাপি বচন কবিতার নির্দিষ্ট রহস্যমূলক কাব্যগুণ সমৃদ্ধ গদ্যের উদাহরণ আমরা কোথাও পাই না। এতে কেবল কাব্য-গদ্য আখ্যা দিলে বচন সাহিত্যের প্রতি সুবিচার করা হবে না। বচন সাহিত্য একদিকে যেমন স্বতঃস্ফূর্ত কল্পনা-শক্তির প্রকাশ, অন্যদিকে তেমনি তার গভীর ও স্বপ্ন অনুভূতির সমৃদ্ধি।

জনজীবনের দৃষ্টান্ত, বাগ্‌ধারা ও প্রবাদের সুপ্রচুর ও সমুন্নত প্রয়োগের সাহায্যে বচন সাহিত্যে অস্তিত্বের (জীবনের) মহত্তর সত্য উদ্‌ঘাটিত। কিছু বচনে পাই যথার্থ নম্রতাসহ গুরুর কাছে ভক্তের মন খুলে দেওয়ার তীব্র আবেগ, আবার কিছু পদে আছে সমাজ জীবনের দোষত্রুটির অকপট নির্ভীক সমালোচনা। কয়েকজন বচনকার তাঁদের নিজ নিজ বৃত্তির কাজকর্মের উপমা উদাহরণ দিয়ে তাঁদের আধ্যাত্মিক অনুভবের কথা ব্যাখ্যা করেছেন।

বচন সাহিত্য একাধারে সাহিত্য ও দর্শন। সাহিত্য, কারণ এক একটি বচন কবির অন্তরঙ্গ অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে লেখা এবং নান্দনিক সৌন্দর্যে মণ্ডিত। দর্শন, কারণ এতে আছে নির্দিষ্ট জীবন-দৃষ্টি ও আচরণ-বিধি। বচন সাহিত্য মুখ্যত উচ্চশ্রেণীর রচনা যদিও সমস্ত বচনকে উৎকৃষ্ট বলে মেনে নেওয়া চলে না।

কন্নড ভাষায় বচন সাহিত্য উপনিষদের তুল্য বলে বিবেচিত। একদিক থেকে কথাটি যথাযথ। তবে বচন সাহিত্যে যেমন সমাজনীতি ও ধর্মীয় বিধি নিয়ে মন্তব্যটি করা হয়েছে, উপনিষদে তেমন কিছু নেই। ভারতীয় তথা বিশ্বসাহিত্যে বচনগুলি কন্নড সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ দান বলে গ্রহণযোগ্য।

হরিহর

দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর আরম্ভ কালের দিকে দৃষ্টিপাত করলে তীব্র ভগবদ্‌ভক্তির তিনজন কবির সাক্ষাৎ পাই—হরিহর, রাঘবাঙ্ক ও পদ্মরস। এঁরা তিনজনেই বসবেশ্বর এবং অন্যান্য সাধকের প্রদর্শিত পথে ঈশ্বরে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের ভাবদ্বারা অনুপ্রাণিত। বচন সাহিত্য সম্পদেরও তাঁরা প্রকৃত উত্তরাধিকারী। তাঁরা প্রত্যেকেই স্ব স্ব ভঙ্গীতে তার সদ্‌ব্যবহার করেছেন। তাঁরা কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা, কিন্তু রচনাকার নয়। তাঁরা রচনার নতুন পথ খুলে দিয়েছেন এবং নতুন বিষয় ও নতুন ছন্দ বেছে নিয়েছেন। একথা প্রথম দু'জন অর্থাৎ হরিহর রাঘবাঙ্ক সম্পর্কে অধিকতর প্রযোজ্য। হরিহর শিবভক্তির মহাকবি, তাঁর গ্রন্থাদি থেকে আমাদের মানস নয়নে ভেসে ওঠে এক ভক্তির আকুলতাপূর্ণ প্রাণবন্ত ব্যক্তিত্ব। তাঁর রচনাবলীর নাম : 'পম্পাশতক', 'রক্ষাশতক', 'মুডিগেয় অষ্টক', 'গিরিজা কল্যাণ' এবং 'শিবগণদ রগলেগালু'। প্রথম দুটি গ্রন্থের প্রত্যেকটি একশত স্তবকবিশিষ্ট।

উভয় গ্রন্থেই কিছু আত্মকথার আভাস আছে, কী করে কবি পার্থিব জীবনের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ভগবানের আকুল ভক্তে পরিণত হলেন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হল এই যে এই দুটি গ্রন্থে কবি স্পষ্ট ভাষায় তাঁর কবিতার উদ্দেশ্য সম্পর্কে ঘোষণা করেছেন : 'আমার রচনা আমি শিবের কাছে বিক্রয় করে দিয়েছি। বিষ্ণু, ব্রহ্মা প্রভৃতি অন্য দেবতার স্তুতি আর আমি করতে পারব না।' তিনি তাঁর কবি-বন্ধুদের কাছে আবেদন করে বলেছেন মর্ত্যের মানুষ নিয়ে কবিতা লিখে নিজের পতন না ঘটিয়ে দিবারাত্রি যেন শিবের স্তুতি ও উপাসনা করেন। এইভাবে হরিহর কন্নড কাব্য-সাহিত্যে এক নতুন ধারার প্রবর্তন করে নতুন দিগ্‌দর্শন করিয়েছেন। তাঁর অনুগামী শৈবকবিরা 'হরিহর মার্গ' (হরিহর প্রবর্তিত গ্রন্থ) অবলম্বন করেন।

হরিহর রচিত 'গিরিজাকল্যাণ' (পার্বতীর বিবাহ) তাঁর বিশিষ্ট প্রতিভার পরিচয় চিহ্নিত চম্পূ কাব্য। সংস্কৃত কাব্যাদিতে এবং শৈবপুরাণগুলিতে বর্জিত শিবপার্বতীর বিবাহই এই কাব্যের মুখ্য বিষয়। কবি হরিহরের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল যথাসম্ভব জীবন্তরূপে পার্বতীর (গিরিজার) চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের বর্ণনা করা। গিরিজার উপর কবির দৃষ্টি নিবদ্ধ বলে কাব্যটির নামকরণ 'গিরিজাকল্যাণ'। একই বিষয় নিয়ে অনেককাল আগে কালিদাস লিখে গেছেন 'কুমারসম্ভব' কাব্য। উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য গ্রন্থের পৃথক পৃথক নামকরণ থেকেই বোঝা যায়। গিরিজার বিবাহ দিয়েই হরিহরের গ্রন্থ সমাপ্ত, অপর দিকে শিবপার্বতীর মিলনের ফলে জাত কুমারের হাতে তারকাসুরের মৃত্যুতে 'কুমারসম্ভবে'র সমাপ্তি। বহু বর্ণনায় ভারাক্রান্ত বলে 'গিরিজাকল্যাণে' কাহিনী অগ্রগতি মন্থর। গ্রন্থের শেষার্ধে কাহিনী গতিবেগ লাভ করে এবং বর্ণনাগুলিও প্রসঙ্গের উপযোগী হয়ে ওঠে। হরিহর ছিলেন শক্তিশালী গল্পলেখক। তিনি জানতেন কোথায় কিভাবে গল্পের আখ্যানকে ত্বরান্বিত করা দরকার। আনন্দ, ক্রোধ, ভক্তি ও সাহসের প্রগাঢ় অনুভূতির কথা বলতে গিয়েই হরিহরের বর্ণন কৌশল চরম উৎকর্ষ লাভ করে। তখন তাঁর সমস্ত শক্তি সৃজন-মূলক প্রকাশের শীর্ষস্থানে উন্নীত হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, শিবের তৃতীয় নেত্র-নিঃসৃত আগুনে মদনভস্মের কথা বলা যায়। রতির বিচ্ছেদ বেদনা, মহাদেব কর্তৃক পার্বতীর প্রেম প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় দেবীর ক্রোধ। রতিবিলাপ প্রসঙ্গে পাই : 'হায় মদন, তুমি ভেবেছিলে তোমার পুষ্পকার

দিয়ে তুমি শিবকে পরাভূত করবে। আমি কী করে জানব যে তুমি ললাট নেত্রের অগ্নিশিখায় ভস্মীভূত হয়ে যাবে? পশুর লোমে আবৃত শয্যা তোমার পক্ষে কঠিন ছিল বলেই কি তুমি শিবের অগ্নিস্রাবী চক্ষুর মধ্যে আসন পাততে চাইলে!'

রতি তার স্বামীকে পুনর্জীবিত করার জন্য পার্বতীর কাছে কাতর মিনতি করে এবং পার্বতীও তাকে সাহায্যের আশ্বাস দেন। আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্না পার্বতী কঠোর তপস্যা দিয়ে শিবকে আকৃষ্ট করলে শিব বটুক ব্রাহ্মণের বেশে পার্বতীর তপস্যা স্থলে উপস্থিত হন এবং পার্বতীর সম্মুখে শিব নিন্দা শুরু করলে পার্বতী ক্রুদ্ধ হন। পার্বতী শিবের দিকে ভস্ম ছুঁড়ে মারলে শিবের আসল রূপ প্রকাশ পায়। কবি সুন্দর একটি মন্তব্য দিয়ে এই প্রসঙ্গটি শেষ করেন: 'স্বয়ং ভগবান শিবের দ্বারা গৃহীত হলেও ছল-চাতুরী কি সত্যের সম্মুখে দাঁড়াতে পারে?'

মোটের উপর 'গিরিজকল্যাণে' হরিহরের বৈশিষ্ট্যসূচক একটি চম্পূ কাব্য পাই যা মামুলী গতানুগতিক পথ পরিত্যাগ করে গতি ও দীপ্তির পরিচয় দেয়। একদিকে ব্রতবাদী সাহিত্যের ঐতিহ্য, অন্যদিকে বচন সাহিত্যে প্রকাশ-মান পরিবর্তনের ধারা—এই দুয়ের মধ্যে হরিহর একটি মধ্য-পন্থা বেছে নিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর সে প্রয়াস পুরো সফল হয়নি। আবহমানকাল প্রচলিত কাব্যপ্রথা 'অষ্টাদশ শ্রেণীর বর্ণনা'র কবলে পড়ে হরিহর তাঁর স্বাচ্ছন্দ্য ও ঔচিত্যবোধ হারালেন। পার্বতীর চরিত্র দেবলোক ও মনুষ্য-লোকের মধ্যবর্তী। এই সব নিয়ে কবির অসাধারণ প্রতিভা শব্দ ও চিত্র-কল্পের মধ্য দিয়ে সুপরিস্ফুট। আমরা এই কাব্যেই তাঁর পরবর্তী কাব্যগুলির সৌন্দর্য-মাধুর্যের আভাস পাই।

শৈবসাধকদের জীবন চরিত 'শিবগণদ রগলেগাল্ল' কবির ব্যক্তিত্ব প্রকাশের পূর্ণ সুযোগ এনে দেয়। মোট ১২০ জনের জীবনচরিত্রের দৈর্ঘ্য ও গুণগত মান এক শ্রেণীর না হলেও সবগুলিতেই আবেগ ও পরিণতির লক্ষণ আছে। লোকপরম্পরাগত উৎস থেকে গৃহীত কাহিনীগুলির বয়ন-কৌশল পৃথক পৃথক। তবে সবগুলির মধ্যেই কাব্যরূপ, বর্ণনা, শব্দপ্রয়োগ এবং সাধারণ ধারার ঐক্যে একই প্রতিভার পরিচয় পাই। গ্রন্থকারের নাম না জানা থাকলেও তাঁকে শনাক্ত করা মোটেই কঠিন নয়। 'রগলে' হচ্ছে সুরে-লয়ে গেয়

অনির্দিষ্ট সংখ্যক দ্বিপদী-র সমাহারে গঠিত একপ্রকার ছন্দোবদ্ধ রচনা। পুরানো চিরায়ত কবিরা তাঁদের গ্রন্থে মাঝে মাঝে বর্ণনার জন্য এই রগলে-র আশ্রয় নিতেন। কিন্তু হরিহরই তাঁর জীবনচরিত কাব্যে এর ব্যাপক প্রয়োগ করেন। তিনি যে নতুন ধরনের চম্পূ লিখলেন তাতে পর্যায়ক্রমে একটি মার্গে রগলে ছন্দে লিখিত পদ্য, একটি মার্গে গদ্য। বসবেশ্বরের জীবনচরিত 'বসবরাজদেবর রগলে' হরিহর-রচিত একখানি উৎকৃষ্ট জীবনী-কাব্য এবং কন্নড কাব্যে উচ্চস্থানের অধিকারী। এ গ্রন্থে কবি গভীর দরদ দিয়ে মহান বীরশৈব সাধক বসবেশ্বরের জীবন ও ব্যক্তিত্বের কথা বলেছেন।

এ গ্রন্থ রচনায় কবির দ্বিবিধ আনন্দ। প্রথমত, বসবণ্ণার অন্তরঙ্গ জীবনের বর্ণনা; দ্বিতীয়ত, ভক্ত কবির আত্মপ্রকাশের আকুলতা। এ বইয়ের বিশেষ গুণ হল কাব্যের নায়কের প্রতি কবির গভীর শ্রদ্ধা এবং তাঁর ব্যক্তিত্বের সঙ্গে কবির সম্পূর্ণ একাত্মীভবন। কখনো কখনো পাঠকের মনে হবে ভাবের অতিরঞ্জন ও শব্দের বাড়াবাড়ি ঘটেছে, কিন্তু কবি হয়তো সে সব স্থলেও বিষয়ের প্রতি পূর্ণ বিচার হয়নি বলে মনে করে থাকবেন। জীবন-কাব্যটি অতিশয় আবেগপূর্ণ। গোড়া থেকেই শব্দ ও চিত্রকল্পের অবিরাম প্রবাহ চলেছে। কবি সচেতন কোথায় কাহিনী বর্ণনাকে দ্রুত করা দরকার এবং কোথায় প্রয়োজন চরিত্র সৃষ্টির। স্পষ্টই বোঝা যায় কবির মুখ্য উদ্দেশ্য তাঁর নায়ক চরিত্রের প্রাণবন্ত চিত্রণ।

বসবণ্ণা যখন মহৎ ব্রত নিয়ে ভূমিষ্ঠ হন, মনে হল যেন শুভ কাল পুরুষ মূর্তি-রূপে অবতীর্ণ। শৈশবেই দেখা গেল প্রভুর প্রতি তাঁর ঐকান্তিক ভক্তি। অল্প বয়সেই তিনি পিতৃমাতৃহীন হন এবং শিবের পরম ভক্ত তাঁর ঠাকুমার সযত্ন লালন-পালনে বড় হতে থাকেন। কৈশোরেই কবি শিবচিন্তায় বিভোর হয়ে থাকতেন। পরে তিনি গলদেশ থেকে যজ্ঞোপবীত ছিঁড়ে ফেলে দেন, কারণ তাঁর মনে হয়েছিল ঐ পৈতা হল তাঁর নিয়তি বা কর্মের লতাতুল্য। এইভাবে কবি তাঁর জন্ম স্থান বাগেওয়াড়ি ত্যাগ করে শিক্ষাদীক্ষার জন্য কম্পডিসংগমে উপনীত হন। তার পরে এক শঙ্কর মন্দিরে গিয়ে হঠাৎ তিনি এমনভাবে উৎসাহিত হয়ে ওঠেন যেন বহুকাল বিস্মৃত অতীতের কথা তাঁর মনে পড়ে গেছে। পূজা গৃহে ঠাকুরের সামনে তিনি সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করেন। এই বলে তিনি গাত্রোত্থান করেন—'হে আমার প্রভু, তুমি আমাকে সযত্নে রক্ষা করো। তুমিই

আমার স্বপ্ন, তুমিই আমার প্রধান আশ্রয়।' ভক্তি বিচলিত বসবেশ্বর অধরে শিবনাম নিয়ে মূর্ছিত হন। প্রভু পরম করুণায় তাঁর দিকে তাকিয়ে তাঁর মনোলোকে প্রবেশ করে বললেন, 'তোমার ভয় নেই, বসব। আমি তোমাকে পুনর্জন্ম থেকে মুক্তি দেব এবং আমার যত্নে তুমি সমস্ত জগদ্‌বাসীর প্রশংসা অর্জন করবে।' সমস্ত অংশটি এই গ্রন্থের প্রধান বৈশিষ্ট্য ব্যাকুল ভাবাবেগ ও উদ্দীপনার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। বসব এখন দিবারাত্রি শিবপূজায় নিমগ্ন। হরিহর খুব মর্মস্পর্শী ভাষায় বর্ণনা করেছেন কীভাবে বসবেশ্বর শিবপূজার ফুল তুলছিলেন। নায়ককে পুরোপুরি বোঝার সুবিধার জন্য কবি তুচ্ছ ঘটনাকেও অকিঞ্চিৎকর বলে বিবেচনা করেন নি। যেমন, বাগানে ফুল তুলতে আসার ফলে দেবতার সঙ্গে ক্ষণিক বিচ্ছেদও বসবের কাছে যুগযুগব্যাপী বলে মনে হল, আবার যুগব্যাপী শিবপূজার সময়ও মনে হল এক মুহূর্ত মাত্র। অতিরঞ্জন সন্দেহ নেই তবে বিশেষ প্রসঙ্গে এরূপ অতিরঞ্জন অস্বাভাবিক নয়।

একবার স্বপ্নে দর্শন দিয়ে প্রভু বসবকে বললেন বিপুল রাজার রাজধানী মঙ্গলওয়াডা-য় যেতে। কিন্তু প্রভুর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার চিন্তাই ভক্তের কাছে এত যন্ত্রণাদায়ক বলে মনে হল যে তিনি দেবতাকে আলিঙ্গন করে চিৎকার করে উঠলেন, 'প্রভু, আমার সর্বনাশ। তুমি আমাকে যেতে বলছ, তুমি কি আমার মানসিক ক্লেশ বুঝতে পারছ না? আকাশ থেকে ব্যক্তির আশ্রয় হয়ে তুমি তাকে ছেড়ে দেবে? দাবাগ্নিতে দগ্ধ ব্যক্তির কাছে স্নিগ্ধ বর্ষণ হয়ে তুমি তাকে ত্যাগ করবে? গভীর সমুদ্রে নিমজ্জমান ব্যক্তির কাছে ভেলা হয়ে তুমি তার দিকে ফিরে তাকাবে না?' সমস্ত অংশটি এই একই সুরে গাঁথা। কী আকুলতা! কী নিদারুণ যন্ত্রণা! কবি এখানে করুণ রসে সিক্ত খুব সরল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্য ব্যবহার করেছেন। অবশেষে তিনি তাঁর নায়ক বসবণ্ণার করুণ আর্তনাদের মধ্য দিয়ে নিজের আত্মিক যন্ত্রণাকে ব্যক্ত করেছেন।

কাব্যটির শেষাংশে একটি কঠিন নাট্যমুহূর্ত। কিছু অতি রক্ষণশীল ব্যক্তি বসবণ্ণার প্রতি ঈর্ষ্যা ও বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে কুৎসা রটাতে থাকে। বিজ্জলের রাজসভায় এক মালী রাজাকে কেতক পুষ্পের স্তবক উপহার দিলে বিজ্জল তার থেকে একটি পাপড়ি নিয়ে বসবণ্ণাকে দেন। বসব তাঁর রত্ন পেটিকায় রেখে পুষ্পদলটি লিঙ্গকে অর্পণ করেন। তৎক্ষণাৎ জনৈক বসব-দেহী ব্যক্তি দাঁড়িয়ে উঠে মন্তব্য করে যে শৈবশাস্ত্র মতে প্রভুকে কেতক পুষ্প দেওয়ার

বিধি নেই। বসব উত্তর দিলেন যে ভক্ত প্রদত্ত যে কোনো বস্তু প্রভু গ্রহণ করেন। বিজ্জল একবার প্রমাণ চাইলে বসব দেখালেন যে সেখানে উপস্থিত সকল ভক্তের পেটিকায় সেই একই কেতকী পাপড়ি। বিজ্জল বসবের পায়ে পড়ে নিজের ভুল শুধরে নিলেন।

আর একবার সেই একই বিদ্বেষীরা বিজ্জলের কাছে বসবণ্ণর নিন্দা করে যে বসবের উপর শরণদের প্রভাব ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। তাদের অভিযোগ এই যে রাজ ভাণ্ডারের সমস্ত রত্ন শরণদের পরতে দেওয়া হয়েছে। নিন্দুকদের কথায় বিশ্বাস করে রাজা বিজ্জল বসবকে ভর্ৎসনা করে বললেন, 'তোমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে যখন আমি রাজকোষের পূর্ণ দায়িত্ব তোমাকে দিয়েছি, তখন তোমার কি উচিত এমন বিশ্বাসঘাতকতা করা? তুমি কি তোমার শরণদের আমার সমস্ত রাজ্য অর্পণ করে আমার সর্বনাশ ঘটাবে? আর নয়। আজই এক্ষুনি তুমি আমার সমস্ত ক্ষতিপূরণ করে দাও।' বসব দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের ভঙ্গীতে তীক্ষ্ণভাবে জবাব দিলেন, 'হে রাজা বিজ্জল, তুমি সৎলোকের ধরণ ধারণ জাননা মনে হচ্ছে। সমুদ্র কি নদীর কাছে জল প্রার্থনা করে? সূর্য কি দর্পণে প্রতিবিম্বিত আলোর প্রার্থী হয়? ভক্তজন কি তোমার ধনরত্ন কামনা করে? তারা শুধু তাদের প্রাপ্যটুকু নিয়েছেন, তার বেশী নয়।' বসব যখন উপস্থিত সকলকে নিয়ে রাজকোষে গেলেন, সেখানকার ধনরত্ন বহু বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। তখন ঈর্ষ্যাপরায়ণ নিন্দুকদের মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল এবং রাজা লজ্জায় মাথা নত করলেন। শরণদের আনন্দ আর ধরে না। বসবণ্ণা তখন ভগবান রুদ্রের মতো গর্জন করে উঠলেন, 'তোমার ধনসম্পদ টাকাকড়ির মিথ্যা জাঁক দেখিয়ে নিজেকে আর মূর্খ বানিও না। কুবের যে ধনপতি হয়েছিলেন তার কারণ তিনি তাঁর ধনের একাংশ সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সেবকদের দান করতেন। সূর্য যে জ্যোতির ভাণ্ডার তার কারণ সূর্য ঈশ্বর সেবকদের কিছু কিছু আলো বিকিরণ করেন। তুমি তাহলে কী ভেবে দেখো, একটি ক্ষুদ্র অণু, সামান্য কীট, মাটির ডেলা, কাপড়ের পুতুল, মায়ায় চালিত রজ্জু এবং প্রভুর মন্দিরের দাসানুদাস।'

উল্লিখিত দৃশ্যটি সাধারণ কবির হাতে অলৌকিক ঘটনারূপে বর্ণিত হতে পারত, কিন্তু কবি হরিহরের প্রতিভার যাদুস্পর্শে ব্যাপারটি তীব্র নাট্যরসপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সেই বৈপ্লবিক যুগের উত্তেজনা ও সংঘর্ষ সংঘাতের বর্ণনায় কবি সফলকাম। সব চেয়ে বড় কথা, ভক্ত ও সমাজ সংস্কারকরূপে বসবণ্ণার ব্যক্তি-

ত্বকে তিনি পূর্ণ আকার দিতে পেরেছেন। অন্যান্য রগলে-র মধ্যে 'নাম্বিয়ণ্ণন রগলে' 'বসব রামদবর রগলে'র মতোই শব্দশক্তি ও কল্পনাসমৃদ্ধিতে মনের উপর ছাপ ফেলে। কিন্তু এটি ভিন্ন প্রকৃতির রগলে। শৈব পুরাণের বিশ্বস্ত অনু-গামী হতে গিয়ে কবি নম্বিয়ণ্ণর যে ছবি এঁকেছেন তা বসবের জীবন কাহিনীর মতো সম্পূর্ণও নয়। আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে সহায়কও হতে পারে নি। তথাপি শব্দের ও হাস্যরস পরিবেশনে এর কারুকার্য স্বীকার করা উচিত। এ গ্রন্থের গদ্যাংশ পদ্যাংশের চেয়ে বেশি শক্তিশালী। অন্যান্য রগলের মধ্যে 'তিরুনীলকণ্ঠ রগলে', 'মহাদেবিয়ক্কন রগলে' গল্পরসের জন্য আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। 'প্রভুদেবর রগলে' এবং 'রেবণ সিদ্ধেশ্বর রগলে' বর্ণিত ব্যক্তি-দের মহত্ত্বের জন্য আমাদের মর্ম স্পর্শ করে। আয়তনে ছোট হলেও 'গুণাঢ্যন রগলে' আমাদের মুগ্ধ করে তার রুদ্র নাট্যের ছন্দোলয় ও গতির জন্য। কন্নড সাহিত্যে হরিহর নিঃসন্দেহে একজন শ্রেষ্ঠ কবি। যাঁরা একাধারে পণ্ডিত ও শিবভক্ত, তাঁদের মধ্যে তিনি অবশ্যই সর্বোত্তম। তিনি ভক্তিধর্মে প্রাণ উৎসর্গ করেছিলেন। এবং তাঁর রচনার মধ্যে নিজস্ব শক্তিকে নিঃশেষে ঢেলে দিয়ে-ছিলেন। সেই সমস্ত রচনায় ভাবাবেগের তীব্রতা ও প্রতিভার পরিণতি অত্যন্তভাবে প্রতিফলিত। হরিহর সর্বসম্মতিক্রমে একজন বিশিষ্ট কবি।

রাঘবাঙ্ক

হরিহরের ভাগিনেয় এবং প্রিয় শিষ্য ছিলেন রাঘবাঙ্ক। গুরুর পদপ্রান্তে শিক্ষা লাভ করে তিনি পণ্ডিত ও ভক্তরূপে প্রতিষ্ঠিত। যথার্থ শিষ্যের মতো তিনি গুরু প্রদর্শিত পথে নিজস্ব ভঙ্গীতে চলেছেন। যখন তিনি বলেন যে, যে রচনা দিয়ে হাম্পীশ্বর শিবের স্তুতিবন্দনা করেছেন সেই রচনা দিয়ে অন্য দেবতা ও মানুষের প্রশংসা করলে তিনি আর নিজেকে শিব-উপাসক বলতে পারেন না, তখন তাঁর গুরু হরিহরের উক্তিরই প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। এইভাবে পরম লক্ষ্য, বিষয়-বস্তুর প্রকৃতি ও কাব্য-ভাষা সম্পর্কে হরিহরের প্রেরণা থাকলেও তিনি কাব্যের রূপ, গল্পের গঠন এবং বর্ণনভঙ্গীতে মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন। হরিহর অন্তত একখানি চম্পূকাব্য লিখেছেন, রাঘবাঙ্কের নামে কোনো চম্পূ নেই। হরিহর প্রায় সমস্ত রচনাই রগলে-রূপে

লিখেছেন, রাঘবাঙ্ক তাঁর সমস্ত রচনা লিখেছেন ষট্‌পদীরূপে। হরিহরের রচনায় আমরা শব্দ প্রয়োগের ক্রমবর্ধমান বাহুল্য লক্ষ্য করি, রাঘবাঙ্কের রচনায় পাই উত্তরোত্তর সংযমের পরিচয়। হরিহরের শ্রেষ্ঠ রচনায় নিম্নাভিমুখী দ্রুতগামিনী স্রোতস্বিনীর গতি ও সহনীয়তা, রাঘবাঙ্কের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিতে কানায় কানায় ভরা সমতল বাহিনী নদীর নিয়মিত প্রবাহ। রাঘবাঙ্কের যে চারখানি বই পাওয়া যায়, সেগুলি হল : 'সোমনাথ চরিতে', 'বীরেশ চরিতে', 'সিদ্ধরাম চরিত্র' এবং 'হরিশ্চন্দ্র কাব্য'। কাব্যগুলি রচনার ক্রমও ঐরকম। সৌরাষ্ট্রের আডপ্যু উত্তর কর্ণাটকে য়লিগেরে (বর্তমান নাম লক্ষেশ্বর)-তে এসে সেখানে সোমনাথের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে অলৌকিক ক্রিয়াকলাপের দ্বারা জৈনগণকে শৈবধর্মে দীক্ষিত করেন। 'সোমনাথ চরিতে' বইটি এই কাহিনী নিয়ে লেখা। লেখক নিশ্চয়ই হরিহরের 'আডয়্যা রগলে'-র কাছে ঋণী, তবে রাঘবাঙ্কের বইটিতে এমন কিছু মৌলিক দৃশ্য আছে যা গল্পটিকে উজ্জ্বল করে তুলেছে। গল্পের যে অংশে আডয়্যা-র চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব চিত্রিত, সেই অংশটি যথার্থই শক্তিপ্রকাশক। তবে কাহিনীর কাঠামো অসংলগ্ন, চরিত্র সৃষ্টি ত্রুটিপূর্ণ, বর্ণনা গতানুগতিক এবং রচনারীতি সর্বত্র সমান নয়। একটি কারণ মুহূর্তে আডয়্যা ও সন্ন্যাসীর মধ্যে সংলাপ রাঘবাঙ্কের নাট্যকৌশলের সুন্দর দৃষ্টান্ত, পরে এই নাট্যগুণের বিকাশ হয়েছিল। মোটের উপর বলা যায়, 'সোমনাথ চরিতে' একটি ত্রুটিপূর্ণ গ্রন্থ যদিও মাঝে মাঝে কবি প্রতিভার নিদর্শন পাওয়া যায়।

'বীরেশ চরিতে' একখানি ক্ষুদ্র কাব্য। বিষয়বস্তু শিবের ক্রোধজাত বীরভদ্র কর্তৃক দক্ষযজ্ঞ বিনাশের সুপরিচিত কাহিনী। এটিও হরিহরের অনুরূপ একটি রচনার দ্বারা প্রভাবিত হলেও একে ঠিক প্রতিরূপ বলা চলে না। কবি গল্পাংশে বিশেষ যে পরিবর্তন ঘটিয়েছেন তা সম্পূর্ণ যথোচিত—দক্ষের অত্যধিক ক্রোধের কারণ শিবের অবহেলা নয়, ইচ্ছাকৃত অপমান-রৌদ্ররসের এবং অঙ্গসঞ্চালনের তৎপরতা বর্ণনায় বেগমাত্রা ক্রমশই ঊর্ধ্বমুখী। এই বিষয়ের জন্য উদ্দণ্ড ষট্‌পদীর নির্বাচন উপযুক্ত হয়েছে এবং এই অংশের রচনা-রীতিও দ্রুতি সম্পন্ন। বীরেশ বা বীরভদ্রের ভাবমূর্তিও বেশ সহনীয়। কবিতার মধ্যে যত্রতত্র নানা ভাব ও পদগুচ্ছের এমন সমাবেশ যেন সেগুলি ঝড়ের গতিতে অগ্নি স্ফুলিঙ্গের মতোই ঊর্ধ্বগামী। কিন্তু কবিতাটিতে যে পরিমাণ জাঁকজমক, সে পরিমাণ নির্লিপ্ততা ও বিচার বুদ্ধির প্রয়োগ নেই।

রাঘবাঙ্কের তৃতীয় গ্রন্থ দীর্ঘতর—নয়টি সর্গ বিশিষ্ট কাব্য। দ্বাদশ শতাব্দীর সুপ্রসিদ্ধ যোগী ও বচনকার সোন্নলিগে-র সিদ্ধরামের জীবন চরিত অবলম্বনে লিখিত এই কাব্যে সিদ্ধরামকে ঠিক মানুষ হিসাবে দেখা হয়নি। 'কারণরুদ্র' ও 'জ্ঞানী' রূপে উচ্চ প্রশংসা করা হয়েছে। তাঁর জন্ম ও শৈশব, তাঁর শক্তি ও কর্ম—সব কিছুই অসাধারণ বলে বর্ণিত। বলা হয়েছে, সিদ্ধরাম ছিলেন অলৌকিক ক্রিয়াকর্মের অধিকারী। তিনি পুকুর ও উদ্যান তৈরী করে বেড়াতেন এবং পাপীকে পাপপঙ্ক থেকে উদ্ধার করতেন। সিদ্ধরাম জন্ম থেকেই সিদ্ধ, সিদ্ধিলাভের জন্য তাঁকে কোনো চেষ্টা বা সংগ্রাম করতে হয় নি বলে এক্ষেত্রে চরিত্র বিকাশের কোনো সুযোগ নেই। প্রথম কয়েকটি 'সন্ধি'তে (প্রকরণে) এবং পরে আরও কিছু অংশে হৃদয়স্পর্শী দৃশ্য আছে। যেমন, কবি দুটি করুণ ঘটনাকে পাশাপাশি রেখে রসসৃষ্টিতে সফল হয়েছেন—যখন সিদ্ধরাম হঠাৎ হারিয়ে গেল তখন তার মায়ের বিচ্ছেদ বেদনা এবং পরে মাতৃসমা প্রভু মল্লিনাথকে পেয়ে ও হারিয়ে সিদ্ধরামের করুণ ক্রন্দন। কাব্যের অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে বিল্লেশ বোম্ময়্যা আমাদের সহানুভূতি আকর্ষণ করে, কারণ পাপিষ্ঠ অনুতপ্ত হলে সিদ্ধরাম তাকে নরককুণ্ড থেকে উদ্ধার করেন। বিল্লেশ বোম্ময়্যা দারিদ্র্য ও ঋণের দায়ে চুরিচামারি করে, সোন্নলিগে-তে উপস্থিত হয়ে সিদ্ধরামের ভণ্ড শিষ্যরূপে দিন কাটাতে থাকে। বাক্যে মার্জিত এবং পোশাক পরিচ্ছদে পরিচ্ছন্ন বিল্লেশ লোকের মধ্যে দিব্যি ঘুরে বেড়াত, নরম ঘাসে ঢাকা মাটির কলসীর ঢাকনার মতো নিজের শত শত পাতা লুকিয়ে বেড়াত। যাদের ধনরত্ন চুরি হয়েছে, তারা তাকে শহরের মধ্যভাগে দেখতে পেয়ে ধরে ফেলে। কিন্তু চৌর অপহৃত সম্পত্তির জন্য কোনো চাপ বা দাবির কাছে নতি স্বীকার না করে তরবারি দিয়ে আত্মহত্যা করে। নরকে গিয়ে সে তার গুরু সিদ্ধরামের নাম জপ করতে থাকে। গুরু তাকে নরক থেকে উদ্ধার করে এনে সংজীবনে ফিরিয়ে আনেন। এই কাব্যই সাক্ষ্য দেয় যে রাঘবাঙ্ক ক্রমশই তাঁর আখ্যান রচনার কৌশল আয়ত্তে আনছেন।

রাঘবাঙ্কের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি হল তাঁর 'হরিশ্চন্দ্র কাব্য'। এই কাব্যগ্রন্থে এমন পরিচয় আছে যে কবির প্রতিভা যেমন বিকশিত হয়েছে তেমনি একজন সত্যি-কার কবির ধর্ম-অনুযায়ী সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতও পরিত্যক্ত। কবি নিজেই যে বলেছেন যে তাঁর অন্য কোনো গ্রন্থ 'হরিশ্চন্দ্র কাব্য'-এর সমকক্ষ নয়, তাঁর

এই প্রত্যয়শীল স্বীকারোক্তি সত্য বলেই মনে হয়। হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী পর্ব-ভবানির মতোই পুরাতন। বেদে, পুরাণে ও কাব্যে বিভিন্ন আকারে পাওয়া যায়। রাঘবাঙ্ক স্বীকার করেছেন যে তিনি অতীতকালের রচনাবলী থেকে এই কাহিনীর বীজ সংগ্রহ করে নিজের চেষ্টা ও যত্নে তাকে 'বৃহৎ কাব্যতরু'-তে রূপ দিয়েছেন। বহু যুগের পুরানো বিষয়কে নতুন রূপে উপস্থাপন করাই তাঁর মৌলিক কৃতিত্ব। খুবই গর্বের সঙ্গে বলা যায় যে যখন আমরা বইটিকে তার পুরানো উৎসগুলির সঙ্গে তুলনা করি, তখন সহজেই বোঝা যায় যে ব্যাপারটা শুধু কন্নড ভাষাতেই নতুন নয়, এর গল্পের কাঠামো অন্য যে কোনো ভারতীয় সাহিত্যে লক্ষণীয়ভাবে নতুন। সত্য বটে, হরিশ্চন্দ্র সত্যরক্ষার জন্য সিংহাসন ত্যাগ করে নানারূপ দুঃখকষ্ট ভোগ করেছেন, কিন্তু তিনি আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পারতেন কি যদি না তাঁর সত্যনিষ্ঠার জন্য কঠোর যন্ত্রণা সহ্য করার গল্পটি প্রত্যয় উৎপাদক কৌশলের সঙ্গে বলা হত ?

কোনো একটি বিশেষ উৎস-কথাকে আঁকড়ে না থেকে যথার্থ শিল্পকৌশলের সঙ্গে হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী বর্ণনার জন্য প্রয়োজন ছিল মৌলিকদৃষ্টিসম্পন্ন একজন কবির। কন্নড ভাষার সৌভাগ্য যে রাঘবাঙ্ক একজন সেই শ্রেণীর কবি। বিশ্বামিত্র কেন নাছোড়বান্দা হয়ে হরিশ্চন্দ্রের নির্যাতন করলেন ? হরিশ্চন্দ্রই বা কেন তাঁর যথাসর্বস্ব, এমনকি নিজেকে, স্ত্রীকে ও পুত্রকে বিক্রি করতে বাধ্য হলেন ? এই সমস্ত ও অন্যান্য প্রশ্নের বিশ্বাসযোগ্য উত্তর পাওয়া দরকার। পুরানো ঘটনার নতুন উপস্থাপনার দ্বারা অথবা নতুন ঘটনার উদ্ভাবনের সাহায্যে রাঘবাঙ্ক এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করেছেন। এইভাবেই তাঁর আখ্যান-কৌশলের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শিত। প্রথমোক্ত কৌশলের উৎকৃষ্ট উদাহরণ বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রের পুরাতন কলহের উত্থাপন এবং দ্বিতীয় কৌশলের উদাহরণ বিশ্বামিত্রের ক্রোধ থেকে উৎপন্ন তিন রমণী। প্রথম কাহিনীতে ইন্দ্র একদিন রাজসভায় মুনি বশিষ্ঠকে জিজ্ঞাসা করেন যে, পৃথিবীতে এমন কোনো রাজা আছেন কিনা যিনি একবারও সত্য পথ থেকে ভ্রষ্ট হননি। বশিষ্ঠ ইতিবাচক উত্তর দিয়ে হরিশ্চন্দ্রের নাম উল্লেখ করেন। ইন্দ্র বিশ্বামিত্রকে এই প্রশ্ন না করায় তিনি ক্রুদ্ধ হন (বিশ্বামিত্রকে প্রশ্ন করা হলে তিনিও হয়তো হরিশ্চন্দ্রের নামই বলতেন)। ক্রোধের আরও কারণ আছে : বিশ্বা-মিত্রের প্রতিজ্ঞা ছিল বশিষ্ঠের যে কোনো কথারই তিনি প্রতিবাদ করবেন এবং

তাছাড়া বিশ্বামিত্রের প্রকৃতিই ছিল জীবনের ভালো দিকের পরিবর্তে মন্দ দিক দেখা। সুতরাং বশিষ্ঠের উত্তর শোনার সঙ্গে সঙ্গে ক্রোধোদীপ্ত বিশ্বামিত্র উঠে দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে চিৎকার করে বললেন, 'এই সব বাজে কথা বন্ধ করো।' এখানেই আমরা গল্পের বীজটি ঠিকভাবে বসানো হয়েছে দেখতে পাই। এ ছাড়া বিশ্বামিত্রের ক্রোধের অন্য কোনো স্বাভাবিক সঙ্গত কারণ থাকতে পারে না। একবার যদি আমরা দুই মুনির সংঘর্ষের কারণটা মেনে নিই, তাহলে তাঁদের কলহ ও শপথ অনিবার্য হয়ে ওঠে। বিশ্বামিত্র প্রতিজ্ঞা করেন যে তিনি হরিশ্চন্দ্রকে অসত্যপরায়ণ দেখিয়ে তাঁর শত্রুর (বশিষ্ঠের) দাবীকে মিথ্যা প্রমাণিত করবেন। তিনি বজ্রের মতো সগর্জন চিৎকার করতে করতে ইন্দ্রের সভা থেকে সবেগে বেরিয়ে গেলেন। কী সার্থক ও ফলপ্রসূ গল্পের এই উপসংহার! রাঘবাঙ্ক ঠিকই বলেছেন যে, দুই বন্য মহিষের লড়াইয়ের ফলে যেমন একটা গাছ ভূপতিত হয়, তেমনি বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের কলহ ও সংঘাতের শিকার হলেন রাজা হরিশ্চন্দ্র।

হরিশ্চন্দ্রের সত্যনিষ্ঠা পরীক্ষা করবার জন্য বিশ্বামিত্র একটার পর একটা কৌশল প্রয়োগ করেন। একটা কৌশল হল বন্য পশু ও পাখি সৃষ্টি করা, যে সমস্ত পশুপক্ষী হরিশ্চন্দ্রের প্রজাদের শস্য বিনাশ করে। শিকারে বহির্গত হয়ে হরিশ্চন্দ্র তার প্রজাদের দুর্ভোগের করুণ বিবরণ শোনেন। বিশ্বামিত্রের সৃষ্ট একটা মায়া বরাহের অন্বেষণে হরিশ্চন্দ্র অজানিতভাবে বিশ্বামিত্রের আশ্রমে প্রবেশ করে বিশ্রাম নিতে থাকেন। বিশ্বামিত্রের উল্লাসের সীমা নেই, কারণ রাজা এইবার জালে ধরা পড়েছেন এবং মুনি তাঁর সর্বনাশ করে ছাড়বেন। মুনির এক চিৎকারে শূন্য থেকে দুই রমণীর আবির্ভাব। আসলে তারা মুনির ক্রোধ, ঘৃণা এবং অহেতুক শত্রুতা থেকে উৎপন্ন। কৃষ্ণবর্ণ ও নিম্নকুলোদ্ভব রমণীরা তাদের নির্মাতার নীচ মানসিকতার প্রতীকরূপে আবির্ভূত হয়ে বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করে—'কী আদেশ প্রভু?' বিশ্বামিত্রের উত্তর, 'তোমরা সমস্ত ছলাকলা দিয়ে রাজাকে প্রলুব্ধ করো।' প্রলোভনের কলাকৌশল সমন্বিতা এই রমণীদের সৃষ্টি রাঘবাঙ্কের উদ্‌ভাবন। পরবর্তী ঘটনা ও সংলাপ থেকে স্পষ্ট যে এই উদ্‌ভাবন বহুল পরিমাণে কাব্যসৌন্দর্য বৃদ্ধির সহায়ক হয়েছে। রাঘবাঙ্কের মৌলিক প্রতিভার সৃষ্টি এই নীচকুলোদ্ভব রমণীরা কন্নড কাব্যজগতে চিরকালের জন্য মূর্তিমতী প্রলোভন শক্তি হয়ে

বিরাজ করবে। রাজার ক্লান্তি অপনোদনের জন্য তারা মধুর সুরে গান গাইল। গান শুনে মুগ্ধ প্রীত রাজা তাঁর সমস্ত ধনরত্ন রমণীদের দান করলেন। তারা কিন্তু তা চায়নি, চেয়েছিল শুধু মুক্তাখচিত ছত্র। রাজশক্তির প্রতীক বলে রাজা সেই ছত্রদানে অস্বীকৃত হন। রমণীদের নতুন প্রস্তাব—'বেশ, তাহলে আপনি আমাদের স্ত্রীরূপে গ্রহণ করুন।' রাজার নেতিবাচক উত্তর, 'একজন রাজা কী করে নীচজাতীয় রমণীদের বিবাহ করবে?' রাজা ও রমণীদের সংলাপে জাতিভেদের বহু পুরাতন প্রশ্নের উভয় দিকই নানা উপমা ও দৃষ্টান্তের সাহায্যে উদ্‌ঘাটিত। নীচে কিছু নমুনা দেওয়া হল।

হরিশ্চন্দ্র: সর্ববিষয়ে সূর্যবংশের সমতুল্য এমন কোনো রাজার সন্ধান পাই নি যে আমাদের কাছে কন্যা বিবাহ দিতে পারে। আর কী আশ্চর্য! নীচজাতীয়া কন্যারা আমাকে বিবাহ করতে চায়! এ কি কালের কুটিল গতি, না এই দেশের মাটির প্রকৃতি?

রমণীরা: যে স্তন থেকে বিশুদ্ধ দুধ নিঃসৃত হয়, তার মাংস কত ভাল। মধুর মধুদায়ী মৌমাছি কত ভাল। সুগন্ধি কস্তূরী ধারী বন্যপশুর নাভি কত ভাল। সেগুলি দেবতাকে উৎসর্গ করা হয় না? যদি উৎকৃষ্ট গুণ থাকে তাতে সমস্ত দোষ ঢাকা পড়ে যায় নাকি? আমাদের যৌবন সৌন্দর্য থাকতেও আপনি কেন আমাদের নিচু বংশের জন্মের কথা বলছেন?

হরিশ্চন্দ্র: পঙ্কিল নয় বলেই কি স্নানাগারের জলে স্নান করতে হবে? কুকুরে যে দুধ দেয় সে দুধ কে ভোজন করবে? শ্মশানে যে ফুল জন্মায় কে তা মাথায় পরবে? তোমরা বেশ অদ্ভুত বালিকা তো! তোমাদের যৌবন সৌন্দর্য ও চাতুর্যের মূল্য কী? হে ঈশ্বর! তোমাদের সাহচর্য কে চায়? ভাবলেই গা ঘিনঘিন করে।

রমণীরা অত সহজে পরাভব স্বীকার করে না। তারা তাদের যুক্তি-তর্ক চালাতেই থাকে।

রমণীরা: আপনার যে কান আমাদের গান শোনে, যে রসনা আমাদের সঙ্গে কথা বলে, যে চোখ আমাদের সৌন্দর্য দেখে এবং যে নাক আমাদের ঘ্রাণ পায়, তাতে তো কিছু অপবিত্রতা নেই। কেবল কি স্পর্শেই যত অপবিত্রতা? এ কি কখনো হতে পারে যে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে চারটি উৎকৃষ্ট, একটি নিকৃষ্ট?

এই চতুর যুক্তির বিরুদ্ধে হরিশ্চন্দ্রের উত্তর প্রস্তুত।

হরিশ্চন্দ্র: চোখের উপলব্ধি দর্শনে, নাকের উপলব্ধি ঘ্রাণে, কর্ণের উপলব্ধি শ্রবণে। এ সমস্তই দূর থেকে জন্মে, অঙ্গ স্পর্শের প্রয়োজন হয় না। কী কুৎসিত কথা! কী অযৌক্তিক উপমা! জলন্ত কয়লা স্পর্শ করলে দগ্ধ করে, কিন্তু দূর থেকে দেখলে, শুনলে বা গন্ধ নিলে তা করে না। দূর হও তোমরা! অনেক অশ্লীল কথা বলেছ!

হরিশ্চন্দ্রের এমন যুক্তিতেও রমণীরা হার মানল না।

রমণীরা: আমরা আপনার কাছে এই আশা নিয়ে এসেছি যে আপনি উচ্চকুলজাত, আপনার সংসর্গে আমাদের কিছু জন্ম শুদ্ধ পবিত্র হয়ে যাবে।

হরিশ্চন্দ্র: কী বললে? তোমাদের জন্য আমার জাতি খোয়াব কি?

রমণীরা: হে রাজন্, পাপীদের পাপ ধুয়ে নেয় বলে গঙ্গার জল কি কখন দূষিত হয়?

হরিশ্চন্দ্র: জাত সম্পর্কে ও কথা চলে না! এক পাত্র দুধ নষ্ট করতে এক ফোঁটা টক-ই যথেষ্ট।

এই শেষ কথা বলে রাজা তাদের উত্তম-মধ্যম দিয়ে তাড়িয়ে দিলেন। কথাটা বিশ্বামিত্রের কানে যেতেই তিনি দৌড়ে এসে বিশ্বামিত্রকে গালিগালাজ করে পুনরায় বিবাহের প্রস্তাব করেন। কথাপ্রসঙ্গে হরিশ্চন্দ্র বিশ্বামিত্রের নাছোড়বান্দা ভাবে বিরক্তিবোধ করে বলে উঠলেন, 'আমি আপনাকে আমার সমস্ত রাজ্য দিতে পারি, কিন্তু এই রমণীদের বিবাহ করতে পারি না।' বিশ্বামিত্র ঠিক এই কথাটিই শুনতে চেয়েছিলেন। তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন, 'বেশ কথা। হয় বিবাহ করো, নয়তো সিংহাসন ছাড়ো।' হরিশ্চন্দ্র স্থির করলেন তিনি রাজ্য পরিত্যাগ করবেন, কিন্তু কুলের বিশুদ্ধতা ত্যাগ করবেন না। তৎক্ষণাৎ বিশ্বামিত্র রাজার কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি আদায় করে তাঁর বদান্যতার প্রশংসা করতে লাগলেন।

উল্লিখিত কাহিনীটি পরীক্ষা করলে দেখা যায় হরিশ্চন্দ্রের পক্ষে রাজ্য সমর্পণ কীভাবে অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। গল্পের পরবর্তী অংশে রাঘবাঙ্ক সংযম ও মর্যাদাবোধের সঙ্গে পর পর বর্ণনা করেছেন—সিংহাসন ত্যাগের মর্মস্পর্শী দৃশ্য, তজ্জনিত দুঃখকষ্টভোগ এবং সাহসের সঙ্গে হরিশ্চন্দ্র ও চন্দ্রমতীর অগ্নিপরীক্ষায় উত্তরণ।

কাব্যটিতে রাঘবাঙ্কের আশ্চর্য নাট্য-প্রতিভার প্রকাশ হয়েছে। বইটি প্রকৃতপক্ষে একখানি শক্তিশালী নাটক। রন্নর পরে রাঘবাঙ্কই একমাত্র লেখক যিনি কন্নড ভাষায় অসাধারণ নাট্যগুণ সমৃদ্ধ একখানি কাব্য রচনা করেছেন। কাহিনীগঠন, চরিত্রসৃষ্টি, ভাব ও সংলাপ যেদিক থেকেই দেখা যাক, 'হরিশ্চন্দ্র কাব্য' উন্নত ধরনের রচনা। তা বলে একেবারে দোষমুক্তও নয়। যেমন, গল্প শেষে বিশ্বামিত্রের হৃদয় পরিবর্তন অত্যন্ত আকস্মিক বলে মনে হয়। বিশেষ করে রাজার প্রতি তাঁর নিষ্ঠুর নির্যাতনের কথা মনে রাখলে। আর যদি বিশ্বামিত্রের সমস্ত ক্রোধ কৃত্রিম বলেই মনে করে নিতে হয়, তাহলে প্রথম থেকেই তাঁর সমস্ত কার্যকলাপ লোক দেখানো হয়ে পড়ে। হরিশ্চন্দ্রের চরিত্রেও এমন সব অদ্ভুত ঝোঁক দেখা যায় যা ঠিক তাঁর অবিচল সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে মিলে যেতে পারে। এতৎসত্ত্বেও 'হরিশ্চন্দ্র কাব্য' ধর্মনিরপেক্ষ রচনা হিসাবে অবশ্যই মহৎ। এই গ্রন্থে লেখক তাঁর ধর্মীয় উদ্দীপনাকে অতিক্রম করে প্রতীকী বর্ণনার সাহায্যে বলে গেছেন ভারতীয় সংস্কৃতির সেই মহৎ বাণী—'ভগবান সত্য এবং সত্যই ভগবান'। বর্তমান শতকের মহাত্মা এই যে বাণী ভারতবর্ষ তথা বিশ্ব-জগৎকে শোনালেন, কবি রাঘবাঙ্ক সাতশ বছর আগে সেই কথা বলে গেছেন। এ সত্য কেবল কথার সত্য নয়, এ ঐশ্বরিক বিধান, জীবনের মূলনীতি। যিনি এই নীতির অনুগামী তাঁকে কঠোর পরীক্ষার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হয়। পরিশেষে তিনি ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভ করেন।

উপসংহারে বলা যায় যে রাঘবাঙ্ক 'হরিশ্চন্দ্র কাব্য'-এ নাটকীয় বর্ণনাশক্তির পূর্ণ পরিচয় দিয়েছেন—যে শক্তি তাঁর প্রথম দিককার কাব্যগুলিতে অংশত ব্যক্ত হয়ে ধীরে ধীরে পরিণতি লাভ করে।

নেমি, জন্ন এবং রুদ্র

নেমিচন্দ্র

দ্বাদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত চিরায়ত কাব্য রচনার ধারা প্রচলিত ছিল এবং বেশির ভাগ কবি ছিলেন জৈনমতাবলম্বী। অতঃপর একটি সামাজিক ও ধর্মীয় বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যিক বিপ্লবও দেখা দেয়। পুরোদমে বচন সাহিত্য রচনা চলতে থাকে। রগলে, ষট্‌পদী, ত্রিপদী প্রভৃতি দেশীয় ছন্দে

গ্রন্থ রচিত হয়। দ্বাদশ, ত্রয়োদশ, চতুর্দশ—এই তিন শতাব্দী যাবৎ বীরশৈব চিন্তাধারার প্রভাব বেড়ে যেতে থাকে। তথাপি চিরায়ত সাহিত্যের ধারা অবরুদ্ধ হয়ে যায়নি। এই যুগে উভয় ধারা—চিরায়ত এবং বৈপ্লবিক স্রোত—পাশাপাশি চলতে থাকে। বিশেষভাবে লক্ষণীয়, প্রাচীন ধারার অনুবর্তক নেমিচন্দ্র ও রুদ্রভট্ট নব্যপন্থার ধারক হরিহর ও রাঘবাঙ্কের সমকালীন কবি। প্রথমোক্ত কবিদ্বয় পণ্ডিতও ছিলেন বটে এবং হোয়সল রাজবংশের রাজা বীর-বল্লালের দুই মহামন্ত্রীর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। নেমিচন্দ্র দুখানি চম্পূ কাব্য রচনা করেন—'লীলাবতী' ও 'নেমিনাথপুরাণ'। সংস্কৃত লেখক সুবন্ধুর বাসবদত্তার প্রেরণায় রচিত 'লীলাবতী' একখানি প্রেমকাব্য। গল্পাংশ ক্ষীণ হলেও কবি গতানুগতিক কাব্যে প্রচলিত সর্ববিধ বর্ণনা দিয়ে কাব্যকে ভারাক্রান্ত করেছেন। নেমিচন্দ্রের মতে শৃঙ্গারই একমাত্র বর্ণনীয় বিষয়। 'লীলাবতী' কাব্যের প্রধান বস্তু শৃঙ্গার রস। কিন্তু বইটির সৌন্দর্য নষ্ট করে দিয়েছে দীর্ঘ বর্ণনার আতিশয্য। তাঁর দ্বিতীয় বই 'নেমিনাথপুরাণ' জৈন ধারায় লিখিত জীবন চরিত। বইটির অংশবিশেষ কৃষ্ণকথা বর্ণনায় বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে। বিশিষ্ট দুটি কারণে—সূক্ষ্ম চরিত্র সৃষ্টি এবং সমৃদ্ধ কাব্য কল্পনা গুণে। বইটি কবি সম্পূর্ণ করে যেতে পারেন নি বলে পাঠক সাধারণ একে 'অর্ধনেমি'ও বলে থাকে। অসম্পূর্ণ এই গ্রন্থটি মহৎ শিল্প সৃষ্টি না হলেও শক্তি-শালী রচনা সন্দেহ নেই।

রুদ্রভট্ট

বৈদিক অনুশাসনে বর্ধিত কবি রুদ্রভক্ত ছিলেন ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ভুক্ত। চম্পূ আকারে তাঁর 'জগন্নাথ বিজয়' সংস্কৃত বিষ্ণুপুরাণ অবলম্বনে রচিত ধ্রুপদী কাব্য। ইতিপূর্বে ব্রাহ্মণ কবিরা কন্নড ভাষায় ধর্মনিরপেক্ষ লৌকিক ও বিজ্ঞান শাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন। রুদ্রভট্টই প্রথম ব্রাহ্মণ কবি যিনি বিষ্ণু পুরাণে বর্ণিত কৃষ্ণ কাহিনী নিয়ে চম্পূ রীতিতে প্রথম ধর্মীয় ভক্তিকাব্য রচনা করলেন। কেবল কৃষ্ণকথার পুনর্বর্ণনা তাঁর উল্লেখ্য ছিল না। তাঁর স্বীকারোক্তি অনুযায়ী তিনি এমনভাবে লিখতে চেয়েছিলেন যে তিনি যখন 'কাব্য সমাধি'তে কৃষ্ণ দর্শন করবেন তখন যেন জীবনের পরম সত্যের সন্ধান পান। এসবে দেখতে পাই, ভক্তি ও ধ্যানের বলে তাঁর জ্ঞান লাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা। রামলীলা

প্রভৃতি কয়েকটি দৃশ্য বর্ণনায় কবি তাঁর উচ্চ আদর্শ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলে মনে হয়। কিন্তু তাঁর মনোযোগ সর্বত্র সমান ছিল না, মাঝে মাঝে গতানুগতিক বর্ণনায় এবং একপ্রকার অকপট মন-খোলা আড়ম্বরে তা বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। তাই 'জগন্নাথ বিজয়ে'র উৎকৃষ্ট গ্রন্থ হওয়ার যে সম্ভাবনা ছিল তা পূর্ণ হয় নি। বইটির অন্যতম প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য উদার দৃষ্টিভঙ্গি। উপনিষদিক চিন্তাধারা এবং নামরূপ নির্বিশেষে ঈশ্বরের অদ্বিতীয় সত্তায় বিশ্বাস— এই দুই দিকে কবির বিশেষ প্রবণতা ছিল। প্রকৃত 'ভগবত' বলেই তিনি হরি এবং হরের মধ্যে কোনো ভেদ মানতেন না।

দ্বাদশ থেকে পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত মাঝারি ধরনের কবিরা কোনোমতে ধারা বজায় রেখেছিলেন। দুই একজন ব্যতিক্রম যে ছিলেন না তা নয়। এক দিকে চম্পূ আকারে জৈনপুরাণ, অন্যদিকে ষট্‌পদী ছন্দে বীরশৈব সাধকদের জীবনী—এই ছিল চিরাচরিত ধারার মধ্যে কিছু বৈচিত্র্য। ব্রাহ্মণ কবিদের মধ্যে চৌণ্ডরস দণ্ডীর সংস্কৃত গ্রন্থ 'দশকুমারচরিত'কে কন্নড ভাষায় রূপান্তরিত করেন। বিস্ময়ের কথা, এই লৌকিক গ্রন্থের মধ্য দিয়ে তিনি ভক্তিভাব প্রকাশ করতে পেরেছেন। কবির কৌশলে নানাদিকে বহির্গত দশকুমারের একজন কুমার সুপ্রসিদ্ধ তীর্থ পঁঢরপুরে গিয়ে ভগবান বিঠ্‌ঠলকে প্রণাম জানালেন।

জন্ন

জন্ন ছিলেন ত্রয়োদশ শতাব্দীর এক বিশিষ্ট কবি। পূর্ববর্তী পম্পর মতো জন্নও বহুমুখী ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। একাধারে যোদ্ধা, মন্ত্রী ও খ্যাতিমান কবি। তাঁর পৃষ্ঠপোষক রাজা তাঁকে 'কবিচক্রবর্তী' উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন। জন্ন দুখানি বইয়ের রচয়িতা—'যশোধর চরিতে' এবং 'অনন্তনাথ পুরাণ'। প্রথম বইখানি আকারে ছোট হলেও উৎকর্ষে বড়। জৈনপুরাণে অহিংসা ও করুণাপ্রচারের বাহনরূপে যশোধরের গল্পটি সুপ্রসিদ্ধ। জন্ন এই গল্পটিকে গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও সূক্ষ্ম কল্পনা বলে বর্ণনা করেছেন। গল্পটি সংক্ষেপে এইরূপ: রাজা যশোধরের স্ত্রী অমৃতমতী একদিন গভীর রাতে স্বামী সাহচর্যে থাকাকালে হস্তিপালকের গান শুনে মুগ্ধ হয়। লোকটা অত্যন্ত কুৎসিত দর্শন জেনেও রাণী তার জন্য পাগল হয়ে গেল।

মানুষের বিকৃত কামনা এবং নিয়তির অদ্ভুত খেয়াল সম্পর্কে অভ্রান্ত দৃষ্টি নিয়ে জন্ন এই কাহিনী বর্ণনা করেছেন। কবির উচ্চ নান্দনিক মানসিকতা এবং সূক্ষ্ম ঔচিত্যবোধ না থাকলে কাব্যটি সাধারণ প্রচারধর্মী পদার্থে পরিণত হত। উৎকর্ষ প্রদর্শনের জন্য এখানে দু-একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

রাজদম্পতি যশোধর ও অমৃতমতী আদর্শ সৌন্দর্যের অধিকারী এবং পরস্পরের ভালোবাসায় তন্ময় ছিলেন। একদিন রাতে যখন তাঁরা সুখনিদ্রায় অভিভূত, তখন হঠাৎ রাজবাড়ির হস্তিপালক নিজের চিত্তবিনোদনের জন্য গান গাইতে শুরু করে। লোকটা কুৎসিত হলেও কণ্ঠ বড় মধুর ছিল। সেই কণ্ঠস্বর শুনে অমৃতমতীর ঘুম ভাঙে এবং তার কামভাব জাগ্রত হয়। গান শোনামাত্র রানী লোকটির খোঁজখবর না নিয়েই নিজের হৃদয়কে সেই গায়কের উদ্দেশে মনে মনে সমর্পণ করে। পরদিন প্রাতে রানী তার সখীকে পাঠিয়ে দেয় গায়কের খোঁজ নিতে। সখী খোঁজ নিয়ে ফিরে এসে শ্লেষাত্মক ভঙ্গিতে বলে, 'হে কোমলাঙ্গী, তুমি কী করে এই মদন-সদৃশ লোকটির উপর তোমার সমস্ত ভালোবাসা অর্পণ করলে? এই পৃথিবীতে সে অনুপম।' সতীর শ্লেষ বিদ্রূপ বুঝতে না পেরে অমৃতমতী আনন্দে প্রায় লাফিয়ে ওঠে। বলে, 'বলো বলো, আরও বলো। আমার প্রেমিক এতই সুন্দর? দেরী করছ কেন? আমি যে তার কথা শোনার জন্য মরে যাচ্ছি।' তখন বাধ্য হয়ে সখীকে বলতেই হল যে লোকটা সবদিক থেকেই কী নিদারুণ কুৎসিত। কিন্তু অমৃতমতী এসব কথায় নিরুৎসাহ না হয়ে আবেগ স্পন্দিত কণ্ঠে বলে উঠল, 'আরে মূর্খ, কালো বলে কি কেউ কস্তূরী প্রত্যাখ্যান করে? পাকানো বলে কি চন্দনকে অগ্রাহ্য করে? বাঁকা বলে কি রামধনু উপেক্ষিত হয়? যাকে আমরা ভালবাসি, তার কুৎসিত রূপই মনোহর। যখন আমরা ভালোবাসি, তখন কি বাহ্যরূপ নিয়ে মাথা ঘামাই? তিনিই আমার ইন্দ্র, চন্দ্র, মন্মথ, আমার সর্বস্ব।' কবি এখানে অমৃতমতীর বিকৃত ভালোবাসার তীব্রতা ও গভীরতা দেখিয়েছেন। প্রেমিকের বাহ্য রূপ সম্পর্কে প্রেমিকা হয়ত অন্ধ আকর্ষণেও অমনোযোগী হতে পারে, কিন্তু অমৃতমতী হঠাৎ সিদ্ধান্ত করে ফেলল যে প্রেমিকের পক্ষে কুৎসিত হওয়াই সর্বোত্তম।

কাক যেমন নিমফল খেয়ে আম্রফলে বিস্বাদ বোধ করে, রানী অমৃতমতীও তেমনি দিনে দিনে সেই কুৎসিত লোকটির প্রতি ভালোবাসার টানে তার

স্বামীকে অপছন্দ করতে থাকে। রানীর এই রহস্যময় ব্যবহারে রাজা তো বিহ্বল। একদিন রাতে আসল কারণটা জানার জন্য রাজা ঘুমের ভান করে শুয়ে থাকে। অমৃতমতী স্বামীর আলিঙ্গন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে প্রেমিকের কাছে যায়। তরবারি হস্তে রাজা নিঃশব্দে তার অনুসরণ করে। হস্তিপালক রানীর দেরী দেখে কুপিত হয়ে তার নিয়ে আসা পূজার দ্রব্যাদিতে পদাঘাত করে এবং চুল ধরে রানীকে নির্দয়ভাবে মারতে থাকে। রানী তার পায়ে পড়ে মিনতি জানায়, 'ওগো, তুমি রাগ করো না। ঐ হতভাগা রাজাটা আমার দেরী করিয়ে দিল। তোমার সব কিছু আমার কাছে সুন্দর—তোমার কণ্ঠ, তোমার রূপ। তুমি আমাকে ত্যাগ করলে আমি নিশ্চিত মরে যাব। তুমিই আমার স্বামী। আর সকল পুরুষ আমার ভাই।' রাজা যশোধর অন্তরাল থেকে রানীর এই কথা শুনে ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে তরবারি হস্তে ঝাঁপিয়ে পড়ে উভয়কে শেষ করে দিতে উদ্যত হতেই ধৈর্য তাকে নিবৃত্ত করে। রাজা মনে মনে বলে—'আমার এই তরবারি শত্রুভাবাপন্ন রাজাকে হত্যার জন্য, এই সামান্য কীটের জন্য নয়। সিংহ হাতিকেই বধ করে, শৃগালকে নয়। তাছাড়া একটি লোককে আঘাত বা প্রহার করে কি তার দুষ্ট বাসনা দূর করা যায়? নারী বিপথগামিনী হলে, নিছক ঘৃণা দিয়ে তাকে উপেক্ষা করেই জয়ী হতে হয়।' এই বলে রাজা নিজেকে সংযত করে তাঁর কক্ষে ফিরে যায়।

উল্লিখিত দুটি দৃশ্যের সামান্য পরিসরের মধ্য দিয়ে কবি জন্ন তাঁর শিল্প-কৌশলের সার বস্তুটি প্রদর্শন করেছেন। তিনি কেবল অবৈধ প্রেমের বিয়োগান্ত পরিণতিই বর্ণনা করেন নি, তিনি ঘোষণা করেছেন অহিংসা ও সংযমের জয়! কবি পম্পর অনুসরণ করে তিনি নৈতিক ও নান্দনিক মূল্যবোধের সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করেছেন। এই বিয়োগান্ত উপকথার মূল কথা হল একজন কুরূপ ব্যক্তির জন্য অমৃতমতীর অন্ধ প্রেম। প্রশ্ন করা যেতে পারে স্বামী যশোধরের প্রতি অমৃতমতীর প্রেম ও ভক্তি কি এতই দুর্বল ছিল যে সে একটা অনৈতিক আকর্ষণের শিকার হয়ে পড়ল। যদি আমরা কবির মনস্তাত্ত্বিক গতিপথটা বুঝতে পারি তাহলে উল্লিখিত প্রশ্নের উত্তর পাওয়া কঠিন হবে না, প্রেম বা যৌন আকাঙ্ক্ষা এমন এক অপ্রতিরোধ্য শক্তি যা বিস্ময়কর দ্রুত-গতিতে মনুষ্য হৃদয়কে আক্রমণ করে। সেই সঙ্গে দুর্ভাগ্যের যোগ থাকলে চরম সর্বনাশ ঘটে। ঘূর্ণিবাতাসে যেমন শুকনো পাতা অসহায়, অমৃতমতীও তেমনি

অবৈধ প্রেম ও মন্দভাগ্যের যমজ শক্তির কাছে অসহায় হয়ে পড়ল। অতঃপর তার অবৈধ আকাঙ্ক্ষাই হয়ে উঠল তার আচরণের সমর্থক যুক্তি। এই ব্যাখ্যার সূত্র মেলে কবি জন্নরই একটি অর্থপূর্ণ মন্তব্যে। জন্ন বলেছেন যে কামদেবের মায়া যদি অদৃষ্টের পরিহাসের সাহায্যপুষ্ট হয় তবে তা মানুষের জীবনকে ধ্বংস করে। 'যশোধরচরিতে' বইটি আকারে ক্ষুদ্র হলেও এর কয়েকটি বিশেষ অংশে সূক্ষ্ম চরিত্র সৃষ্টি এবং শব্দ ও কল্পনাশক্তির বলে মহৎ রচনা বলে উপভোগ্য।

জন্নর অন্য বই 'অনন্তনাথপুরাণ' জৈন উপাখ্যানের চতুর্দশ তীর্থঙ্করকে নিয়ে রচিত চম্পূকাব্য। জৈনমতবাদের বিশদ ব্যাখ্যা ও সুদীর্ঘ বর্ণনার জন্য কাব্যটি আকারে খুব বড় হয়েছে। 'যশোধরচরিতে'-র অমৃতমতী উপাখ্যানের মতোই আলোচ্য কাব্যের চণ্ডশাসনের উপাখ্যান। এ যেন বিশাল অরণ্যে একটি উপত্যকা বিশেষ। গল্পটির সার কথা এই যে চণ্ডসেন তার বন্ধু বসুসেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসে তার মোহময়ী স্ত্রীকে দেখে মুগ্ধ হয়ে বন্ধুর সঙ্গে হাত করে তার স্ত্রীকে নিয়ে পালিয়ে যায়। চণ্ডসেন বন্ধু-স্ত্রীকে প্রলুব্ধ করবার জন্য বিবিধ কৌশল প্রয়োগ করেও তার ভালোবাসা অর্জনে ব্যর্থ হয়। অবশেষে এক জাদুকরের সহায়তায় চণ্ডসেন বন্ধু বসুসেনের ছিন্ন মুণ্ড দেখালে বসুসেনের স্ত্রী সেই বীভৎস দৃশ্যের ফলে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। 'যশোধর চরিতে'র অমৃতমতী উপাখ্যান নারীর অবৈধ প্রেম, আলোচ্য পুরুষের অবৈধ প্রেমের বিয়োগান্ত পরিণতি। রীতিনীতি বর্জিত প্রেমের সূক্ষ্ম রূপায়ণের সাহায্যে কবি জন্ন কন্নড কাব্যের ক্ষেত্রে কিছু মৌলিক দান রেখে গেছেন।

আণ্ডয়্যা

এযুগের একমাত্র কবি আণ্ডয়্যা যিনি বিষয়বস্তু, কাহিনী গঠন ও রচনা-রীতিতে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর একখানি মাত্র বই "কব্বিগর কার" বিষয়বস্তুতে সম্পূর্ণরূপে ধর্মীয়ও নয়, আবার লৌকিকও নয়। একপ্রকার উদ্ভট রচনা। নায়ক কামদেব তার দলবলসহ উপস্থিত। বিষয়টা নতুন ও চমকপ্রদ। শিব তাঁর চুরি-করে-নেওয়া চন্দ্রকে ফেরৎ দেননি বলে কামদেব শিবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাঁকে পরাভূত করে অর্ধনারীতে রূপান্তরিত করে। শিবের অভিশাপে কামদেব কিছুকাল অদৃশ্য হয়ে থাকবে। এমন অদ্ভুত বিষয় কোন্ উৎস থেকে নেওয়া হয়েছে জানা নেই। মনে হয়

ব্যাপারটা সম্পূর্ণরূপে কবির কল্পনাশক্তি-সম্ভূত, সেই সঙ্গে আছে জৈন ও বৈদিক পুরাণের কিছু কাহিনী। মনে হয়, কামদেব ও শিবের সংঘর্ষের কারণ যে চন্দ্র অপহরণ তা বোধ করি সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যে অপরিচিত একটি মৌলিক ভাবনা। বইটির বৈশিষ্ট্য তার রচনারীতিতে—সংস্কৃতের মিশ্রণ না ঘটিয়ে খাঁটি কন্নড ভাষায় লিখিত। কিছু সংস্কৃত শব্দ অবশ্য আত্মগোপন করে অর্থাৎ 'তদ্ভব শব্দ' হিসাবে ঢুকে পড়লেও তাদের সংখ্যা অনেক কম। কবি যে সাহস ও যোগ্যতা বলে অননুকরণীয় ভঙ্গিতে উপাখ্যানটি গড়ে তুলেছেন তার জন্য তিনি অবশ্যই সাধুবাদের যোগ্য। অধিকতর প্রশংসার বিষয় হল এই যে, বইটি অতি সুখপাঠ্য রচনা, কোথাও কৃত্রিম বা কষ্টকল্পিত বলে মনে হয় না।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মধ্য যুগ ২

মধ্যযুগের পঞ্চদশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দী এই দু'শ বছরে কন্নড সাহিত্য আরও বেশি লোকমুখী, সমৃদ্ধ ও বিচিত্র হয়ে ওঠে। একেবারে আদিযুগ থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত যে ধ্রুপদী সাহিত্যের প্রাধান্য ছিল, তা পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত বচনসাহিত্য এবং অন্যান্য শ্রেণীর রচনার সঙ্গে পাশাপাশি চলে আসছিল। তবে ধ্রুপদী সাহিত্য ধীরে ধীরে ক্ষয়িষ্ণু হয়ে পড়ে। পঞ্চদশ শতকের পরবর্তী দু'শ বছরে এই সাহিত্য একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায়। মুখ্য হয়ে দেখা দেয় লোকমুখী সাহিত্য যা সুবোধ্য এবং গানও আবৃত্তির যোগ্য। প্রচুর সংখ্যক ভক্তিসংগীত ব্যতীত ষট্পদী ও সাংগত্য ছন্দে প্রচুর রচনা লিখিত হয়েছিল। চম্পূ কাব্যও ধীরে ধীরে লোপ পেয়ে যায়। কবিতার আবেদন ক্রমে ক্রমে ব্যাপক হতে থাকে। এই যুগেই কর্ণাটক রাজনীতি ও সংস্কৃতির দিক থেকে দক্ষিণভারতের অবশিষ্ট অংশের সঙ্গে বিচ্যুত হয়ে গৌরবের শিখরে উন্নীত হয়। চতুর্দশ শতকে প্রতিষ্ঠিত বিজয়নগর সাম্রাজ্য রাজশক্তির দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত হয় যদিও পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে ঘরের ও বাইরের শত্রুর ষড়-যন্ত্রে কিছুটা দুর্বলতা দেখা দেয়। বুক্করায়, প্রৌঢ়দেব রায়, কৃষ্ণদেবরায় এবং রামরায় ছিলেন যেমন যোদ্ধা তেমনি কূটনীতিজ্ঞ। তাঁদেরই হাতে সাম্রাজ্যের মর্যাদা বেড়ে যায়। বিশেষ করে ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধে রাজ্যশাসনকারী কৃষ্ণদেবরায় ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ নরপতিদের একজন বলে সম্মানিত। রাজধানী, সৈন্যসামন্ত, সম্পদ এবং যাবতীয় উপভোগের বস্তু নিয়ে রোমাঞ্চকর স্বপ্নের বাস্তব রূপ গ্রহণের মতো বিজয়নগর সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে। বিদেশী বণিক ও পর্যটকেরা সাম্রাজ্যের গৌরকীর্তনে মুখর। দুর্ভাগ্যক্রমে সেই রাজসাম্রাজ্য রক্ষসতঙ্গড়গিদের যুদ্ধ যেন সামান্য খোঁচায় বুদ্বুদের ফেটে যাওয়ার মতো মিলিয়ে গেল।

পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে শুরু করে কর্ণাটকের জীবনে অপরিমেয় শক্তি এবং অস্বাভাবিক দুর্বলতা এই দুয়ের চরম রূপ দেখা গেল। এই কথাটি মনে রাখলে তৎকালীন সাহিত্য কর্মের প্রকৃত পটভূমি বুঝতে পারব এবং একথাও জানতে পারব যে যুগধর্মটি তৎকালীন সাহিত্যে কতটা প্রতিফলিত হয়েছে। পুঞ্জীভূত

সাহিত্য উপাদান থেকে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের শাসকদের এবং জনসাধারণের শৌর্যবীর্য, ধর্মীয় সহিষ্ণুতা উদারতা এবং শিল্প রুচির কথা জানতে পারি। তাদের দোষের দিকটাও উদ্ঘাটিত হয়—রক্ষণশীলতা, অন্ধ বীর পূজা, অনৈক্য এবং ইন্দ্রিয়পরায়ণতা বিজয়নগরের জীবনে এইভাবে একই সময়ে ভালো ও মন্দের একটা অদ্ভুত সংমিশ্রণ দেখা যায়। উৎকৃষ্ট গুণাবলীর প্রাধান্যের কালে সাম্রাজ্য তথা কন্নড সংস্কৃতির সমৃদ্ধি ঘটে। বিপরীতকালে সাম্রাজ্য ও সংস্কৃতি দুয়েরই পতন হয়। সমৃদ্ধির যুগে ঐক্য বিধায়িনী শক্তিরূপে বিজয়-নগর দক্ষিণের সবগুলি ভাষা, ধর্মমত ও সম্প্রদায়কে কাছাকাছি নিয়ে আসে। বৈদিক ধর্মের সমর্থন ও বৈদিক সাহিত্যের প্রচার কেবল কর্ণাটক ও দক্ষিণ ভারতের নয়, সমগ্র ভারতের গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। এই বিশাল প্রয়াসের মূলাধার ছিলেন মহর্ষি বিদ্যারণ। পরবর্তীকালে আরও কয়েকজন ধর্মীয় নেতা সময়ে সময়ে এই ধারায় আবশ্যক মতো প্রেরণা যোগান। কন্নডিগ (কন্নডভাষী)-দের উদার সমন্বয়ী দৃষ্টিভঙ্গি অস্বীকার করা যায় না। ঐতিহাসিক সত্যের একটি উদাহরণ এখানে উল্লেখযোগ্য।

চতুর্দশ শতকের শেষভাগে, ঠিক ঠিক বলতে গেলে ১৩৮৮ খ্রীস্টাব্দে, জৈন ও শ্রীবৈষ্ণব এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে তীব্র রেষারেষি ও সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। রাজা বুক্করায় নিরপেক্ষ ন্যায়ের দৃষ্টিতে উভয় সম্প্রদায়কে একটি সম্মেলনে আহ্বান করেন এবং বিবদমান পক্ষের হাতে হাত মিলিয়ে বোঝাপড়ার জন্য বলেন: 'এই দুই ধর্ম বিশ্বাসে কোনো পার্থক্য নেই। মূলত দুই-ই এক। এক সম্প্রদায়ের ক্ষতিবৃদ্ধি অন্য সম্প্রদায়েরও ক্ষতিবৃদ্ধির কারণ হবে।' যে শিলা-লিপিতে বুক্করায়ের এই মিলনের বাণীটি লিপিবদ্ধ আছে, সেটি চিরস্থায়ী মূল্যবোধের একটি স্মরণীয় দলিল। এতে শুধু রাজার নীতিই বিবৃত হয়নি, এতে ঘোষিত হয়েছে কন্নড সংস্কৃতি শ্রেষ্ঠ জীবনচর্যা। 'ঈশ্বর এক, তাঁর নাম অনেক'—বসবণ্ণার এই সূত্রটি কন্নডিগদের জীবনে ও চিন্তায় যে বিশেষ তাৎপর্য লাভ করেছিল তা বোঝা যায় প্রসিদ্ধ শিলালিপিতে উদ্ধৃত সংস্কৃত শ্লোক থেকে: "যাঁকে শৈবরা উপাসনা করে শিবরূপে, বেদান্তীরা করে ব্রহ্মরূপে, জৈনরা করে অর্হৎরূপে, বৌদ্ধরা করে বুদ্ধরূপে, নৈয়ায়িকেরা করে কর্তারূপে, সেই ভগবান কেশব আমাদের রক্ষা করুন।"

এ যুগের বৈশিষ্ট্য এই যে তৎকালীন কর্ণাটকে প্রচলিত বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাস

নিয়ে লৌকিক আবেদনময় বিচিত্র ধরনের সাহিত্য প্রচুর পরিমাণে রচিত হয়। বসবেশ্বর প্রবর্তিত বিপ্লবের অনেক কাল পরে বীরশৈব পুনরুজ্জীবনের জন্য অপেক্ষমাণ। বিজয়নগরের রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং বীরশৈব পণ্ডিত ও সাধকদের উৎসাহে ও সহযোগিতায় বীরশৈব সাহিত্যের বিভিন্ন দিকে সম্প্রসারণ ঘটে। জৈনসাহিত্য তার প্রাচীন কলাকৌশল ত্যাগ করে সহজ ছন্দে রচিত হতে থাকে। ব্রাহ্মণ্য সাহিত্য, বিশেষ করে ভক্তিসাহিত্য, প্রচুর পরিমাণে রচিত হয়। ব্রাহ্মণ লেখকবৃন্দ তাঁদের পূর্বেকার দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাব কাটিয়ে মাতৃভাষা কন্নড-য় আস্থাবান হয়ে সাধারণ লোকায়ত ধরনে লিখতে থাকেন। এই নতুন চেতনার পথিকৃৎ কুমারব্যাস মহাভারতের কাহিনী পরিবেশন করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের বাগভঙ্গিতে অসাধারণ দক্ষতা দেখিয়েছেন। কুমারব্যাসদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাবে ভক্তিমার্গের অনেক কবি রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত এবং অনুরূপ অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থের কন্নড রূপান্তর সৃষ্টিতে উদ্যোগী হন। তাঁরা স্বচ্ছন্দভাবে ষট্পদী ও সাংগত্য জাতীয় লৌকিক ছন্দের ব্যবহার করেন। তাঁরা যে নতুন ধরনের গান রচনা করে গাইতে থাকেন, তার নাম কীর্তন। যদিও বিষয়বস্তু নির্বাচনে এবং পরিবেশনের ধরনে এযুগের লেখকেরা ধর্ম বা সম্প্রদায়ের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন তবু একথা মনে রাখা দরকার যে এ যুগে এমন উদার মনোভাবেরও পরিচয় ছিল যা ধর্মবিশ্বাসকে অতিক্রম করে বিভিন্ন মত ও পথের সমন্বয় সাধনে সহায়তা করে। যখন কোনো বিশেষ ধর্মগোষ্ঠীর লেখকের রচনা বিচার করব, তখন এই যুগধর্ম সম্পর্কে আমাদের অবশ্যই সচেতনতার পরিচয় দিতে হবে।

কুমারব্যাস

কুমারব্যাস এযুগের একজন শীর্ষস্থানীয় কবি। বস্তুত তিনি কন্নড কাব্য-ক্ষেত্রের প্রথম সারির স্বল্প কয়েকজন কবিদের অন্যতম। তাঁর প্রকৃত নাম নারণপ্পা। ধারওয়াড় জেলার কোলিওয়াড়া গ্রামের নিবাসী। গড়গ অঞ্চলের বীর নারায়ণ দেবতার তিনি ছিলেন মহৎ উপাসক। তিনি নিজেকে বলতেন 'যোগীন্দ্র'। তাঁর বিষয়ে যেটুকু জানা যায় তাতে মনে হয় তাঁর সাবলীল রচনা শক্তি ঈশ্বরদত্ত। মেজাজে ও বিশ্বাসে তিনি ছিলেন একজন 'ভাগবত'।

তৎকালীন কবিদের মধ্যে অত্যন্ত উদারচেতা পুরুষ। সমান স্বাচ্ছন্দ্যে তিনি বীররস ও ভক্তিরসের সৃষ্টি করতেন।

তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা 'কন্নডভারত'। ১৫০টি 'সন্ধি'তে (অধ্যায়ে) এবং প্রায় ৮৫০০ শ্লোকে 'ভামিনী সপ্তপদী' ছন্দে লিখিত কাব্য। মহাভারতের সূচনা থেকে দশম পর্ব পর্যন্ত কাহিনী বিবৃত। যদিও কবি প্রধানত পাণ্ডব ও কৌরবদের মারাত্মক সংঘর্ষ বর্ণনা করেছেন, তবু কৃষ্ণকথাও গৌণ হয়নি কারণ তিনিই তো সর্বশক্তিমান ঈশ্বর—মানবজীবনরূপ পুতুলখেলার বাজিকর। তাই কবি তাঁর কাব্যের নাম দিয়েছেন 'কৃষ্ণকথা'। শ্রীকৃষ্ণই এই কাব্যের কেন্দ্রীয় চরিত্র। অর্থাৎ এই মহাজাগতিক নাট্যলীলায় অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার অভিনেতা স্বয়ং ভগবান এই গ্রন্থের নায়ক। এই গ্রন্থ লেখকের দ্বিবিধ দর্শনের সমন্বিত রূপ। একদিকে কাব্যের গঠনগত সৌন্দর্য, অন্যদিকে ভগবৎ-কেন্দ্রিক জীবন। যদিও কবি মনুষ্য প্রবৃত্তির জটিল প্রকৃতির কথা বলেছেন, তবু তাঁর রচনায় মনুষ্য ব্যাপারে ঐশ্বরিক লীলার অনুপম সৌন্দর্য পরিস্ফুট। কুমারব্যাস যে কেবল মহাভারতের গল্পের সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন তাই নয়, পুনঃ পুনঃ অধ্যয়ন ও অনুধ্যানের ফলে তিনি মহাভারতের মূল ভাবটির সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি তাঁর যোগশক্তি বলে চেতনার উচ্চস্তরে উন্নীত হয়ে সর্বশক্তিমানের করুণা আহ্বানে নিযুক্ত হয়েছিলেন। প্রচুর অধ্যয়ন ও অভ্যাসের ফলে আত্মপ্রকাশের অত্যাবশ্যক কলাকৌশলও আয়ত্ত করেছিলেন। এই শ্রেষ্ঠ রচনাটি তাই তাঁর সর্বশক্তির যোগফল। এটি যে একটি শ্রেষ্ঠ কৃতি এ বিষয়ে কন্নড কাব্যের প্রত্যেক বিচক্ষণ পাঠক ও সমালোচক একমত। এই অভিমত বিশ্লেষণ করে দেখতে পাই যে কবির সমৃদ্ধ কল্পনা ও জীবন দর্শনের দ্বারা পরিব্যাপ্ত সুপ্রসিদ্ধ পৌরাণিক কাহিনীর নব্যসৃষ্টির জন্য কুমারব্যাসকে যোগ্য সম্মানই দেওয়া হয়েছে। কুমারব্যাসে কাহিনীর কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্জন থাকলেও বেদব্যাস কথিত গল্পের মুখ্য রূপরেখা অবিকৃতই রয়ে গেছে। তৎসত্ত্বেও বলতে হবে, কুমারব্যাসের 'ভারত' কেবল মূলের প্রতিলিপি নয়, নবীন সৃষ্টি। মূল কাহিনীর বিষয় ও চরিত্র পরিবর্তনে ততটা মৌলিক নয়। লেখকের আসল কৃতিত্ব অতুচ্চ কল্পনাবলে কাহিনী-কথন, স্বচ্ছ জীবন দৃষ্টি দিয়ে কাহিনীর ব্যাখ্যা এবং কন্নড ভাষার সজীব বাগ্‌ধারার সুষ্ঠু প্রয়োগ।

দু'একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। পাণ্ডুরাজার জীবনের শেষ দৃশ্য আদি পর্বের একটি মর্মান্তিক অংশ। এই দৃশ্য বর্ণনায় কুমারব্যাস মূল মহাভারতকে যথাযথ অনুসরণ করেও ঘটনাটির তীক্ষ্ণতা সৃষ্টিতে সফলকাম হয়েছেন। যোগীর কাছে উত্তেজিত তরবারির মতো এবং বিয়োগী বা বিরহীর কাছে তীক্ষ্ণ বর্শাফলকের মতো বসন্ত ঋতুর সমাগম হয়েছে—এই বর্ণনা বিশেষ অর্থবহ হয়ে ওঠে যখন আমরা মনে রাখি যে রাজা পাণ্ডু মুনির শাপের ফলে পত্নীর কাছ থেকে দূরে থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন। কবি আরো বলেছেন যে ঋতুরাজ বসন্ত পাণ্ডুকে আক্রমণ করে। পাণ্ডুর স্ত্রী মাদ্রী পুষ্পাভরণে ভূষিত হয়ে বনে বিচরণ করছিলেন। তাঁকে দেখে পাণ্ডু তাঁর রূপদর্শনে একান্ত বিহ্বল হয়ে পড়েন। কামদেবের বাণ তাঁর হৃদয়ে বিদ্ধ হয়। কেবল পঞ্চশরে নয়, অগণ্য অসংখ্য শরে পাণ্ডুর প্রতিটি রোমকূপ বিদ্ধ হওয়াতে পাণ্ডুর বিবেক-বোধ লুপ্ত হয়ে যায়। তিনি সংযম হারিয়ে ফেলেন। স্ত্রীর কাছে ছুটে গিয়ে পাণ্ডু তাঁর শাড়ির প্রান্ত ধরে আকর্ষণ করেন। 'না, না' বলে মাদ্রী তাঁর স্বামীর পদপ্রান্তে পতিত হন। কিন্তু কামনার উন্মত্ততায় আত্মহারা পাণ্ডু স্ত্রীর কথায় ভ্রূক্ষেপ না করে তাঁকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করবার চেষ্টা করতেই মৃত্যু মুখে পতিত হন। কুমারব্যাস পাণ্ডুর এই মর্মন্তুদ কাহিনী বেশ নৈপুণ্য ও দরদ দিয়ে বর্ণনা করেছেন। ঘটনাটির বিশ্বজনীন তাৎপর্য এইখানে যে বাসনার তীব্র আক্রমণে জ্ঞানী ব্যক্তিরাও অসহায়। ঘটনাটি পূর্ব থেকেই আভাস দেয় যে ভবিষ্যতে পাণ্ডুপুত্র পাণ্ডবেরা নিয়তির হাতে কিরূপ গঞ্জনা ভোগ করবে।

'কুমার ভারত'-এর একটি উৎকৃষ্ট অংশ সভাপর্বের 'দ্যূতপর্ব', বিশেষ করে দ্রৌপদীর অপমানিত হওয়ার দৃশ্য, প্রতারণাপূর্ণ পাশা খেলায় পাণ্ডবেরা যখন দ্রৌপদীকে হারালেন, দুঃশাসন তখন তাঁকে রূঢ় ও অশোভন ভাষায় গালাগালি দিতে দিতে রাজদরবারে টেনে আনল দেখে সভাসদবর্গ ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। ভীম ও অর্জুন এত ভয়ঙ্কর রূপে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে যে 'তারা মনে মনে সেই হতভাগ্য কৌরবের রক্তস্রাবী নাড়ীভুড়িগুলোকে সিদ্ধ করতে লাগল'। তাদের অবদমিত ক্রোধের চরমরূপ এখানে প্রদর্শিত। যুধিষ্ঠির ভ্রূ-সঙ্কেত করে ভ্রাতাদের ক্রোধের মাত্রাকে দমনের চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি ভীমকে শান্ত করতে পারলেন না। দ্রৌপদী পুনরায় দুর্যোধনের

দ্বারা লাঞ্ছিত হতেই ভীমের ক্রোধ অতিশয় প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে। তাঁর ভয়ঙ্কর চিৎকারে উপস্থিত সকলেই ভয়ে কেঁপে ওঠে। দ্রৌপদী কিন্তু তার আলুলায়িত কেশগুচ্ছ ছড়িয়ে দিতে দিতে খুশী মনে হেসে উঠল কারণ এতক্ষণ পরে সে ভীমের কণ্ঠে পুরুষোচিত ক্রোধ ও প্রতিহিংসার কথা শুনতে পেল। ভীম তার শত্রুপক্ষকে এক আঘাতে শেষ করে দেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে প্রতিজ্ঞা করে যে সে দুঃশাসনের রক্ত দিয়ে দ্রৌপদীর কেশ সিক্ত করবে এবং দুঃশাসনের উৎপাটিত দাঁত দিয়ে দ্রৌপদীর চুল আঁচড়ে দেবে। ভয়ঙ্কর প্রতিজ্ঞাই বটে! এই ভয়াবহ দৃশ্য বর্ণনায় কবি যথার্থ উৎকর্ষের পরিচয় দিয়েছেন। অসত্য ও অবিচারের প্রতিবাদ করতে পারেন যে কবি, তাঁরই বীরত্বব্যঞ্জক ব্যক্তিত্বে এমন সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। চরিত্র সম্পর্কে কবির অভ্রান্ত জ্ঞানের পরিচয় দেবার আর একটি উৎকৃষ্ট সুযোগ দেখা যায় বিরাট পর্বে। বিরাট রাজের দরবারে পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসের সময়ে কামুক কীচকের কবল থেকে ভীম দ্রৌপদীকে উদ্ধার করে। এই পর্বেই বিরাট যুবরাজ উত্তরকুমার অন্তঃপুরের মহিলাদের সম্মুখে নিজের সাহস সম্পর্কে হম্বিতম্বি করে যুদ্ধক্ষেত্রে ভীরু কাপুরুষের মতো পালিয়ে আসে। ব্যঙ্গাত্মক হাস্যরসের জন্য নকল বীরপুরুষ উত্তরকুমার কবি কুমারব্যাসের একটি স্মরণীয় সৃষ্টি।

সংক্ষেপে, মহাভারতের কাহিনীকে সাবলীল ভাষায় উপস্থাপন পদ্ধতি এবং কবির নিজস্ব জীবন দর্শনের পরিচয়দানেই কুমারব্যাসের প্রকৃত কৃতিত্ব। কবির শক্তির উৎস এবং সৃষ্টির প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে গেলে আমরা দেখতে পাই কবি যেন তাঁর পরিণত মনের দর্পণখানি মহাভারতের চলমান বিরাট দৃশ্যাবলীর সামনে ধরে রেখেছিলেন—এমন একখানি দর্পণ যা কুমারব্যাসের কঠোর সাধনার ফলে স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল।

এইভাবে কবি মহাভারতের বিশাল বিচিত্র কাহিনীর মর্মবস্তুকে আত্মসাৎ করে তাঁর নিজস্ব ভঙ্গীতে তাকে পরিবেশন করেছেন। তাঁর গ্রন্থখানি সর্ব অর্থে মহাভারতের একটি যথার্থ কন্নড রূপ। এই রূপকে মৌলিক বলা যায় বিষয়ের নিজস্ব অবতারণায়। আবার মৌলিক বলতে বাধাও আছে, কারণ কবি সুপরিচিত কাহিনী থেকে সাধারণত বিচ্যুত হননি। কুমার ভারতের উৎকর্ষ ও সৌন্দর্য এইখানে যে কবি তাঁর সৃজনশীলতার গুণে অতীতের গিরিগুহা থেকে মহাকাব্যের কাহিনীকে কাব্যের উৎকৃষ্ট প্রকাশভঙ্গী দিয়ে

জীবন্তরূপে জনমানসে তুলে ধরেছেন। স্থানে স্থানে বর্ণনা শিথিল ও মামুলী; নীতি-উপদেশ সুদীর্ঘ ও ছড়ানো। তৎসত্ত্বেও কবির দৃষ্টিশক্তির তীক্ষ্ণতায়, চিত্রকল্পের ঐশ্বর্যে, বাগভঙ্গির গতিশীলতায় এবং সর্বোপরি মূল বিষয়ের ফলে অদ্ভুত একাত্মতাবোধে কুমারব্যাসের মহাভারত কন্নড ভাষার একটি মহত্তম সৃষ্টি।

চামরস

শিবভক্তদের কাব্য-জীবনী লিখে জীবন-চরিত শাখার প্রবর্তন করেন হরিহর কবি। বসবেশ্বর প্রভৃতি সাধক বীরশৈবদের বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এই সাধকদের জীবন-চরিত রচনা করে হরিহর এ বিষয়ে, কী ছন্দে, কী রীতিতে এক নতুন ধারার পথ খুলে দেন। কাব্য জগতে তিনি নিঃসন্দেহে উচ্চ স্থানের অধিকারী। তাঁর শিষ্য রাঘবাঙ্ক গুরুর পদাঙ্ক অনুসরণে ঐ একই প্রকৃতির দু'একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। আলোচ্য যুগে আমরা আরও কয়েকখানি জীবনী কাব্য দেখতে পাই। তন্মধ্যে অল্লমপ্রভুর জীবন-চরিত—কবি চামরসের 'প্রভুলিঙ্গলীলে' সর্বোৎকৃষ্ট। চামরসের জীবনী সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। প্রচলিত কাহিনী অনুসারে কুমারব্যাসের সঙ্গে চামরসের পারিবারিক সম্পর্ক ছিল। বিজয় নগরের প্রৌঢ়দেব রায়ের আমলে যে একশত একজন 'বিরকট' বা সন্ন্যাসী ছিলেন চামরস তাঁদের অন্যতম। চামরসের গ্রন্থ বিচার করলে মনে হয়, অল্লমপ্রভুর ব্যক্তিত্বের মূল কথা প্রত্যক্ষরূপে বর্ণনার জন্য যে স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি এবং অনাসক্তি বোধ অত্যাবশ্যক, কবি তার অনুশীলন করেছিলেন। হরিহরই সর্বপ্রথম অল্লমপ্রভুর জীবন-চরিত রচনা করেন। তাঁর গ্রন্থ চামরসের গ্রন্থ থেকে কাহিনীবস্তু এবং ঘটনা পারম্পর্যে পৃথক। যেমন, হরিহরের অল্লমপ্রভু কামলতার ফাঁদে পড়ে বিরহজ্বালা ভোগ করেন এবং অবশেষে অনুতপ্ত হয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, অন্যদিকে চামরসের অল্লমপ্রভু মায়াকে প্রলুব্ধ করেও প্রকৃত সন্ন্যাসীর মতো মায়ার কবল থেকে মুক্তি লাভ করেন। হরিহরের 'রগলে' কাব্য খর স্রোতে বয়ে চলে, চামরসের 'লীলে' কাব্য পূর্ণ নদীর ধীর মন্থর গতিতে প্রবাহিত। চামরসের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী তিনি অল্লমপ্রভুর জীবন চরিতে তৎকালে প্রচলিত কোনো পুরোনো ধারার অনুসরণ করেন। সে যাই হোক, একটি জিনিস পরিষ্কার যে কবি অল্লম-

প্রভুকে দিব্যাত্মা রূপে দেখাতে চেয়েছিলেন, সাধনার মধ্য দিয়ে অগ্রসরমান কোনো বেড়ে ওঠা চরিত্ররূপে নয়। গ্রন্থের নামকরণ থেকেই বোঝা যায়, কবি অল্লম রূপে আবির্ভূত ভগবানের 'লীলা' বর্ণনা করতেই চেয়েছিলেন। কবি তাঁর বিষয়বস্তুর মহিমান্বিত প্রকৃতি সম্পর্কে যেমন সচেতন ছিলেন, তেমনি ছিলেন নিজের সীমিত শক্তির জন্য প্রকৃত বিনয়ী। তিনি নিজেকে মনে করতেন ঈশ্বরের যন্ত্র মাত্র। তিনি নিজের কণ্ঠস্বরকে মন্দিরের অভ্যন্তরস্থ প্রতিধ্বনির সঙ্গে তুলনা করেছেন। অন্য কোনো শব্দে মন্দির প্রতিধ্বনিময়, কিন্তু ভ্রান্তি জন্মে যে মন্দির নিজেই বুঝি শব্দময়।

অল্লমপ্রভুর ব্যক্তিত্ব বর্ণনায় চামরস তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করে-ছিলেন। সেখানেই তাঁর মহত্ব। প্রভু সম্পর্কে সমস্ত উপাখ্যান কবি তাঁর প্রধান লক্ষ্য পূরণের জন্যই ব্যবহার করেছেন, অন্য কোনো প্রলোভনে স্বধর্মচ্যুত হন নি। তাই তাঁর সৃজনশীলতা স্বাভাবিক ও তৃপ্তিকর। গ্রন্থের প্রারম্ভেই প্রধান চরিত্র (অর্থাৎ অল্লমপ্রভু) সম্পর্কে বলতে গিয়ে কবি শুরু করলেন এই-ভাবে—'অল্লমপ্রভু কখনো কেবল কথায় প্রলুব্ধ হন না। যে মানুষ তাঁকে যেরূপে কামনা করে এবং যে স্তরে তাঁকে বুঝতে পারে, প্রভু সেই রূপে ও সেই স্তরে দেখা দেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি ঈশ্বরের অবতার।' চামরস যদি সাধারণ লোকের তৃপ্তির জন্য কতগুলি অলৌকিক ঘটনার অবতারণা করতেন, তবে তাঁর গ্রন্থ গুণমানে অনেক নিচুস্তরের হয়ে যেত।

দেখা যাক, কয়েকটি ঘটনা ও উক্তির মধ্য দিয়ে কীভাবে অল্লমপ্রভুর অসাধারণ চরিত্র বর্ণিত হয়েছে। বনবসে-র রাজা মমকার এবং তার রানী মোহিনীর কন্যারূপে মায়ার জন্ম হয়। পরমাসুন্দরী কন্যা কালে মোহময়ী রমণীরূপে বড় হয়ে ওঠে। একদিন সে মন্দিরের প্রবেশ দ্বারে ঢাকীর ছদ্মবেশে অল্লমপ্রভুর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে ভালোবেসে ফেলে। মায়ার সঙ্গিনীরা অল্লমপ্রভুর সঙ্গে দেখা করে মায়ার কামনার কথা জানিয়ে অনেক মিনতির পরে প্রভুকে রাজী করে বলে মনে হল। প্রভুকে একটি সুসজ্জিত কক্ষে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু জীবনের পরম আনন্দময় মুহূর্তে মায়ার জন্য অপেক্ষা করে ছিল মোহ ভঙ্গ। দিন ও রাত্রি একসঙ্গে মিলিত হয় কিরূপে? আকাশ কি বৃষ্টিতে কখনো ভিজে যাবে? অথবা আগুনে দগ্ধ হবে বা বাতাসে বেঁকে যাবে? অল্লমপ্রভু তেমনি 'বয়লুগ' (আকাশের মতো) মানুষ। বিস্তৃত বিবরণ বাদ

দিয়ে বলা যায়, চামরস চরম শিল্প কৌশলে অল্লমপ্রভুর আপাত আসক্তি এবং অন্তরের প্রকৃত অনাসক্তি বর্ণনা করেছেন।

অন্য একটি গল্পে মায়ার নৃত্যকালে অল্লম বাদ্য বাজাচ্ছিলেন। এর চেয়ে আনন্দময় সংযোগ আর কী হতে পারে? যে মায়া তাঁর বিশ্ব সৃষ্টিকে দোলায় সেই মায়াদেবীকেই অল্লম প্রভু কেমন করে দোলাচ্ছেন—এইটি দেখাবার জন্যই যেন প্রভু মায়ার নৃত্যের সঙ্গে ঢাক বাজাচ্ছিলেন। বাহ্যত মনে হচ্ছিল তিনি মায়ার মোহে আসক্ত। কিন্তু তা কেবল বাহ্যতই। দৃশ্যটির বর্ণনায় কবি একটি চমৎকার উপমা দিয়েছেন। মর্মর প্রস্তরের পার্শ্বস্থিত কোনো লতায় যখন আগুন (দাবাগ্নি) লাগে, সেই আগুনের শিখা পাথরে প্রতিফলিত হয়ে এমন ভ্রান্তি জন্মায় যে পাথরেই বুঝি আগুন লেগেছে মনে হয়। ঠিক সেই ভাবে মায়াকে গ্রাস করা কামাগ্নি অল্লমপ্রভুতেপ্রতিফলিত হয়ে ভ্রান্তি জন্মাল যে স্বয়ং প্রভুও কামনায় পীড়িত। মায়ার জগতে বাস করেও অল্লমপ্রভু কখনো মায়ার বশীভূত ছিলেন না। প্রভুর এই সত্যিকার রূপ বোঝাবার জন্য উল্লিখিত উপমার প্রয়োগ অপূর্ব কবি-প্রতিভার নিদর্শন। চামরসের গ্রন্থের শ্রেষ্ঠত্বের এই একটিমাত্র উদাহরণ।

পরবর্তী অংশে কবি বলেছেন যে বসবেশ্বর, অক্কমহাদেবী প্রভৃতির মতো মহৎ সাধক-সাধিকা কীভাবে অল্লমপ্রভুর সংস্পর্শে এসে তাঁর কাছ থেকে প্রেরণা ও নির্দেশ পেয়েছিলেন। ধর্মীয় ব্যাপারে অল্লমপ্রভুর দৃষ্টিভঙ্গি যে কতটা বৈপ্লবিক ছিল তা একটি ঘটনা থেকে বোঝা যায়। কন্নড দেশে ভ্রমণকালে তিনি একবার সোন্নলাপুরে (বর্তমান শোলাপুরে) উপনীত হয়ে দেখতে পান কিছু লোক মন্দির নির্মাণের কাজে ব্যস্ত। শোনা গেল যে যোগী সিদ্ধরামের আদেশে তাঁর শিষ্যরা এই মন্দির নির্মাণ করছে। তিনি সবিস্ময়ে বলে উঠলেন, 'মানুষ যেমন সুতোর বেড়ি কেটে পরে সোনার বেড়ি পরে, সিদ্ধরামের মতো যোগীরও কি তাই হল? পার্থিব জগতের সমস্ত প্রলোভন ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে শেষে কি কীর্তি অর্জনের মোহে পড়ে গেলেন?' গুরু সম্পর্কে এই বিদ্রূপ অপমানকর বলে শিষ্যরা ক্রুদ্ধ হয়ে অল্লমর হাত পা বেঁধে ফেলার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হল। এখন তারা পাথর ছুঁড়ে মারতে শুরু করে, কিন্তু অল্লম পাথরের স্তূপের উপর অক্ষত দাঁড়িয়ে রইলেন। শিষ্যরা গুরুর কাছে গিয়ে নালিশ জানালে ক্রোধোন্মত্ত গুরু এসে হাজির হন। তাঁকে দেখে অল্লম বললেন,

'সাধারণ মানুষ অপেক্ষা সিদ্ধরাম অধিকতর খ্যাতি লাভ করেছেন। যোগীর পক্ষে এত ক্রুদ্ধ হওয়া বড় আশ্চর্যজনক। তারপরে শুরু হল বাগ্‌যুদ্ধ। সিদ্ধরাম ললাট নেত্র দিয়ে সমস্ত জগৎ দগ্ধ করতে উদ্যত হলে অল্লমপ্রভু এক মুহূর্তে সেই আগুন নিভিয়ে দেন। অবশেষে সিদ্ধরাম নিজের নির্বুদ্ধিতার জন্য অনুতপ্ত হয়ে অল্লমপ্রভুর পদপ্রান্তে পতিত হন। অল্লম তাঁকে উপদেশ দিয়ে বললেন আধ্যাত্মিক মহিমা উপলব্ধি করে বহির্জগতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকাঙ্ক্ষা থেকে দূরে থাকতে।

এইভাবে কবি চামরস স্বতঃস্ফূর্ত ও চমৎকার ভঙ্গিতে অল্লমপ্রভুর প্রধান বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন। একথা সত্য যে, চামরসের গ্রন্থে কিছু অতিরিক্ত আদর্শীকরণ ও সাম্প্রদায়িক সংস্কারের পরিচয় রয়েছে। কিন্তু অল্লমপ্রভুর মূল বৈশিষ্ট্যের পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে এমন কিছু বাড়াবাড়ি করা হয়নি। কবির কল্পনার ঐশ্বর্য এবং প্রকাশভঙ্গির ঔচিত্য বিস্ময়কর। অল্লমপ্রভুর সঙ্গে কবির একাত্মতাবোধ এবং তাঁর ব্যক্তিত্বের অনুধাবন তাঁর কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করে সাবলীল ভাষায় প্রকাশে সহায়তা করেছে। বিষয়বস্তু গভীর হলেও তাঁর রচনারীতি সরল ও গতিময়। কাব্য পাঠকালে মনে হয় খাঁটি কন্নড ভাষার ছোট্ট পরিচ্ছন্ন শব্দগুলি যেন তরুণ অশ্বের মতো বাতাসে দুলে দুলে কবির কল্পনাকে আহ্বান করছে।

হরিহর এবং কুমারব্যাসের মতোই চামরস ছিলেন মৌলিক প্রতিভাসম্পন্ন কবি। উৎকৃষ্ট কাব্যজীবনীরূপে হরিহরের 'বসবরাজদেবর রগলে' নামক গ্রন্থের পরেই তাঁর 'প্রভুলিঙ্গলীলে' বইটির স্থান নির্দিষ্ট হয়ে আছে। হরিহরের কাব্যে আবেগের খরস্রোত, চামরসের কাব্যে জ্ঞান-বারিধির গাম্ভীর্য। এই যুগের অন্য বীরশৈব কবিরাও তৎকালীন ও পূর্বতন সাধকদের জীবনী-কাব্য রচনার ধারা আরও এগিয়ে নিয়ে যান। অন্যান্য ধর্মমতের কবিরা জীবনীর ছদ্মবেশে পৌরাণিক বীরদের সম্পর্কে লিখেছেন। একথা সত্য যে বীরশৈব জীবন-চরিতগুলিতেও গালগল্প ও অলৌকিক ঘটনামুক্ত নয়, কিন্তু গ্রন্থগুলির প্রধান চরিত্র সমূহের ঐতিহাসিক যাথার্থ্যে সন্দেহ করার কোনোই কারণ নেই। এই জাতীয় গ্রন্থের দীর্ঘ তালিকায় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ভীম-রচিত 'বসবপুরাণ' এবং বিরূপাক্ষ পণ্ডিত রচিত 'চেন্নবসবপুরাণ'। দ্বিতীয় গ্রন্থটি আকারে সুবৃহৎ। কেবল জীবন-চরিত রচনায় আবদ্ধ না থেকে কবি শিবের নানা লীলা, বীর-

শৈব ধর্মমত ও আচরণবিধি প্রভৃতি নানা বিষয়ের অবতারণা করেছেন, এবং এইভাবে বইটি কেবল জীবন চরিত পর্যায়ে না থেকে বীরশৈব মতালম্বীদের পক্ষে একখানি বিশ্বকোষে পরিণত হয়েছে। চিরায়ত কাব্যের সমস্ত রীতি-নীতিও এই কাব্যে পাওয়া যাবে। একখানি জীবন-চরিতকে ঘিরে যে বিশাল কাজের আভাস পাওয়া যায় তা অবশ্যই লক্ষণীয়। কিন্তু সৃজনশীল রচনা হিসাবে হরিহর ও চামরসের সংহত প্রয়াস থেকে এ গ্রন্থ পৃথক ধরনের।

নিজগুণী ও সর্বজ্ঞ

আলোচ্য যুগে বীর শৈব সাহিত্যে ব্যাপক আকারে পুনরুত্থান ঘটে। ফলে নানা শ্রেণীর গ্রন্থ রচনা শুরু হয়—প্রাচীন বচন সাহিত্যের সম্পাদিত সংকলন, ঐ সমস্ত বচনের টীকা-ভাষ্য, নতুন বচন সাহিত্য, জীবনচরিত ও দর্শন গ্রন্থাদি। ত্রিপদী, সাংগত্য প্রভৃতি দেশীয় ছন্দ মাঝে মাঝে প্রযুক্ত হলেও ছ-লাইনের ষট্‌পদী ছন্দ জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং প্রধান পদ্যছন্দরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। চম্পূ কাব্যের ধারা প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়।

বীরশৈব ধর্মমতের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে দ্বাদশ শতকের বচন সাহিত্য সজ্জিত ও সংগৃহীত হয়। প্রৌঢ়দেব রায়ের আমলে একশত এক 'বিরক্ত' বা সাধুপুরুষের আবির্ভাব ঘটেছিল। তাঁরাই বিশেষভাবে এই সংগ্রহ, সংকলন ও সম্পাদনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বীরশৈবদের পুনরভ্যুদয়ের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল বচন-সমূহের নির্বাচন ও নাট্যরূপে উপস্থাপন। যেমন দেখা যায় 'শূন্যসম্পাদনে' গ্রন্থে। এই গ্রন্থের প্রত্যেক কাহিনীর কেন্দ্রীয় চরিত্র হলেন অল্লমপ্রভু। তাঁরই আধ্যাত্মিক নির্দেশে ও পরিচালনায় অতীতে 'অনুভবমণ্ডপ' নামক সভাগৃহে আলোচনাদি অনুষ্ঠিত হত। গূলুরু সিদ্ধবীরনাচার্য সংকলিত 'শূন্য-সম্পাদনে' এই জাতীয় গ্রন্থের মধ্যে একখানি সর্বোত্তম কৃতি। এই কৃতি একাধিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেছে। নাট্য আশ্রয় করে অতীতের পুনরুত্থান, সেই যুগের মহান সাধকদের প্রধান লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্যের আলোচনা এবং যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষরূপে অল্লমপ্রভুর উপর আলোকপাত। সর্বোপরি, আধ্যাত্মিক গণতন্ত্রের সারবস্তু আত্মস্থ করে নেওয়া। এই গণতন্ত্রে প্রতিটি নরনারীর পূর্ণ স্বাধীন অধিকার ছিল কোনো তত্ত্বে সন্দেহ প্রকাশ করা এবং সর্বোত্তম জ্ঞানী ব্যক্তিকেও সেইভাবে প্রশ্নাদি করে সন্দেহ নিরসনের চেষ্টা করা। 'শূন্য সম্পাদনে' বইটি

গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর 'ডায়লগ'-এর সঙ্গে অনুরূপ বলে মত প্রকাশ করা হলেও এর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যও অনস্বীকার্য।

দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যে বচন সাহিত্যের প্রাচুর্যে কন্নড ভূমি প্লাবিত হয়ে গিয়েছিল, পরবর্তী আর কোনো সময়ে বচন সাহিত্যের সেই তরঙ্গ বিক্ষোভ দেখা যায়নি। অল্প স্বল্প বচনকার সেই রীতি নিয়ে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন। স্বভাবতই তাঁদের উপর বসবেশ্বর প্রমুখ প্রাচীন সাধকদের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তাঁদের মধ্যে ব্যক্তিত্বের দীপ্তি ছিল বটে, কিন্তু তাঁদের আধ্যাত্মিক অনুভবের কাব্যরূপ তেমন উচ্চাঙ্গের হয় নি। এডেয়ূর অঞ্চলের তোনদ সিদ্ধেশ্বর একজন বড় সাধক ছিলেন। তিনি আবার নতুন করে তাঁর অনুগামী শিষ্যদের জন্য বীরশৈব চিন্তাধারা প্রচারের জন্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর 'ষট্স্থলজ্ঞান সারামৃত' গ্রন্থে অতীন্দ্রিয় ও দার্শনিক বিষয় সংক্রান্ত প্রায় ৭০০টি বচন পাওয়া যায়। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে স্বতন্ত্র সিদ্ধলিঙ্গেশ্বর এবং ঘনলিঙ্গ কৃতিত্বসহকারে গুরু প্রবর্তিত ধারাকে বহন করেন। বিশেষ করে ঘনলিঙ্গের রচনায় আবেগ ও কল্পনাশক্তির প্রকাশ পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁর রচনায় নীতি কাব্যের গুণ প্রায়ই বিস্তার ভারে আচ্ছন্ন। তাঁর বচনগুলি আকারে দীর্ঘ, এবং দ্বাদশ শতাব্দীর বচন সাহিত্যের সংহত সংক্ষিপ্তরূপে যে মহত্ত্বের প্রকাশ ঘটেছিল, ঘনলিঙ্গের বচনে সেই মহত্ত্ব বা সৌন্দর্য নেই।

নিজগুণ শিবযোগী

আলোচ্য কালসীমায় কন্নড সাহিত্য ধীরে ধীরে জনমুখী হয়ে ওঠে এবং গদ্য, পদ্য ও গানের মধ্য দিয়ে উচ্চতম দার্শনিক তত্ত্ব ও যথাসম্ভব সহজ সরল ভাষায় পরিবেশিত হয়। এই জাতীয় রচনার লেখকদের মধ্যে একজন অসাধারণ ব্যক্তি হলেন নিজগুণ শিবযোগী, সংক্ষেপে নিজগুণী। কথিত আছে যে তিনি রাজশাসকের পদ ত্যাগ করে শম্ভুলিঙ্গ নামক পাহাড়ে তপস্যারত থেকে 'জ্ঞানী' পুরুষে পরিণত হন। তাঁর যে পাঁচখানি বই পাওয়া যায়, তাতে তিনি লোকপ্রিয় ত্রিপদী ও সাংগত্য ছন্দে এবং গানের মধ্য দিয়ে তাঁর চিন্তা ভাবনা ও উপলব্ধির কথা প্রকাশ করেছেন। তাঁর প্রচারিত দার্শনিক তত্ত্ব ছিল অনেক বেশি ব্যাপক। তিনি একদিকে বীরশৈব মত এবং অন্যদিকে বেদে উপনিষদে বর্ণিত আত্মতত্ত্বের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করেছেন। তাঁর উক্তিগুলি

সরল সহজ এবং ফলপ্রদ। তাঁর 'বিবেকচূড়ামণি' জ্ঞানের গদ্যে লিখিত বিশ্বকোষ। এই বৃহদায়তন গ্রন্থের দশটি অধ্যায়ে ১৬৫টি প্রসঙ্গ সন্নিবিষ্ট। তাতে ভূগোল ও সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ের উপর নির্ভুল তথ্যাদি বিশদভাবে বিধৃত। আধুনিক যুগে আমরা যাকে বলি সাধারণ জ্ঞানের বই, বলি বিশ্বকোষ, আলোচ্য গ্রন্থটি তারই অগ্রদূত। মোটের উপর, মধ্যযুগীয় কর্ণাটকের একজন শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন নিজগুণী। কর্ণাটকের ধর্মজীবনে তাঁর প্রভাব স্থায়ী ও গভীর। আধুনিক কালেও এমন ব্যক্তি ও সংস্থা রয়েছে যেগুলি নিজগুণীর চিন্তাধারায় পরিচালিত। যে সঙ্গীত ধারা বসবেশ্বরের কালে প্রবর্তিত হয়, তার পুনরভ্যুদয় ঘটে নিজগুণী ও অন্যান্য শৈব সাধকদের হাতে। নিজগুণীর সমকালীন মুপ্পিনা ষড়ক্ষরী সমধিক প্রসিদ্ধ।

ষড়ক্ষরীর প্রগাঢ় ভক্তিময় গানগুলির মধ্যে ব্যাকুল মানবাত্মার আর্তি ধ্বনিত হয়েছে। বিশেষভাবে লক্ষণীয় তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির উদারতা। একটি প্রার্থনা সঙ্গীতে তিনি জোর দিয়ে বলেছেন—'সকল শাস্ত্র অনুসারে শুধু একই ভগবান এবং তিনি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী এক এক রূপে প্রতিভাত হন।' অন্য একটি গানে কবি নিজেকে পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্তনের জন্য ব্যাকুল রমণীর সঙ্গে তুলনা দিয়েছেন। তাঁর এই চিত্রকল্পটির বিশদরূপ খুব ফলপ্রসূ হয়েছে। কিছু পরবর্তী কালের অপর এক সাধকের নাম সর্পভূষণ শিবযোগী। তিনিও ষড়গুণীর মতো একই ব্যাপক দৃষ্টি ও আভ্যন্তরীণ পরিণত উপলব্ধির জন্য প্রসিদ্ধ। প্রভুর কাছে আহ্বান সঙ্গীতে কবি তাঁকে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব এই ত্রি-দেবতার নাম ও রূপের অতীত বলে বর্ণনা করেছেন। ইন্দ্র প্রভৃতি অন্যান্য দেবতা সেই একের অংশ মাত্র। সূর্য, চন্দ্র এবং অন্যান্য জ্যোতিষ্ক তাঁরই দীপ্তির কণা মাত্র। গত শতাব্দীতেও অসংখ্য সাধক ঈশ্বরের চিন্তায় এই অত্যাবশ্যক বোধের পরিচয় দিয়েছেন। তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার, শিশুবিনাল-এর সাধক শেরিফ সাহেবের নাম—জন্মে তিনি মুসলমান হলেও তাঁর গুরু ছিলেন ব্রাহ্মণ এবং সাধকসঙ্গী ছিলেন বীরশৈববৃন্দ। উত্তর কর্ণাটকে কথ্য ভাষায় তিনি প্রতীকী রহস্য সঙ্গীত লিখে গেছেন।

সর্বজ্ঞ

কন্নড সাহিত্যের ইতিহাসে যাঁর নাম ইন্দ্রজালের ন্যায় প্রভাব বিস্তার করে,

তিনি হলেন সর্বজ্ঞ। যে উদার দৃষ্টি নিজগুণীর দর্শন চিন্তায় পরিব্যাপ্ত, তা আরও বেশী প্রশস্ত হয় সর্বজ্ঞ-এর চিন্তাধারায়। তাঁর জীবন ও বাণী কর্ণাটকের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের অবিনশ্বর সম্পদ। কন্নডিগরা খুব সঙ্গত কারণেই সর্বজ্ঞের জন্য গর্ববোধ করে থাকে। তিনি তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। যেমন সহজ বুদ্ধি তেমনি গভীর জ্ঞানে পরিপূর্ণ তাঁর উক্তিগুলি মানুষের জীবনে সঙ্কেত আলোকের মতো কাজ করে বলে সাধারণ লোকের মুখে মুখে ফেরে। বস্তুত সর্বজ্ঞের অনেকগুলি বাণীই প্রবাদ বাক্যরূপে কন্নড ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছে।

তাঁর জীবন চরিত সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তাঁর রচনার আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য অনুযায়ী এইটুকু মাত্র বলা যায় যে তাঁর শৈশবজীবন মোটেই সুখের ছিল না। সম্ভবত তিনি মাতা পিতার সঙ্গে কলহের ফলে গৃহত্যাগ করে সত্যের অন্বেষণে নানা স্থানে ঘুরে বেড়ান। সৌভাগ্যক্রমে তিনি এমন একজন গুরুর সন্ধান পান যিনি তাঁকে মায়ের মতো লালন পালন করে তাঁকে উপযুক্ত পথে চালিত করেন। সর্বজ্ঞ নিজেই বলেছেন, পথে পথে তাঁর কুটুম্ব, সর্বজন তাঁর স্বজন এবং সমগ্র পৃথিবীই তাঁর কুলদেবতা। এইভাবে তিনি বিশ্বনাগরিক হন। প্রথম জীবনের সমস্ত তিক্ত স্মৃতি তাঁর মন থেকে মুছে গেল। আত্মস্বার্থ বলে তাঁর মধ্যে আর কিছু রইল না। সত্য উপলব্ধি করে সেই সত্যকে ভয় বা অনুগ্রহের কথা না ভেবে স্পষ্টভাবে বলতে পারলেন। এইভাবে তিনি সত্য সাধনায় নির্ভীক ও নিরপেক্ষ সমর্থক হলেন। বিশেষ কোনো ধর্ম বা সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ রইলেন না। তিনি বলতেন, অভিজ্ঞতাই তাঁর বেদ এবং জীবনই তাঁর পাঠশালা। লোকে আদর করে ডাকতেন 'সর্বজ্ঞ' বলে। তিনি বলেছেন, 'সর্বজ্ঞ হলাম কি অহঙ্কারের ফলে? না, সকলের কাছ থেকে জ্ঞানের কথা শিখে শিখে। সে এখন জ্ঞানের পর্বত আর কি।' সমস্ত সম্ভাব্য উৎস থেকে সংগৃহীত বিচিত্র অভিজ্ঞতা, পরিণত বিচার বুদ্ধি, দৃষ্টির প্রসার—এই সমস্তই তাঁকে সর্বজ্ঞ বানিয়েছে। তিনি প্রকৃত অর্থে বড় পণ্ডিতও ছিলেন না, দার্শনিকও নন। কিন্তু ভারতের তথা কর্ণাটকের সাংস্কৃতিক জীবনে যে যুগসঞ্চিত জ্ঞান প্রতিবিম্বিত, তাই তাঁর সমস্ত সত্তায় পরিব্যাপ্ত হয়ে ক্ষুদ্র সংক্ষিপ্ত বাক্যরূপে স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ লাভ করেছে।

যে কোনো বিষয়ে তিনি আলোচনা করুন না, তিনি একেবারে সত্যের সার

কথাটুকু বলেন। ভগবান সম্পর্কে তাঁর উক্তি : 'এই পৃথিবীর জন্য কি দুই ভগবান হতে পারে? কেবল একমাত্র ঈশ্বর—যিনি সব কিছুর নির্মাতা, সব কিছুর দিব্য উৎস।' গুরু সম্পর্কে তিনি বলেন, 'আমরা যে গ্রামে বা শহরে যেতে চাই তার পথ যে-ই দেখাক তাতে কী আসে যায়?' সত্যের একেবারে সার কথা যে বলতে পারে সে যে-ই হোক, তাতে কী আসে যায়?' ভগবৎ পূজা ও ভক্তি সম্পর্কে মামুলী কথাগুলি সুপরিচিত। মানুষ ভিতরকার অর্থ জানার চেষ্টা না করে কেবল বাহ্য আচার অনুষ্ঠান আঁকড়ে থাকে। এই সমস্ত ক্ষেত্রে সর্বজ্ঞ সর্বদাই ঠিক কথাটি বলেছেন এবং সত্য পথ দেখিয়েছেন। 'যদি তুমি মনে মনে ধ্যান করো, তবে তা ঘরে বসে না মন্দিরে বসে করো সেটা বড়ো কথা নয়। সেই লোকের জীবন বৃথা যে মনে মনে কখনো ধ্যান করে না অথচ মন্দিরের ভিতরে গিয়ে বসে থাকে। এই দেহই তো মন্দির আর এই আত্মাই ঈশ্বর। যিনি নিজের ভিতরে তাঁর উপাসনা করেন, তাঁর মুক্তি অবধারিত।' সর্বজ্ঞ সদাসর্বদা বিশ্বজনীন ধর্ম ও নীতিবাদের কথা বলতেন। তিনি যেমন সত্যকে তেমনি দানশীলতাকেও মূল্য দিতেন। দানের মহিমা সম্পর্কে সর্বজ্ঞ ভারি সুন্দর কথা বলেছেন। 'স্রষ্টা ঈশ্বর এবং দাতা মানুষের মধ্যে তফাৎ কী? যিনি স্বহস্তে দান করেন তিনিই ঈশ্বর। মানুষের উচিত নিরন্নকে অন্নদান করা, সত্যভাষণ করা এবং অপরকে নিজেরই মতো করে দেখা। এই নীতিই স্বর্গের পথ প্রস্তুত করে। আমরা যা কিছু দান করি তা আমাদের কাছেই ফিরে আসে, যা কিছু লুকোই তা অন্যের কাছে চলে যায়। কখনো বলোনা যে দান কখনো অপব্যয় হতে পারে। আসলে এ তোমার ভবিষ্যতের খাদ্য জমা হয়ে থাকে।'

সন্ন্যাসী ছিলেন বলে সর্বজ্ঞ পার্থিব জীবন সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন না। অনাসক্ত ছিলেন বলেই হয়তো জীবনকে তিনি আরও বেশি করে ভালোবাসতেন। তাঁর অনেক বাণীতে তিনি গৃহস্থ মানুষকে একটি সুপরামর্শ দিয়েছেন : 'যদি তোমার বাসগৃহ প্রীতিপ্রদ হয়, ব্যয় করবার মতো অর্থ থাকে এবং সর্বোপরি তোমার মনের কথা বুঝতে পারে এমন গৃহিণী থাকে, তবে তোমার আর স্বর্গের প্রয়োজন কী?' তিনি কর্ণাটকের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রকম খাদ্যের বর্ণনা করেছেন ও রসাস্বাদনও করেছেন। শিল্প ও সৌন্দর্য প্রেমিক মানুষ তাঁর পছন্দ ছিল। সর্বজ্ঞ বলতেন : 'রসিক ব্যক্তির বাক্য চন্দ্রোদয়ের

মতোই মনোরম, আর বেরসিকের কথাবার্তা তরবারির খোঁচার মতোই যন্ত্রণা-দায়ক।'

সর্বজ্ঞ ছিলেন সামাজিক দুর্নীতির কঠোর সমালোচক। তাঁর রচনায় যে তীব্র ব্যঙ্গ ফুটে উঠেছে তাতে কিন্তু ঘৃণা বা বিদ্বেষের লেশমাত্র ছিল না। তাঁর ব্যঙ্গ রচনার মূলে ছিল মনুষ্য-প্রীতি। তিনি মানুষের জীবনকে আরও উন্নত আরও সুন্দর করে তুলতে চাইতেন। বলতেন, মন অকপট না হলে বার বার মন্দির প্রদক্ষিণ করে লাভ কী? সে তো কলুর বলদের মতো ঘানির চারিদিকে ঘোরা। যারা পাথরের উপর পাথর সাজিয়ে মন্দির তৈরী করে তার মধ্যে একটি পাথরের উপর আর একটি প্রস্তর মূর্তি বসায়, তারা নিজেরাই পাথরের তুল্য। আঙুলে জপমালা গুণছে, মুখে নাম বিড়বিড় করছে, কিন্তু তাদের মন রয়েছে দূরে, ভাবছে অন্য সব কথা। এ যেন কোনো পরিত্যক্ত শহরের মাঝ-খানে কুকুরের নিষ্ফল চিৎকার। যখন কোনো মিথ্যাবাদী মন্দিরের দিকে মুখ করে তার কপালে হাত তুলে দেবতাকে নমস্কার করে, তখন বুঝবে তার মিথ্যার বহর উত্তোলিত হাতের মতোই লম্বা হবে।' এই ভাবে সামাজিক দোষত্রুটির তীক্ষ্ণ মর্মভেদী বিশ্লেষণ, স্পষ্টবাদিতা ও ব্যঙ্গ শক্তি সম্পর্কে বেশ কিছু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। তাঁর বাণীগুলি তিন পঙ্‌ক্তিবিশিষ্ট অতি প্রাচীন ও দেশীয় ত্রিপদী ছন্দে রচিত 'বচন' নামে অভিভূত। এই জাতীয় বচন রচনায় সর্বজ্ঞের তুল্য আর কেউ নেই। সংক্ষেপে, তামিলে তিরুবল্লুবরের এবং তেলুগুতে বেমনা-র যে স্থান, কন্নড সাহিত্যে সর্বজ্ঞ সেই স্থানের অধিকারী।

পুরন্দরদাস ও কনকদাস

'হরিদাস' নামধারী কবিদের ভক্তি সাহিত্যের সূচনা হয় ত্রয়োদশ শতকের শেষভাগে নরহরিতীর্থের হাতে এবং তার বিকাশ ঘটে পঞ্চদশ শতকের শ্রীপাদ-রায়ের রচনায়। উভয়েই ভক্ত ও প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন। তাঁরা মধ্বাচার্য-পন্থী। ষোড়শ শতাব্দীতে বিজয়নগরের কৃষ্ণদেব রায়ের আমলে এই ভক্তি সাহিত্যের চরম বিকাশ ঘটে ব্যাসরায়ের শিষ্য পুরন্দরদাস ও কনকদাসের হাতে। তাঁরা বহু সংখ্যক পদ রচনা করে কণ্ঠে ভক্তি-সংগীতের অবিস্মরণীয় সুর নিয়ে দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে বেড়াতেন। পরবর্তী কালে এই হরিদাস ধারা 'দাসকূট' (দাসমণ্ডলী) নামে পরিচিত হয় এবং বিজয়দাস ও জগন্নাথদাসের

মতো মহান সাধক সেই সাধনার ধারা এগিয়ে নিয়ে যান। যদিও একথা বলা চলে না যে এই গানগুলির কাব্যগুণ সমভাবে উচ্চমানের, তবু তাদের ঔৎসুক্য ও স্বতঃস্ফূর্ততা অনস্বীকার্য। বীরশৈবদের বচন সাহিত্যে যেমন, তেমনি বৈষ্ণব সাধকদের 'কীর্তন' সাহিত্যে ঈশ্বরভক্ত একজন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষই পথিকৃৎ। এ ধরনের ভক্তি সাহিত্য কেবল পাণ্ডিত্য অথবা কেবল কল্পনাবলে সৃষ্ট হতে পারে না।

এই বৈষ্ণবভক্তি আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন শ্রীপদরায়ের শিষ্য এবং পরম বিদ্বানরূপে প্রসিদ্ধ ব্যাসরায়। তিনিই ছিলেন ব্যাসরায় মঠের অধ্যক্ষ। বিশেষ লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের চূড়ান্ত সমৃদ্ধির যুগে ব্যাসরায় রাজা ও প্রজা সাধারণ কর্তৃক সমভাবে সম্মানিত হতেন। যদিও তিনি ছিলেন সংস্কৃতে মহাপণ্ডিত, তবু তিনি ভক্তিমূলক গান রচনা করেছিলেন কন্নড ভাষায় এবং শিষ্যগণকেও সেই উপদেশ দিতেন। এই গানগুলি গাওয়া হত আরাধ্য দেবতার সম্মুখে, এবং এই 'দাসকূট' (দাসমণ্ডলী) সংস্থার উদ্‌ভব ঘটে। তৎকালীন বৈদিক সমাজে যে ধরনের রক্ষণশীলতা প্রচলিত ছিল, তাতে ব্যাসরায়ের সাধনা বৈপ্লবিক ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কন্নড সাহিত্যে তাঁর বিশিষ্ট অবদানের জন্য ব্যাসরায়ের নাম কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণীয়।

পুরন্দরদাস

'হরিদাস' কবিদের মধ্যে মহানভক্ত এবং সংগীত রচয়িতা হিসাবে পুরন্দরদাস সর্বশ্রেষ্ঠ বলে পরিগণিত। তাঁর জীবনকথা রহস্যে আবৃত। তবে প্রাপ্ত উপাদান থেকে এইটুকু জানা যায় যে তিনি প্রথমজীবনে ছিলেন খুব কৃপণ ও অর্থগৃধ্নু ধনপতি। পরে অবস্থা বিপর্যয়ে পড়ে তিনি অনুতপ্ত চিত্তে ধনৈশ্বর্য পরিত্যাগ করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি সপরিবারে বিজয়নগরে উপনীত হয়ে ব্যাসরায়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর অজস্র সঙ্গীত থেকে অনুমান করা যায় যে তিনি বহু অঞ্চল পরিভ্রমণ করেছেন, সমাজের সকল শ্রেণীর সঙ্গে মিশেছেন এবং ভক্তি মার্গের বাণী প্রচার করেছেন। তাঁর যে গান আমাদের যুগ পর্যন্ত এসে পৌঁচেছে তার সংখ্যা প্রায় এক হাজার। এই সমস্ত গানে ভগবৎ নামের তাৎপর্য, ভিতরকার উপলব্ধির মূল্য এবং ভগবান কৃষ্ণের লীলা বর্ণিত। কোনো কোনো গানে সমকালীন সমাজের সমালোচনা,

মানুষের প্রতি মৃদু ভর্ৎসনা ও উপদেশও শুনিয়েছেন। এই বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে এই একটি ঐক্যসূত্র দেখা যায়— বাহ্ ও অন্তর উপলব্ধির কাছে সমর্পিত আত্মার অকপট প্রতিবেদন। কখনো কখনো এই প্রতিবেদনে কেমন করে বলা হয়েছে তার চেয়েও কী বলা হয়েছে তার মূল্য বেশি। অর্থাৎ ভঙ্গি নয়, বক্তব্যই প্রধান। একথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য ভগবানের স্তুতিমূলক সঙ্গীতে। কারণ এই সঙ্গীতগুলিতে প্রায়শই পাই একগুচ্ছ নামের বা দেবতার কার্যাবলীর সুরারোপিত তালিকা। কখনো কখনো গানের ধুয়াটি অতি চমৎকার, কিন্তু পরবর্তী স্তবকগুলিতে সেই মাধুর্য রক্ষিত হয় নি। পুরন্দরদাসের কবিতার প্রাণ হচ্ছে আত্মার সঙ্গীত এবং হৃদয়ের ভাবাবেগ বইয়ে দেওয়া। প্রকৃত ভক্তের আকাঙ্ক্ষা ও আবেদন, দোষত্রুটি ব্যর্থতা, আনন্দ-উল্লাস পুরন্দরদাসের গানে যথাযথ রূপ পেয়েছে। কতগুলি গান যথার্থই উচ্চ শ্রেণীর। সেই গানগুলিতে যেমন আছে পীড়িত ও সংগ্রামী আত্মার আকাঙ্ক্ষা ও যন্ত্রণা, তেমনি আছে আত্মসমর্থনের আনন্দ আর আছে সংকল্পের দৃঢ়তা ও আত্মোপলব্ধির মহোল্লাস। স্বতন্ত্রভাবে বিচার করলে গানগুলিকে নিঃসঙ্গ নক্ষত্র বলে বোধ হয়, কিন্তু সমগ্র দৃষ্টিতে দেখলে সেই গানগুলি অসংখ্য নক্ষত্রখচিত মহাকাশের মতো গভীর আত্মপ্রকাশের বিস্তৃতি ও ঐশ্বর্য ধারণ করে।

সেই গানগুলির মধ্য থেকে যে আত্মশক্তি নিঃসৃত হয়, একটি গানের উল্লেখ করে তার উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে—'হে প্রভু, আমি যখন তোমার ধ্যান করি, তখন অপরে আমার কী ক্ষতি করতে পারে, আমি যখন তোমার অসীম করুণার দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে সর্বদা তোমারই নাম জপ করি, তখন ওরা আমাকে ঈর্ষ্যা করে কী লাভ করবে? পিপীলিকা কি আত্মাকে আক্রমণ করতে পারে? ছুটন্ত ঘোড়া যে ধুলো উৎক্ষিপ্ত করে তাতে কি সূর্য আচ্ছন্ন হয়ে যায়? ধৈর্যশালীর বিরুদ্ধে কেউ কিছু করতে পারে কি? বাতাস বইলে কি পর্বত কেঁপে ওঠে? দর্পণে প্রতিফলিত টাকা পয়সা দেখে যদি কোনো চোর আয়না ভেঙে টাকা চুরি করতে চায়, তা কি সে পেতে পারে?' এ ধরনের বেশ কিছু সংখ্যক গান আছে যা স্বচ্ছ নির্মল নদীর মতো কবির শক্তিকে প্রতিবিম্বিত করে এবং তাঁর ব্যক্তিত্ব ও রচনাশক্তিকে প্রকাশ করে।

বেশ কয়েকটি সঙ্গীতে কবির সামাজিক সচেতনতার সাক্ষ্য দেয়। যে সমাজকে তিনি দেখেছেন, দেখেছেন তার মিথ্যা ধর্ম ও প্রবঞ্চনা, সেই সমাজের

ছবি তাঁর গানে আঁকা হয়েছে। পার্থিব জীবনের ক্ষণস্থায়ী প্রকৃতির কথা বর্ণনা করে কবি অনাসক্তি প্রচার করলেও তিনি কিন্তু সাধারণ মানুষকে বলেছেন পৃথিবীর ব্যাপারে আগ্রহশীল হতে এবং সৎজীবন-যাপন করতে। যা মানুষকে নশ্বর বস্তু পরিহার করে স্থায়ী সত্যে লেগে থাকতে সাহায্য করবে, তা হল আত্মত্যাগের মন্ত্র এবং অনাসক্তি যোগ। তাঁর 'উদরবৈরাগ্য' গান-খানিতে ধর্মীয় কপটতার উপর তীক্ষ্ণ আক্রমণ আছে। কবি বলেছেন, 'এ তো লোক দেখানো আত্মত্যাগ ছাড়া আর কিছুই নয়। আমাদের প্রভুর প্রতি এই লোকগুলির লেশমাত্র ভক্তি নেই। তারা সকালে উঠে এমন ভাবে কাঁপে যে তারা যেন স্নান করেছে, অথচ তাদের অন্তর দম্ভ, ঈর্ষা ও ক্রোধে কানায় কানায় পূর্ণ। তারা সকলকে তামা পিতলের বাসন সংগ্রহ করে উজ্জ্বল আলো জেলে দেয় যাতে বাসনগুলি চকচক করে। এই রকম মিথ্যা প্রবঞ্চনাময় পূজায় তারা রত থাকে। রুদ্রাক্ষের জপমালা হাতে নিয়ে মুখে মন্ত্র জপ করতে করতে কাপড়ের অবগুণ্ঠনের আড়ালে ঈশ্বরচিন্তার বদলে রমণীচিন্তায় মগ্ন থাকে।' এই সুরে এই গানের মধ্যে আক্রমণ ক্রমশই জোরালো হয়ে উঠেছে। উপযুক্ত চিত্রকল্প এবং শ্রুতিমধুর শব্দসম্ভারে সামাজিক ব্যঙ্গের নিটোল কবিতা এই গানিখানি।

বোধ করি বহুসংখ্যক গানেই ধর্মীয় ও সামাজিক চেতনা জাগ্রত করবার জন্য ভর্ৎসনা ও উপদেশের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। 'আমরা সাঁতার কেটে নিশ্চয়ই পার হব' এবং 'মানবজীবন একটি মহৎ বস্তু, একে নষ্ট করো না'— এই গান দু'খানিতে পুরন্দরদাস কর্মযোগের বাণী শুনিয়ে দেশের মানুষকে জীবনকে ভালবাসতে উচ্চতর স্তরে উঠতে প্রেরণা দিয়েছেন। 'ধর্মই জয়— এই হল প্রকৃত মন্ত্র। এই মন্ত্রের গূঢ়ার্থ জেনে তদনুযায়ী কাজ করো। যে তোমাকে বিষ দেবে তাকে তুমি ভূরিভোজে আপ্যায়িত করো। যে তোমাকে ঈর্ষা করে, তাকে খাদ্য যুগিয়ে বাঁচিয়ো রাখো। যে তোমার বাড়িতে হামলা করে, তার প্রশংসা করো। যে তোমাকে তরবারি দিয়ে আঘাত করে তার নামে তোমার পুত্রের নামকরণ করো।' 'জীবনের দুর্বার নদীতে পর্বতসম অটল থাকো, কিন্তু জ্ঞানীর সম্মুখে ধনুকের মতো নুয়ে পড়ো'—এই ধরনের বহু উক্তি কন্নডিগদের সাধারণ কথাবার্তায় প্রবাদবাক্যের মতো ব্যবহৃত

হয়। এইসব কারণেই পুরন্দরদাস কন্নডবাসীদের হৃদয়-সিংহাসনে শাশ্বত স্থানের অধিকারী।

পুরন্দরদাস ছিলেন মধ্বাচার্যের অনুগামী এবং ব্যাসরায়ের শিষ্য। একথা অস্বীকার করা যায় না যে মন্ত্রের মতবাদ তার পূর্ণ ও দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। এ বিশ্বাস ছিল প্রাণবন্ত ও সক্রিয়, তাই ধর্মমতকে কাব্যে পরিণত করার জন্য বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল উদ্দীপনা। তাই তাঁর কিছু কিছু গানে দেখা যায় কবির দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার ও নমনীয়তা। ব্যাসরায়ের নেতৃত্বে ভক্তি-সাহিত্যকে আলোকোজ্জল করে তিনিই প্রথম 'দাসকূট' (দাসমণ্ডলী)র প্রথম সুবিখ্যাত সদস্য বলে পরিচিত। যাকে বলা হয় 'কর্ণাটকী সঙ্গীত' সেই গীতপদ্ধতির জনক কবি পুরন্দরদাস। তাঁরই কাছ থেকে পরোক্ষ প্রেরণা লাভ করেন পরবর্তী কালের প্রসিদ্ধ ভক্ত এবং প্রখ্যাত কর্ণাটকী গীতিকার ত্যাগরাজ। যাঁরা কর্ণাটকের ঘরে ঘরে কন্নড সংস্কৃতির বাণী পৌঁছে দিয়েছেন এবং সাধারণ মানুষের জীবনে কন্নড সাহিত্যকে জীবন্ত শক্তিরূপে স্থাপিত করেছেন, সেই অতি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের একজন পুরন্দরদাস।

কনকদাস

পুরন্দরদাসের সমকালীন কবি কনকদাসও ছিলেন মহানভক্ত এবং নিজস্ব বিশিষ্টতায় উজ্জল। আভ্যন্তরীণ ও বাহ্য উপাদান অনুযায়ী বলা যায়, মেষ-পালকের ঘরে জন্মগ্রহণ করে নিজস্ব যোগ্যতাবলে সৈন্যাধ্যক্ষের পদে উন্নীত হন। মনে হয় কোনো এক যুদ্ধর সময়ে উচ্চতর জীবনের আহ্বানে তিনি সংসারজীবন ত্যাগ করে পুরন্দরদাসের মতোই বিজয়নগরে গিয়ে ব্যাস-রায়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ধর্ম সম্পর্কে পুরন্দরদাস থেকে কনকদাসের দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক পার্থক্য এই যে প্রথম কবি মধ্বমতকে পুরোপুরি স্বীকার করে তারই মধ্যে যথাশক্তি সাহস ও উদারতার পরিচয় দিয়েছেন, আর কনক-দাস তাঁর প্রথম জীবনে রামানুজ পন্থায় বর্ধিত হয়েও ধর্ম ও সংস্কৃতির সকল প্রকার শুভ প্রভাব গ্রহণে উন্মুখ ছিলেন। সবচেয়ে প্রবল প্রভাব ছিল মধ্বমতের যা তিনি তাঁর গুরুর নির্দেশে অনুসরণ করেছিলেন। পুরন্দরদাসের তুলনায় তিনি বিশেষ মতের প্রতি কম দায়বদ্ধ ছিলেন। তাঁর মন ছিল অধিকতর উদার এবং অপর মতের প্রতি অধিকতর সহিষ্ণু।

ভক্তির সঙ্গীত ছাড়া কনকদাস লৌকিক ছন্দে কিছু দীর্ঘ কবিতাও রচনা করেন। তন্মধ্যে 'রামধান্য চরিত্রে' মৌলিক বিষয় নিয়ে লেখা কন্নড-র অল্প-সংখ্যক কবিতার মধ্যে একটি। বিষয় আর কিছুই নয়—নিজ নিজ শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য চাউল ও বাজরার মধ্যে বিতর্ক। অবশেষে যার উপর বিচারের দায়িত্ব ছিল সেই রাম গরীবের প্রধান খাদ্য বাজরাকেই উৎকৃষ্ট বলে মত প্রকাশ করেন। কবিতাটি কেবল কাল্পনিক নয় প্রতীকীও বটে। বক্তব্য এই যে ভগবান গরীবের সমর্থক, সাধারণ মানুষের সেবক। আর একটি কবিতায় নল-দময়ন্তীর সুপ্রসিদ্ধ আখ্যানটি সরল ও গতিময় ভাষায় বর্ণিত। বর্ণনা পাঠকের মনকে ধরে রাখে। দুঃখদুর্গতির পটভূমিকায় নায়ক-নায়িকার চরিত্র মহত্ত্ব সুপরিস্ফুট। অন্যান্য কাব্য অপেক্ষা 'মোহন তপস্বিনী' নামে তৃতীয় কাব্যখানি দীর্ঘতর। বর্ণনীয় বিষয় ভাগবতে কথিত ঊষা ও অনিরুদ্ধের প্রেমকাহিনী। বইখানি নানাবিধ বর্ণনায় ভরা। কিছু কিছু অংশ সমকালীন বিজয়নগরের জীবন ও মহিমা বর্ণিত। ধর্ম সম্পর্কে কনকদাসের দৃষ্টিভঙ্গি যে কতটা উদার ছিল, কাব্যের শেষে হরি এবং হরের অধীনতার উপর গুরুত্ব আরোপই তার প্রমাণ।

গানের মধ্য দিয়েই কবি কনকদাসের হৃদয়ের প্রকাশ ঘটেছে। এই সমস্ত অধ্যাত্ম সঙ্গীত কবির ঈশ্বর ভক্তিপ্রবাহিনী পূর্ণ বেগে প্রবাহিত। পুরন্দর-দাসের মতো তিনি বিশেষ কোনো ধর্মমত প্রচারে তেমন কোনো আগ্রহ দেখাননি। তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল আন্তরিক ভক্তি এবং ভাবনা ছিল মানবিক মূল্যবোধ। পুরন্দরদাসের মতো তাঁর গানের সংখ্যা এত বেশি নয়, কিন্তু অগ্রণী কবির মতো তাঁরও কিছু গান প্রার্থনামূলক, কিছু গান মিনতিপূর্ণ। কিন্তু প্রধানত তিনি ছিলেন এমন একজন ভক্ত, ঈশ্বরের কাছে আত্মনিবেদন এবং সেই নিবেদনজনিত আনন্দ ছিল তাঁর গানের মর্মকথা। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি গানে তিনি বলেছেন—'এই দেহ তোমার, এই প্রশ্নও তোমার। দিনের পর দিন যে আনন্দ ও দুঃখ আমি লাভ করি তাও তোমার। যে কান মধুর শব্দ এবং বৈদিক কাহিনী শোনে তা তোমার, যে চোখ মোহিনী নারীর সৌন্দর্যের দিকে তাকায় তাও তোমার। যে পঞ্চেন্দ্রিয় মায়ার জালে আবদ্ধ তাও তোমার, হে প্রভু, মানুষ কি তোমার মতো মুক্ত?'

আর একটি গানে তিনি মানুষকে আশ্বাস দিয়ে বলেছেন যে ভগবান

আমাদের সকলের ভালোমন্দ দেখছেন, সুতরাং আমাদের উদ্বেগের কোনো কারণ নেই। মাসে মাসে কনকদাস পুরন্দরদাসের মতোই প্রচারকের ভূমিকা পালন করলেও তাঁর রচনায় স্বাধীন চিন্তা ও বিশ্বজননী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় বেশি। সাধারণ মানুষের জীবনযাপন ও বাগ্‌ভঙ্গি সম্পর্কে তাঁর পরিচয় ছিল গভীর। সমাজ জীবনের দুর্নীতি তুলে ধরতে তিনি কোনো দ্বিধাবোধ করেননি। এ ক্ষেত্রে তিনি সরল ও স্পষ্টবাদী। সমাজজীবনের বিশ্লেষণে তিনি একেবারে গভীরে প্রবেশ করেছেন। যেমন, 'কুল' সম্পর্কে তাঁর গানখানি প্রবল যুক্তির আকারে লেখা। 'ওরা তো বার বার 'কুল কুল' বলে, আমাকে বলো তো যাঁরা প্রকৃত দিব্যসুখ লাভ করেছেন তাঁদের কোন্ কুল? পদ্মফুল তো পঙ্কে জন্মে, তাই তুলে এনে কি ভগবানের পায়ে দেওয়া হয় না? পৃথিবীর দেবতারা (অর্থাৎ ব্রাহ্মণরা) কি গোরুর দেহনিঃসৃত দুধ পান করেন না? তাঁরা কি মৃগকস্তূরী দিয়ে দেহ লেপন করেন না? ভগবান নারায়ণ এবং শিবের কোন্ জাত? আত্মা ও জীবেরই বা কোন্ জাত? ভগবান যখন তোমাকে আশীর্বাদ করেছেন, তখন আর কুলের কথা কেন?' এই গানখানি কনকদাসের প্রতিনিধি স্থানীয়, নিজস্ব ভঙ্গির পরিচায়ক, চিন্তা ও প্রকাশের সাহসিকতা এবং চিত্রকল্পের সঙ্গতি যথার্থই প্রশংসনীয়।

জগন্নাথদাস

পুরন্দরদাস ও কনকদাসের পরে 'দাসকূট'-এর যে সমস্ত দাস কবির আবির্ভাব ঘটেছিল, তাদের মধ্যে জগন্নাথদাসের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জগন্নাথদাস ভক্তিধারাকে আরও প্রশস্ত করে দিলেন। তাঁর মধ্যে সমাবেশ ঘটেছিল সংস্কৃতের প্রতি অনুরাগ এবং মাতৃভাষার প্রতি আস্থার; তাঁর উদার দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে মিলিত হয়েছিল জ্ঞান, ভক্তি ও ঐতিহ্যের শ্রেষ্ঠ বস্তুর প্রতি আনুগত্য। ষট্‌পদী ছন্দে বেশ মনোরম ভঙ্গীতে তিনি মাধ্বমতের ব্যাখ্যা করে 'হরিকথামৃতসার' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। দার্শনিক গ্রন্থ হওয়াতে বইটির বেশির ভাগ অংশ চিন্তার ভারে সহজবোধ্য না হলেও প্রকাশ ভঙ্গি কবিত্বপূর্ণ এবং ভাষা লৌকিক, এমনি কি স্থানে স্থানে ব্যাকরণ সম্মত। সহজ সরল শব্দ, উপযুক্ত উপমা ও সুষম ছন্দপ্রবন্ধের গুণে বইটি মাধ্বদর্শনের

জিজ্ঞাসু সাধারণ মানুষের কাছেও চিত্তাকর্ষক। কয়েকটি 'সন্ধি'তে (প্রকারকে) তাঁর ভক্তির তীব্রতা এবং দৃষ্টিভঙ্গির উদারতা সাধক ও কবি হিসাবে তাঁর গুণাবলীকে অতি উৎকটের স্তরে নিয়ে গেছে। নিম্নলিখিত অংশে তাঁর দৃষ্টির উদারতা লক্ষণীয়। ঈশ্বরের ধ্যান-পরায়ণ মানুষের কাছে 'পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীই দানের যোগ্য, সমস্ত বাক্যই মন্ত্র এবং সমস্ত কাজই পূজা।' অল্পসংখ্যক হলেও জগন্নাথদাসের কীর্তনে এই একটি সুরই প্রধান। ভগবানকে যে কবি সর্বব্যাপী বলে উপলব্ধি করেছিলেন সেই উপলব্ধিই তাঁর মূল সুরের অপরিহার্য অঙ্গ। তাঁর ঈশ্বর-উপলব্ধি ও সমুন্নত ব্যক্তিত্বের প্রকাশ তাঁর একটি গানকে চমৎকার সুসংহত বাক্-প্রতিমায় পরিণত করেছে। গানখানির ধুয়াটা এইরকম: 'যারা বুঝতে পারে ঈশ্বরের পূজা তাদের কাছে কত সহজ, আর যারা বোঝে না তারা হতভাগ্য।' এই গানের কয়েকটি স্তবকের বক্তব্য এইরূপ: 'বিশ্বই তাঁর মণ্ডপ, পৃথিবীটা বেদী, বৃষ্টিই তাঁর 'অভিষেক' (স্নান), চতুর্দিক তাঁর বসন, মলয় বাতাস হচ্ছে সুগন্ধি ধূপ, পৃথিবীর শস্যরাজি তাঁর নৈবেদ্য, দীপ্তিময় বিদ্যুৎ তাঁর কর্পূর আরতি।' কর্ণাটকের উদার সংস্কৃতির প্রতিনিধি জগন্নাথদাস এতদঞ্চলের শ্রেষ্ঠ মনস্বীদের অন্যতম।

সপ্তম অধ্যায়

মধ্যযুগ ২

অন্যান্য ভাগবত কবি

'ভাগবত' (ভক্তি) দৃষ্টি সম্পন্ন বেশ কিছু সংখ্যক কবি যে কুমারব্যাসের প্রেরণায় কন্নড ভাষায় লিখতে শুরু করেন একথা আগেই একবার বলা হয়েছে। বৈদিক ধারার মূল্যবান সাহিত্য তাঁদেরই রচনা। কুমারব্যাসের অনুসরণে প্রথম কবি কুমারবাল্মীকি যিনি পাঁচ হাজারেরও বেশি স্তবকে ভামিনী ষট্‌পদী ছন্দে রামায়ণের কন্নড রূপদান করেন। এই বইটিই বাল্মীকি রামায়ণের পূর্ণাঙ্গ কন্নড সংস্করণ বলে পরিচিতি। অনেক আগে বিমলসূরির জৈন রামায়ণ অবলম্বনে কন্নড রামায়ণ লেখেন নাগচন্দ্র।

কুমারবাল্মীকি প্রধানত সংস্কৃত মহাকবি বাল্মীকিকে বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করার ফলে তাঁর গল্পের কাঠামোর বিশেষ কিছু পরিবর্তন হয়নি, গ্রন্থের আগাগোড়া তিনি রামকে বিষ্ণুর অবতার রূপে চিত্রিত করে তাঁর ব্যাখ্যানে ও বর্ণনায় 'ভাগবত' বা ভক্তি ধারাটিকে বজায় রেখেছেন। তিনি যে রাক্ষস-রাজ রাবণের কিছু কিছু সদ্‌গুণ প্রকাশের চেষ্টা করেছেন, তা বোধ করি জৈনরামায়ণের প্রভাবে। কুমারবাল্মীকি একজন কৃতী শিল্পী ছিলেন সন্দেহ নেই, বহু বিচিত্র চরিত্র নিয়ে বেশ সার্থকভাবে কাহিনী বর্ণনার ক্ষমতা তাঁর ছিল। তাঁর স্তবকগুলি মসৃণ ও পরিচ্ছন্ন। তবে কুমারবাল্মীকি মোটামুটি কাব্যের একই স্তরে বিচরণ করতেন এবং তাঁর পক্ষে উচ্চ শ্রেণীর কবিত্বের প্রর্দশন করা বড় একটা সম্ভব হয়নি। তিম্মণ্ণা নামে কৃষ্ণদেবরায়ের আশ্রিত এক কবি কুমারব্যাসের অসমাপ্ত কাব্য মহাভারত সম্পূর্ণ করেন। তিম্মণ্ণা নিজেই তাঁদের শক্তির তারতম্যের কথা একটি সুন্দর উপমা দিয়ে বলে গেছেন—কুমারব্যাসের স্বর্গীয় গঙ্গা মন্দাকিনীর পাশাপাশি তাঁর নিজের কাব্য যমুনা প্রবাহিত।

প্রায় একই সময়ে ভক্তিমার্গের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ভাগবতের প্রথম কন্নড অনুবাদ হয়। চাতুবিঠলনাথকে গ্রন্থকর্তা বলা হলেও ভাগবতে কন্নড রূপান্তরে আরও কিছু কবির হাত লেগেছিল বলে মনে করা হয়। বইখানি সংস্কৃত

ভাগবতের বিশ্বস্ত অনুসরণ। ২৮০টি 'সন্ধি' বা প্রকরণে বিভক্ত গ্রন্থের স্তবক সংখ্যা ১২ হাজারেরও কিছু বেশি।

লক্ষ্মীশ

কুমারব্যাস মহাভারতের প্রথম দশটি পর্ব এবং তিম্মণ্ণা অবশিষ্ট অংশ কন্নড ভাষায় রূপান্তরিত করেছিলেন। 'জৈমিনি ভারত' অনুবাদ করেন লক্ষ্মীশ। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে জয়লাভের পরে পাণ্ডবেরা যে অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন সে কাহিনী এই জৈমিনি ভারতেই পাওয়া যায়। লক্ষ্মীশ মোটামুটি সংস্কৃতে রচিত 'জৈমিনি ভারত'কে অনুসরণ করলেও তিনি বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে কিছু কিছু অংশ পরিবর্জন ও পরিবর্ধনের দ্বারা তাঁর নির্মাণক্ষম কল্পনাশক্তির বলে বইটিকে অনু-বাদের পর্যায় থেকে অভিযোজনের পর্যায়ে তুলেছেন। মূল বইটি পৌরাণিক ধাঁচের রচনা, লক্ষ্মীশ তাঁর শিল্পকৌশলে একে উচ্চশ্রেণীর কাব্যে পরিণত করেছেন। কন্নড কাব্যজগতের একজন বড় গল্পকথক লক্ষ্মীশ। কাহিনী বা উপাখ্যান যেমনই হোক না কেন, লক্ষ্মীশ তাকে নিজস্ব ভঙ্গিতে একটি উৎকৃষ্ট শিল্পবস্তুতে রূপান্তরিত করেন। সুন্দর চিত্র বর্ণন, চিত্রকল্পের মালাবয়ন, সুরের ঐকতান সৃষ্টি—এইগুলিই তাঁর বৈশিষ্ট্য। তবে কবির শিল্পদক্ষতা কখনও কখনও কৃত্রিমতায় পর্যবসিত হয়। তবে বইটির শ্রেষ্ঠ অংশসমূহ যেন বহুবর্ণরঞ্জিত ফোয়ারার মতো উৎসারিত হয়ে বিস্ময় ও আনন্দ সৃষ্টি করে। লাগামহীন অশ্বের মুক্ত স্বচ্ছন্দ গতির মতো লক্ষ্মীশের কাহিনী মূল পথ ছেড়ে অনেক অলিতে গলিতে সঞ্চরণ করে। 'জৈমিনি ভারত'কে একটি কাহিনী না বলে কাহিনীগুচ্ছ বলাই সমীচীন। কাহিনীগত ঐক্যের পরিবর্তে ভক্তিরসের ঐক্যই বইটিকে বিশিষ্টতা দান করেছে। প্রথম দিকের গল্পগুলির চেয়ে শেষভাগের গল্পগুলিতে কবির বর্ণনাশক্তি পরিণতি লাভ করে। প্রথম গল্প 'সুধন্বা' এবং শেষ গল্প 'চন্দ্রহাস'ই তার দৃষ্টান্ত। কবিবর্ণিত গল্পগুলির মধ্যে 'চন্দ্রহাসই' শ্রেষ্ঠ গল্প।

আর একটি উদাহরণ 'সীতা-পরিত্যাগ' কাহিনী যদিও এই গল্পটি 'জৈমিনি ভারতে' খানিকটা শিথিলভাবে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এই করুণ কাহিনীটি সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন কবি, বিশেষ করে লক্ষ্মণ যখন অনিচ্ছাসত্ত্বেও সীতাকে এই খবরটা জানাতে বাধ্য হল যে একজন রজকের প্রচারিত সীতা কলঙ্কের কথা শুনে রাম সীতাকে ত্যাগ করেছে, তখন সীতার মনোভাব অতি চমৎকার-

রূপে বর্ণিত হয়েছে। সীতার অব্যবহিত প্রতিক্রিয়া প্রচণ্ড মানসিক আঘাত ও দুঃখ, কিন্তু পরক্ষণেই সাহস ও দৃঢ় সংকল্প নিয়ে সে কঠিন বাস্তবের সম্মুখীন হয়। লক্ষ্মণের প্রতি সীতার উক্তি—'তুমি আমাকে এই বনের মধ্যে রেখে কি অযোধ্যায় ফিরে যাবে। আমার গর্ভে সন্তান, তাই আমি আত্মঘাতিনী হব না। আমার অদৃষ্টে যাই ঘটুক আমি সহ্য করব। তুমি আমার শাশুড়ি কৌশল্যাদেবীকে বলো যে রাম নিরপরাধা সীতাকে পরিত্যাগ করেছে।' একথা শোনার পরেও লক্ষ্মণ দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখে সীতা আবার বলল—'তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন? তোমার ফিরে যেতে দেরী হলে রাম কি ক্রুদ্ধ হবে না? আমি বন্য পশুর সাহায্য নিতে পারি। কিন্তু রাম যে একাকী রয়েছেন। রাজা যখন ভুল করেন, তখন তাঁকে সে কথা বলার মতো কেউ আছে কি?' আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি সীতার মন কীভাবে দুই বিপরীত ভাবের মধ্যে দোলায়িত—একদিকে রামের প্রতি ভালোবাসা ও রামের জন্য উদ্বেগ, অন্য দিকে রামের অবিবেচনাপূর্ণ কাজের প্রতিবাদ। পর মুহূর্তেই এই ব্যাপারে অন্য লোকের বাধাদানের ক্ষমতা নেই বলে সীতা বিষণ্ণচিত্তে নিজের অদৃষ্টকে মেনে নিয়ে ব্যঙ্গমিশ্র কণ্ঠে বলল—'না, দয়াময় রামের কোনো অপরাধ নেই।' এইভাবে সীতার অস্থির চিত্তের দ্রুত পরিবর্তনে ও জটিল প্রতিক্রিয়ার কথা কবি পূর্ণ দক্ষতার সঙ্গে বর্ণনা করেছেন।

'চন্দ্রহাস' কাহিনীটি বর্ণনাশিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন হিসাবে প্রশংসনীয়। অন্য কোনো গল্পে পাঠকের আগ্রহ আদ্যন্ত বজায় থাকেনা। ভগবদ্‌বিশ্বাসী অনাথ বালক চন্দ্রহাসের করুণ জীবনের অপরিমেয় দুঃখকষ্ট ঈশ্বরের করুণায় দূর হয়ে যায়। যে ধাত্রী পিতৃ-মাতৃহীন চন্দ্রহাসকে লালন পালন করে মানুষ করে তুলেছে সেই ধাত্রীর চরিত্র নিঃস্বার্থ সেবার প্রতীক হিসাবে যথার্থই মহৎ। মনুষ্য প্রকৃতির অন্ধকার দিকটা উপস্থাপিত করা হয়েছে মন্ত্রীর স্বার্থপর ও দুষ্ট চরিত্রের মধ্য দিয়ে, যে মন্ত্রীর একমাত্র পরাজয় ঘটল চন্দ্রহাসের সৌভাগ্যে। 'সীতা-পরিত্যাগ'-এর মতো এই কাহিনীতেও দেখি দুঃখপীড়িতের জন্য পশুপক্ষীর স্বাভাবিক সহানুভূতি খুব কবিত্ব সহকারে বর্ণিত হয়েছে যার শেষে পাওয়া যায় একটি তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য: 'এখানকার প্রাণিকুলের ভালোবাসা ও সহানুভূতি দেখে আমাদের বলতে ইচ্ছা হয় যে ঈর্ষ্যাকাতর নরনারী অধ্যুষিত শহরের চেয়ে নির্জন বন অনেক ভালো।' কবি লক্ষ্মীশ একাধিক ভগবদ্‌ভক্ত অথচ যোদ্ধা

চরিত্রের বর্ণনা করেছেন, বিভিন্ন ধরনের নারী চরিত্রের চিত্রটিও তাঁর কাব্যে পাই। ছন্দে ও ভাষায় কবি লৌকিক ও চিরায়ত দু রকম পদ্ধতিকে সহজ পাণ্ডিত্যে মিলিয়ে দিয়েছেন। কন্নড সাহিত্যের বিশাল ক্ষেত্রে তিনি একজন প্রতিভাশালী মহৎ গল্প-কথক। সমগ্র দৃষ্টিতে তাঁর রচনাকে মহৎ সাহিত্য বলা সম্ভব না হলেও তার মধ্যে মহৎ শিল্পের কিছু কিছু উপাদান বিদ্যমান।

কুমারব্যাস এবং লক্ষ্মীশ এই দুই কবির প্রভাবে যাঁরা লেখক হিসেবে পরিচিত, তাঁদের মধ্যে গোপকবি 'চিত্রভারত' ও 'নন্দীমাহাত্ম্য' নামে দু'খানি গ্রন্থ রচনা করেছেন। মহাভারতের বৎসালাহরণের কাহিনী নিয়ে 'চিত্রভারত'। এই গ্রন্থে চিত্রকবিতা অর্থাৎ বিচিত্র কারুকার্যমণ্ডিত কবিতা আছে বলে এর নামকরণ 'চিত্রভারত'। 'নন্দীমাহাত্ম্য' বর্ণনীয় বিষয়ে উল্লেখযোগ্য না হলেও কবিত্বগুণে পরিণত শক্তির পরিচায়ক। 'ভাগবত' অর্থাৎ ভক্তিমূলক রচনা-ধারায় আর একজন কবির নাম নাগরস যিনি সর্বপ্রথম কন্নড ভাষায় ভাগবত গ্রন্থের রূপান্তর সাধন করেন। অনুবাদের সঙ্গে তিনি স্তবক ধরে ধরে শঙ্করের অদ্বৈত-দর্শনের অনুসরণে ভাগবতের ব্যাখ্যাও করেছেন। গ্রন্থখানির নাম দিয়েছেন—'বাসুদেবকথামৃত'। কুমারব্যাস থেকে নাগরস পর্যন্ত আমরা লক্ষ্য করি যে কৃষ্ণ তাঁদের অধিকাংশ গ্রন্থের প্রধান চরিত্র না হলেও গ্রন্থের নামকরণ করা হয় কৃষ্ণকথা বলে। স্পষ্টতই ভাগবত ধারার অঙ্গ হিসারে কৃষ্ণভক্তিই প্রদর্শিত। নাগরসের গ্রন্থে গল্প বিশেষ কিছু নেই, যাও আছে তা কৃষ্ণকে নিয়ে নয়। কৃষ্ণ কর্তৃক প্রচারিত জীবনদর্শনই বইটির মুখ্য বিষয়, তবু তার নাম 'বাসুদেবকথামৃত'। যাই হোক, নাগরসের অনুবাদ স্বচ্ছ, সরল ও নির্ভুল।

রত্নাকরবর্ণী

আগেকার যুগের জৈন কবিরা জৈন সাধকদের জীবন চরিত্র নিয়ে কাব্য করতেন। এ যুগে দেখা যায় অন্যরূপ। এ যুগের জৈন কবিরা জীবনী কাব্যের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে অন্যান্য বিষয়ে কাব্য রচনা করে এবং সে কাব্যের ছন্দ দেশীয় এবং ভাষাও খুব সহজ সরল। এমনকি যখন বিষয়বস্তু পুরাতন, তখনও তাঁদের ছন্দ ও রীতি নতুন। তাঁদেরই অগ্রণী একজন হলেন 'জীবন্ধর চরিতে'র রচয়িতা ভাস্কর যিনি ভক্তিরস ও কাব্যরস দু'দিক থেকেই কবি কুমার-ব্যাসের দ্বারা প্রভাবিত। কাহিনী বর্ণনায় তিনি জৈনধারার অনুগামী

কিন্তু ভাবপ্রকাশে ও চিত্রকল্প প্রয়োগে উপনিষদ এবং ভাগবত প্রমুখ ভক্তি গ্রন্থের কাছে ঋণী। মূল জৈনগ্রন্থে এ সবের আভাস মাত্র নেই এবং জৈনধর্ম-মতের সাহায্যে এর ব্যাখ্যা করাও চলে না। দৃষ্টান্তরূপে জিনের প্রশংসায় উচ্চারিত একটি বাক্য উদ্ধৃত করা হল—'সর্বজ্ঞের নামস্মরণ না করলে পার্থিব অস্তিত্বের সমুদ্র কি শুকিয়ে যাবে? নামস্মরণ এবং মুক্তির জন্য ঈশ্বরের কাছে পূর্ণ আত্মা সমর্পণ জৈন আদর্শের সঙ্গে মানায় না। কাহিনী বর্ণনায় কোনো বৈশিষ্ট্য না থাকলেও কবি কল্পনা ও প্রকাশভঙ্গির দিক থেকে বেশ মনোহর গ্রন্থ। লৌকিকধারার অন্যান্য জৈন কবিদের মধ্যে শিশুমায়ণ তাঁর দু'খানি গ্রন্থই যে সুপ্রসিদ্ধ সাংগত্য ছন্দে লিখেছেন সে কথাটা উল্লেখ করার মতো। পরবর্তীকালে তৃতীয় মঙ্গরস ঐ একই ছন্দে 'নেমিজিনেশসঙ্গতি' এবং ষট্পদী ছন্দে অন্যান্য গ্রন্থ রচনা করেন। এই কথাটা বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে প্রাচীন যুগের 'নেমিজিনেশসঙ্গতি'র বিষয়বস্তু নিয়ে একাধিক জৈনকবি চম্পূ কাব্য রচনা করেছিলেন, কিন্তু এ যুগে মঙ্গরস সেই কাহিনী লিখলেন সাংগত্য ছন্দে। এর থেকেই বোঝা যায় এ যুগের জৈন কবিরা, সাধারণ পরিবর্তিত কাব্যধারায় কতটা প্রভাবিত। মহাভারতের জৈনরূপ নিয়ে ষট্পদী ছন্দে যিনি কন্নড ভাষায় সর্বপ্রথম গ্রন্থ রচনা করেন, তাঁর নাম শাল্ব।

এ যুগের জৈন কবিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন রত্নাকরবর্ণী। তিনি সাংগত্য নামক দেশীয় ছন্দে অখণ্ড জীবন দর্শন পরিবেশন করে কন্নড কাব্যসাহিত্যের সমৃদ্ধি ঘটিয়েছেন বলে অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের পতন যখন আসন্ন, এমনি সময়ে কর্ণাটকের পশ্চিম উপকূলে মুচাবিদরে নামক স্থানে এক ক্ষত্রিয় পরিবারে কবির জন্ম। তিনি যে অঞ্চলে জন্ম নিয়ে বড় হয়ে উঠেছিলেন, সেটি জৈনধর্মের একটি প্রাণকেন্দ্র ছিল। জৈনতত্ত্বের বিশেষ শিক্ষাসহ তিনি কাব্য ও দর্শন নিয়ে পড়াশোনা করেন। মনে হয় তিনি উপযুক্ত গুরুর নির্দেশে যোগশাস্ত্রের অধ্যয়ন ও চর্চাও করেছিলেন। তাঁর রোমাঞ্চকর প্রেমের ফলে ধর্মমত পরিবর্তনের কাহিনী আজ পর্যন্ত প্রচলিত। এই গল্পের সত্যতা যাই থাক, আভ্যন্তর প্রমাণ থেকে একথা নিশ্চিত বলেই মনে হয় যে তিনি বিশুদ্ধ রোম্যান্টিক প্রকৃতির হলেও ছন্নছাড়া ভবঘুরে ছিলেন না। অখণ্ড জীবন দৃষ্টি লাভে সমুৎসক তিনি ছিলেন স্বাধীনচেতা মানুষ। জৈনদর্শন ও নীতিকথা নিয়ে তিনি অনেকগুলি

সঙ্গীত ও 'শতক' রচনা করেছেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'ভরতেশবৈভব'। প্রথম তীর্থঙ্কর পুরুদেবের খ্যাতিমান পুত্র ভারতেশ ও বাহুবুলির জীবন ও চরিত্র তাঁদের পিতৃদেবের জীবনের অঙ্গীভূত হয়ে ছিল। কিন্তু রত্নাকরবর্ণীর পূর্বে ভারতেশকে নায়ক করে সবিস্তারে তাঁর চরিত্র-কথা বলা হয়নি। আলোচ্য বইটির বিশেষত্ব এই যে ভারতেশের চরিত্র পরিকল্পনায় কবি আপাত বিরোধী বস্তুর সমন্বয়কারী যে পূর্ণ জীবনের স্বপ্ন দেখতেন সেই স্বপ্নকে অতি চমৎকারভাবে সৃজনশীল মূর্তিতে রূপায়িত করেন। কাহিনীর মোটামুটি খসড়ার জন্য তিনি সুপ্রসিদ্ধ জৈন পুরাণগুলির কাছে ঋণী হলেও সেই পৌরাণিক উপাদানের ব্যবহারে তিনি তাঁর চিন্তা ও উপলব্ধিকে এমনভাবে প্রয়োগ করেন যে তাঁর গ্রন্থখানি বিস্ময়কর জীবনদৃষ্টি এবং চিত্রকল্পের ঐশ্বর্যে একখানি অতুলনীয় সৃষ্টি হয়ে ওঠে এবং সে সৃষ্টি মূলগ্রন্থকে বহুদূর পশ্চাতে ফেলে গেছে। তিনি যে ৮০টি 'সন্ধি'র (প্রকরণের) এবং দশহাজার স্তবকের এই গ্রন্থখানিকে মাত্র নয় মাসের মধ্যে লিখে ফেলেছেন এবং শব্দের সাহায্যে একটি বিশাল গভীর চরিত্র খোদাই করে তুলতে পেরেছেন সেটি বড় কম আশ্চর্যের কথা নয়।

এই কাব্যে গল্পাংশ খুবই সামান্য। কাব্যখানি একটি ব্যক্তিত্বকে, বরং বলা যায়, একটি আদর্শ পুরুষের স্বপ্নকে কেন্দ্র করে লিখিত। কবি-কথানুসারে এই কাব্যের বর্ণনীয় বিষয় একজন রাজাধিরাজের গৌরবের কথা, যে রাজা অপরিসীম রাজশক্তি ভোগ করে, জৈনযোগীরূপে মুহূর্তের মধ্যে তাঁর সমস্ত কর্মকে দগ্ধ করে মুক্তি লাভ করেন। রাজার গৌরব কোনো পার্থিব বস্তু নয়, আধ্যাত্মিক বস্তু। একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনের স্বাভাবিক পরিণাম যা হতে পারে, এ সেই গৌরব—ত্যাগ ও ভোগের সমন্বয়ের গৌরব। এক অর্থে, কাব্যখানির মধ্যে মহাকাব্যের বিস্তার বা গঠন কিছুই নেই। সর্বপ্রকার অবস্থায় নায়কের দৈনন্দিন জীবনের কাজকর্মই অল্পবিস্তর বর্ণিত। কিন্তু নায়কের অখণ্ড জীবন-বোধ সমস্ত কাব্যে পরিব্যাপ্ত হয়ে প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি ব্যাপারকেও তাৎপর্য-মণ্ডিত করেছে। প্রথম তীর্থঙ্করের জ্যেষ্ঠ পুত্ররূপে তিনি ৯৬০০০ পত্নীসহ সুখভোগের মধ্যে জীবন কাটাচ্ছিলেন, এমন সময়ে তাঁর কানে এল দিগ্-বিজয়ের ডাক। বিজয় অভিযানে বেরিয়ে একের পর এক জয়লাভ করে নায়ক যখন সমস্ত দেশের পরাজিত রাজাদের প্রদত্ত উপহারাদি সমেত তাঁর রাজ-

ধানীতে প্রত্যাবর্তন করছিলেন, তখন নগরীর দুয়ার মুখে তাঁর চক্র হঠাৎ থেমে গেল। অর্থাৎ তাঁর ছোটভাই বাহুবলি যোদ্ধা হিসাবে জ্যেষ্ঠের প্রাধান্য মেনে নিতে প্রস্তুত নয়। ভারতেশ তাঁর ভাইকে ডেকে মৃদু ও মিষ্টি কথায় বুঝিয়ে যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত করলেন। এ জয় অহিংসার জয়। ফলস্বরূপ, বাহুবলি সন্ন্যাসী হয়ে তপস্যার জন্য বনে প্রস্থান করেন। ভরতেশ পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে রাজধানীতে ফিরে এলেন এবং কয়েক বছর পরে তিনিও সংসার জীবন পরিত্যাগ করে তপশ্চর্যায় মগ্ন থেকে মুক্তিলাভ করেন।

গল্পটি প্রায় পুরোপুরি মূল জৈন পুরাণ থেকে গৃহীত। কিন্তু কোথাও ভারতেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের কোনো আভাস নেই। রত্নাকরের বিশেষ কৃতিত্ব এই যে, তিনি তাঁর স্বপ্নের ধ্যানে সেই ব্যক্তিত্বের ধারণা করে তাকে যথাসম্ভব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে চিত্রিত করেছেন। এই চরিত্র-চিত্রই প্রধানত পাই তাঁর গ্রন্থের 'ভোগবিজয়' নামক প্রথমভাগে। তাঁর প্রতিভার এই অমূল্য সৃষ্টির জন্য তিনি সকলের প্রশংসাভাজন। একজন আদর্শ নরপতিরূপে ভারতেশ তাঁর রাজসভায় উপবিষ্ট হয়ে কর্তব্য পালনে রত—এইরূপ বর্ণনা দিয়ে কাব্যের সূচনা। মূল পুরাণ থেকে একটা বড় পরিবর্তন দেখা যায় ভারতেশ ও বাহুবলির সংঘর্ষে। মূল পুরাণে আছে, দুই ভায়ের মধ্যে রীতিমত যুদ্ধ বাধে এবং সেই যুদ্ধে বাহুবলি তার জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে পরাজিত করেও ভাইয়ের রাজ্যলাভের আকাঙ্ক্ষা ও অহংকার দেখে বনে গমন করে। রত্নাকরের কাব্যে দেখি ভারতেশ যুদ্ধ করেন নি। তিনি মধুর বাক্যে বাহুবলিকে যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত করেন। স্পষ্টই বোঝা যায় মূল পুরাণ থেকে গ্রহণ করার সময়ে তিনি বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করে যেখানে তাঁর নায়ক চরিত্রের অপকর্ষ ঘটে সেখানে পরিবর্তন ঘটিয়েছেন।

গল্পের আরম্ভ থেকেই কবি বার বার বলেছেন যে ভরত কোনো সাধারণ পুরুষ ছিলেন না, তিনি পূর্ণ ব্যক্তিত্বের প্রতীক। তাঁর অতি মানবিক বৈশিষ্ট্য-গুলি এবং তাঁর পত্নীদের অবিশ্বাস্য সংখ্যা কেবল প্রতীকী চরিত্র হিসাবেই সমর্থন করা চলে। রত্নাকর পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনার অনুরাগী ছিলেন, ছিলেন শব্দশিল্পী। ভারতেশের চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলিও তাই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণিত। কেবল কবি রত্নাকরের কথায় নয়, রাজসভার কবিগোষ্ঠী, গায়কবৃন্দ, পত্নীবর্গ এমনকি রাজবাড়ির তোতাপাখির মুখ দিয়েও কবি তাঁর নায়কের মহৎ গুণাবলী

বর্ণনা করে ঐশ্বর্যময় চিত্রকল্পাদি প্রয়োগ করে তাঁর জীবন-স্বপ্নকে রূপায়িত করেছেন।

উদাহরণস্বরূপ, কবি এক জায়গায় বলেছেন—'ভারতেশকে দেখে মনে হয় তিনি যেন ইন্দ্রিয়াসক্তির জালে আবদ্ধ, কিন্তু আসলে তিনি কখনোই ভোগে জড়িয়ে পড়েন নি। তাঁকে দুর্বিনীত উদ্ধত মনে হলেও তিনি কখনো সেরূপ ছিলেন না। অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে জীবনের সমগ্র সত্যকে যে দেখতে পেরেছে এ সব তার লীলামাত্র। তাঁকে দেখলে কখনো মনে হয় দুর্ভেদ্য দুর্গ, কখনো বা উন্মুক্ত পল্লীপ্রান্তর। তাঁর পত্নীদের চোখে তিনি ছিলেন তীক্ষ্ণ পুষ্পশরের তুল্য আবার কখনো মূর্ত স্বর্গের সমান।' কবি এই ভাবে তাঁর জীবন-স্বপ্নের বর্ণনা দিয়েছেন—'রাজা যেমন ভোগের চিন্তা করবে তেমনি করবে আত্মার সঙ্গে তার সাযুজ্যের কথা। সে জীবনকে উপভোগ করুক কিন্তু তার ধর্মচিন্তা বিসর্জন দিয়ে নয়। তার প্রাণে অনেক আকাঙ্ক্ষা থাকুক, কিন্তু সে অন্তরে অন্তরে থাকবে অনাসক্ত। সে কেবল উপযুক্ত পাত্রে দান করবে। রাজা বাক্যকুশলী হোক, কিন্তু তাকে বাক্‌সংযম বা নীরবতার মূল্যও বুঝতে হবে। একই সঙ্গে সে রাজা ও ফকির হয়ে থাকবে। যেমন একজন কুমারী বাদ্য সঙ্গীতের তালে তালে নৃত্য করতে থাকলেও তার মন নিবদ্ধ থাকে মাথার কলসীর উপর এবং সেই সঙ্গে মাটিতে তার পদক্ষেপের প্রতি, তেমনি রাজা যখন পার্থিব বিষয় নিয়ে মগ্ন থাকবে তখনো তার মন যেন সর্বদাই জীবনের উচ্চতর মূল্যগুলি সম্পর্কে জাগ্রত থাকে।'

ভরত দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি খুঁটিনাটি কাজের সময়েও বাক্যে ও কর্মে উচ্চমার্গে অবস্থান করতেন। রাজা, শিষ্য, স্বামী, পুত্র, এবং ভাই হিসাবে স্বতঃস্ফূর্ত কর্তব্যবোধ ও ঔচিত্যবোধের প্রেরণায় তিনি তাঁর বিভিন্ন কর্তব্য পালন করতেন। কবি রত্নাকর তাঁর কল্পনা অনুযায়ী যে পূর্ণ মানুষের চরিত্র-চিত্রণ করেছেন, তাতে তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির বিশেষ প্রকাশরূপে কন্নড চরিত্রের শ্রেষ্ঠ ভাবমূর্তি তুলে ধরেছেন। যেমন, রাজারূপে তাঁর কর্তব্য সমাপনের পরে রাজকীয় মর্যাদার সমস্ত নিদর্শন সরিয়ে রেখে তপস্বী অতিথিদের সৎকার বিধানের জন্য রাজপ্রাসাদের সদরে সাধারণ বেশে অপেক্ষা করতেন। রাজা যখন তাঁর সম্মানিত অতিথিদের সেবা-পরিচর্যা করতেন, তখন কোনো রাজভৃত্য রাজার সেবায় নিযুক্ত থাকত না। রাজার কোনো পার্ষদ তখন তাঁর

চারপাশে ঘুরে বেড়াতে কিংবা রাজাকে প্রণাম জানাতে পারত না। যখন তিনি একটা স্তম্ভে হেলান দিয়ে, একাকী দাঁড়িয়ে থেকে প্রত্যাশিত অতিথিদের জন্য নাকের উপর আঙুল রেখে চতুর্দিক নিরীক্ষণ করতেন, তখন মনে হত তিনি যেন এই এক গভীর চিন্তায় মগ্ন কখন তিনি পার্থিব জীবনের নদী পার হয়ে মুক্তিলাভে সমর্থ হবেন। এইভাবে কবি সর্বদাই বিশেষ যত্নশীল ছিলেন যাতে রাজকর্তব্যের প্রতিটি ক্ষুদ্র অংশ যেন সেই সমুন্নত ব্যক্তির একটি মহিমান্বিত ভাবমূর্তি গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

ভরতের অসাধারণ জীবনে একটা অদ্ভুত ব্যাপার হল তাঁর অত্যধিক পত্নীসংখ্যা। প্রশ্ন হতে পারে একজন আদর্শ মানুষের যদি এত স্ত্রীই থাকে, তাহলে সেটা কোন ধরনের আদর্শ লোকের সম্মুখে তুলে ধরতে পারে? একথা বলায় কোনো সান্ত্বনা নেই যে কবি এক্ষেত্রে মূলের অনুসরণ করেছেন, কারণ কবি তো অন্ধ অনুকারক ছিলেন না। ভরতের দাম্পত্য প্রেমের ক্ষেত্রেও অসীম শক্তি ধারণের ক্ষমতা প্রতীক শিল্প কৌশল হিসাবেই অর্থবান হয়ে ওঠে। কবি বোধ হয় এই কথাই বোঝাতে চান যে আধ্যাত্মিক ও সমন্বয়ী দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে বহুপত্নীকে নিয়ে চলা সহজ, কিন্তু যার সেই দৃষ্টি নেই এবং সাফল্যের চাবিকাঠি যার অনায়ত্ত তার পক্ষে একজন স্ত্রীর সঙ্গেও মিলেমিশে থাকা কঠিন। বিভিন্ন উপলক্ষে ভরত-পত্নীরা স্বামীর উৎকৃষ্ট গুণসমূহের প্রশংসা করত। 'আকাশের একটি সূর্যের প্রতিবিম্ব যেমন জলপূর্ণ বিভিন্ন কলসীর মধ্যে দেখা যায়, রাজাও তেমনি সকল স্ত্রীর হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছেন। হরিণ ও বাঘ যেমন মুনিঋষি অধ্যুষিত আশ্রম অরণ্যে শান্তিতে বাস করে, রাজার পত্নীরাও তেমনি পারস্পরিক ঈর্ষ্যাবিদ্বেষ না করে বাস করত এবং স্বামীকে ভালবাসত। বলত যে রাজার ভালোবাসায় তারা পিত্রালয়ের কথা বিস্মৃত হয়, নিদ্রা ভুলে গিয়ে সর্বদা আনন্দ সাগরে মগ্ন থাকত।' এইভাবে কবি সুযোগ পেলেই দেখিয়েছেন রাজার পত্নীরা কত সুখে ছিল, স্বামীকে খাইয়ে কীভাবে তারা অন্ন গ্রহণ করত এবং রাজকক্ষে উপস্থিত হয়ে তাঁকে উপহার দ্রব্যাদি প্রদানের জন্য রানীরা যখন সিঁড়ি বেয়ে দ্বিতলে আরোহণ করত তখনও তারা কীভাবে চিন্তাহীন হাস্যকৌতুকে ছেলেমানুষি করত। রাজার সঙ্গে এইসব রমণীদের কামকেলির উজ্জ্বল বর্ণনাও কিছু কম নয়। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটাই উচ্চগ্রামে বাঁধা। যাকে বলা যায়

অদ্ভুত ও অশ্লীল সেই সমস্ত অংশও বর্ণনাগুণে মর্যাদাপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কবির অভিপ্রায় এই যে সংযমসীমার উপলব্ধি হলে দৈহিক সুখও অমর্যাদাকর নয়। কাব্যটির বিভিন্ন স্থানে একাধিকবার যে নৃত্যগীত নাট্যের বর্ণনা রয়েছে, তাতে লক্ষ্য করা যায় কবির অপার উৎসাহ, অন্তর্দৃষ্টি এবং বেপরোয়া ভাব। সঙ্গীতের আনন্দ বর্ণিত হয়েছে এইভাবে—'নায়িকারা এমন মধুর ও উচ্চকণ্ঠে গান গাইত শুনে মনে হত যেন তারা সঙ্গীত সমুদ্রের তলদেশ থেকে সংগৃহীত রাশিরাশি মুক্তো মুখ দিয়ে ছড়িয়ে দিচ্ছে। রাগরাগিণীর বিকাশে এমন তান বিস্তার করত যেন তারা পরিপূর্ণ অন্তর থেকে চতুর্দিকে গীতসুধা ছিটিয়ে দিচ্ছে। যখন কেউ বীণা বাজাত মনে হত যেন সে তার অনিন্দ্যসুন্দর অঙ্গুলি দিয়ে দেবী সরস্বতীকে জাগিয়ে তার সঙ্গীত সাধনায় দেবীর সাহায্য প্রার্থনা করছে।'

আনন্দ-উৎসব শেষ হলে নায়িকা ও ভৃত্যকুলের প্রস্থান। তৎক্ষণাৎ রাজা ভরত নিজের মধ্যে আত্মসংবরণ করে এমনভাবে ধ্যাননিবিষ্ট হতেন যে দেখে মনে হত যেন তিনি হাজার হাজার বছর ধরে তপশ্চর্যায় রত। তাঁর ইন্দ্রিয়-সমূহ তাঁর আজ্ঞাধীন ভৃত্যতুল্য। অন্নগ্রহণ করেও তিনি যেন উপবাসী, বিষয়ভোগী হয়েও কৌমার্যব্রতধারী, রাজা হয়েও অনাসক্ত যোগী, এমন এক তপস্বী তিনি যাঁর মস্তক কেশরাজিতে পূর্ণ হলেও মন সমস্ত কু-বাসনা থেকে মুক্ত।

সম্রাট হয়েও ভরতেশের মাতৃভক্তি অসাধারণ। একবার একদিন সস্ত্রীক উপবাসী থেকে রাজা তাঁর রাণীদের মাতৃপরিচর্যায় পাঠিয়ে দিয়ে স্বয়ং গমনোদ্যত হলে রাজমাতা সংবাদ শুনে পুত্রবধূদের তিরস্কার করে উপবাসী পুত্রের কষ্ট ও ক্লান্তির আশঙ্কা করে স্বয়ং রাজভবনের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। পথে মাতাপুত্রের সাক্ষাৎ ঘটে। সসম্মানে মায়ের চরণে প্রণাম করে রাজা রাজপ্রাসাদে মাকে নিয়ে গিয়ে উপবাস অন্তে মায়ের পরিচর্যা করেন। অতঃপর তাঁকে দোলন-পালঙ্কে শুইয়ে দিয়ে এমন ভাবে দোলাতে থাকেন যেন তিনি শৈশবে মায়ের হাতে দোলনায় বড় হয়ে ওঠার ঋণ পরিশোধের চেষ্টা করছিলেন। এইভাবে একটি অত্যন্ত সামান্য ঘটনাকে বিশেষভাবে রোমাঞ্চকর ও অর্থবহ করে তোলা হয়েছে।

ভরত ও বাহুবলির উপাখ্যানের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে

ভরতের মধুর যুক্তি পরামর্শ তাঁর উন্নত প্রকৃতির উপযোগী। তিনি বাহুবলিকে বলেছিলেন—'এমন কী কারণ ঘটেছে যার জন্য আমরা পরস্পরের সঙ্গে কলহ করব? আমিও তোমার কোনো বস্তু অপহরণ করিনি, তুমিও আমার কোনো জিনিস চুরি কর নি। আমি যে রাজা হয়েছি আর তুমি হয়েছ যুবরাজ তা আমাদের আরাধ্য পিতৃদেবতার ইচ্ছা অনুযায়ী। আমরা কি পরস্পরের শত্রু? আমরা জিনপুত্র। আমরা যদি পরস্পরের সঙ্গে কলহ করি তবে আমরা আগামী প্রজন্মের জন্য বিশ্বাসঘাতকতার অনপনেয় নিদর্শন রেখে যাব। আমাকে জয় করে তুমি কি যশস্বী হবে? অথবা তোমাকে পরাভূত করে আমি যশস্বী হব? তুমি আমার সঙ্গে জয়লাভের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করতে এসেছ, তাই নয় কি? নিম্নশ্রেণীর লোকের মতো যুদ্ধের প্রয়োজন কী? আমি মেনে নিচ্ছি তুমিই বিজেতা আর আমি পরাজিত।' রাজার এই কথা শুনে তাঁর সামন্ত ও মন্ত্রিবর্গ বলে উঠল—'আমাদের প্রভুর কি কখনো পরাজয় হতে পারে?' স্মিতহাস্যে ভরত বললেন, 'কেন নয়?' মন্মথের হাতে কার না পরাজয় ঘটে।' জৈন ঐতিহ্য অনুযায়ী বাহুবলি হল মদন দেবতা। ভরতের মধুর ও কোমল কথা শুনে গরুড়মন্ত্রে যেমন সাপের বিষ ঝরে যায় বাহুবলির ক্রোধও তেমনি দূর হয়ে তার হৃদয় শান্ত হয়ে গেল।

এই কাব্যে যে বর্ণনা প্রাচুর্য রয়েছে তা ঠিক মামুলী নয়। কবির প্রধান শিল্পগুণ হল একটি মহৎ চরিত্রের মধ্য দিয়ে তাঁর নিজস্ব জীবনদৃষ্টি বর্ণনার জন্য উপযুক্ত প্রতীক ও চিত্রকর্ম খুঁজে বের করা। এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্যই কবির সমস্ত বর্ণনা নিয়োজিত। গৌণ অনুপুঙ্খ সম্পর্কেও তিনি বিশেষভাবে সচেতন হলেও অতীত কবিদের প্রথানুগত্য নিয়ে আদৌ উদ্বিগ্ন নন। ভাষা ও ছন্দের উপর তাঁর দখল অসাধারণ এবং এই দুয়ের স্বতঃস্ফূর্ত মিশ্রণের মূল আছে তাঁর সমন্বয়মূলক দৃষ্টিভঙ্গি। লোক-সংগীতের সুর থেকে উদ্‌ভূত সাংগত্য ছন্দের চরম উৎকর্ষ ঘটেছে তাঁর রচনায়। জনপ্রচলিত বাগ্‌ধারার ঐশ্বর্য ও স্বাভাবিকতাই তাঁর রচনারীতির প্রাণ। তাঁর 'ভরতেশবৈভব' কাব্য কেবল রাজা ভরতেশেরই মহিমা প্রকাশ করে নি, এ কাব্য কবির জীবনদৃষ্টি নিয়ে লেখা প্রতীকী সঙ্গীত—তাঁর নিজস্ব মহাগীতিকাব্য। কবি রত্নাকরবর্ণী কন্নড ভাষায় একজন অত্যুন্নত কবি; পম্প, হরিহর এবং কুমার-ব্যাসের সমপর্যায়ভুক্ত হওয়ার যোগ্য।

অষ্টম অধ্যায়

মধ্যযুগ ৩

ষড়ক্ষরদেব ও অন্যান্য কবি

ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের পতনের পরে কর্ণাটকের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে অন্ধকার নেমে আসে। পরস্বাপহারী চোরের দল যেমন অন্ধকারে মিলিত হয়, তেমনি বাইরের কিছু অশুভ শক্তি কন্নড দেশ অধিকার করে তার সম্পদ ও গৌরব হরণের জন্য ষড়যন্ত্র করে। তারা উত্তর কর্ণাটকের মনোবল ভেঙে দিতে সমর্থ হলেও সৌভাগ্যক্রমে দক্ষিণ কর্ণাটকের অধিকাংশ অঞ্চল অক্ষুন্ন থাকে। মাঝে মাঝে অবশ্য সেই সব অঞ্চলেও বিপদ দেখা দেয়। তবে মহীশূর রাজ্যের সৌভাগ্য ও শৌর্যের গুণে কর্ণাটকের রত্নসিংহাসন অম্লান গৌরবে শোভা পেতে থাকে। এই রাজাদের উপর পৃষ্টপোষকতায় কন্নড ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতির অভ্যুদয় ঘটে।

ষড়ক্ষরী

অষ্টাদশ শতাব্দীর সূচনায় মহীশূর-রাজ চিকদেবরাজ নানা বিদ্যা ও কলাশিল্পের মহান্ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁরই রাজত্বকালে কন্নড-সাহিত্য নব উদ্দীপনায় প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। দীর্ঘকাল যাবৎ অপ্রচলিত চিরায়ত কাব্য আবার রচিত হতে আরম্ভ করে। কোকিল যেমন সর্বপ্রথম বসন্তের আবির্ভাব ঘোষণা করে, তেমনি বীরশৈব সন্ন্যাসী কবি ষড়ক্ষরী তাঁর রচনার দ্বারা চম্পূ-কাব্যের পুনরভ্যুদয় ঘোষণা করেন। সহজাত কবিপ্রতিভা ও অসাধারণ পাণ্ডিত্যের বলে তিনি চিরায়ত কাব্যের গুণবিশিষ্ট তিনখানি গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ 'রাজশেখরবিলাস' গ্রন্থে এমন এক ভক্তের কাহিনী বর্ণিত যিনি ভগবান শিবের নাম-মাহাত্ম্য প্রচার করেন। এই একই বিষয় নিয়ে পূর্বেও গ্রন্থ রচিত হয়েছে, কিন্তু 'রাজশেখরবিলাস'-এর মতো তা গুরুত্ব লাভ করেনি। কবি স্পষ্টতই ভক্তিমূলক বিষয়বস্তু নির্বাচনে কবি হরিহরকে অনুসরণ করেছেন, কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে তিনি পূর্বতন চম্পূলেখকদের অনুগামী।

বইটির গল্পাংশ অতি সামান্য এবং অত্যধিক পত্রভারে অবনমিত কুঞ্জের

মতো গ্রন্থখানি সুদীর্ঘ বর্ণনা বাহুল্যে ভারাক্রান্ত। গল্পের গতি মন্থর ও পাঠকের কৌতূহল বর্ধনের আদৌ সহায়ক নয়। একমাত্র শেষাংশে কিছু ভিন্নরূপ দেখা দেয় যেখানে তিরুকোলবিনচি-র উপখ্যানটি বর্ণিত। একদিন রাজকুমার রাজশেখর তার বন্ধুকে নিয়ে রাজপথে অশ্বচালনা করছিলেন। তখন পথিপার্শ্বস্থ একটি গৃহ থেকে রাস্তায় খেলার জন্য ছুটে আসা তিরুকোল-বিনাচির পাঁচ বছরের শিশু রাজপুত্রের সঙ্গী মন্ত্রীর ঘোড়ার পায়ের তলে পিষ্ট হয়ে যায়। শিশুপুত্রের মা ঘরে ফিরে এই ভয়াবহ দুর্ঘটনায় শোকাহত হয়। পুত্রের মৃত্যুতে মায়ের বিলাপ অতি করুণ ও মর্মস্পর্শীরূপে প্রকাশ পেয়েছে। সমগ্রভাবে বইটিতে কবির নৈপুণ্য ও উদ্‌ভাবনী শক্তির সঙ্গে উচ্চ কবিপ্রতিভার পরিচয় প্রকাশিত। কবির প্রথম রচনা হলেও বইটিতে বিস্ময়কর কাব্যগুণ বর্তমান তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ 'শবরশঙ্করবিলাস'। এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু অর্জুনের শৌর্য ও তপস্যা শক্তি পরীক্ষার জন্য কিরাতবেশে ভগবান শিবের আবির্ভাব এবং পরিশেষে অর্জুনকে পাশুপত অস্ত্রপ্রদান। এই গ্রন্থেও গল্পাংশ সামান্য এবং বর্ণনা প্রচুর। প্রথম গ্রন্থের তুলনায় এই দ্বিতীয় গ্রন্থে সংস্কৃত নির্ভর এবং দ্ব্যর্থবোধক শব্দসংখ্যক বেশি! কিরাত যখন দ্রুতগামী শূকরের পশ্চাদ্ধাবন করে তখন গল্পের গতিও কিছু দ্রুত হয়ে ওঠে। কিরাতবেশী শিব এবং তপস্বীবেশী অর্জুনের সংলাপ, পরস্পরের যুদ্ধ এবং অবশেষে পরিবার লাভ এই গ্রন্থের সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক অংশ। সমগ্রভাবে দেখলে বইটি আকারে ও গুণগতমানে মাঝারি ধরনের। কবির তৃতীয় গ্রন্থ চম্পূ আকারে সাধক বসবেশ্বরের জীবনী।

মহীশূরের ওডেয়র রাজাদের আমলে রচিত কন্নড সাহিত্যের একটি বৈশিষ্ট্য হল সোজাসুজি ইতিহাসের বিষয় নিয়ে রচিত কাব্যের সংখ্যাধিক্য। চিরায়ত যুগের কবি পম্প এবং অন্যান্যদের ধর্মনিরপেক্ষ লৌকিক রচনায়ও অবশ্য ইতিহাস লুকিয়ে আছে, কিন্তু কাব্যের আকারে ইতিহাস রচনা তাঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না। সেই জাতীয় রচনা কেবল আলোচ্য যুগেই পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যায়'— সাংগত্য ছন্দে লিখিত গোবিন্দবৈদ্যের 'কণ্ঠীরাও নরসিংহরাজাবিজয়' গ্রন্থের কথা। এই গ্রন্থ মূলত একখানি ঐতিহাসিক কাব্য—মহীশূর রাজবংশের অন্যতম শাসক কণ্ঠীরাও নরসরাজের জীবন ও কীর্তিবিষয়ক কাব্য। বইখানির লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল সেই অশান্তির

দিনগুলিতে রাজনৈতিক অবস্থা এবং জনসাধারণের জীবনযাত্রার বাস্তব ও জীবন্ত বর্ণনা। এই গ্রন্থে যদিও বর্ণনীয় বিষয় বা চরিত্র চিত্রণের সুযোগ কম, তথাপি এর কাব্যোৎকর্ষ উপেক্ষণীয় নয়।

শ্রীবৈষ্ণব সাহিত্য

এ যুগের আর একটি আকর্ষক বৈশিষ্ট্য হল শ্রীবৈষ্ণব মতাদর্শে অনুপ্রাণিত ভক্তি সাহিত্যের উৎসারণ। যদিও এই ধর্মমত বৈদিক ঐতিহ্যের আচার্য-ত্রয়ীর অন্যতম দ্বাদশ শতাব্দীর রামানুজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়ে তাঁর সমকালেই কর্ণাটকে বিস্তার লাভ করে, তথাপি এই ধর্মমত অবলম্বনে তখনই কোনো সাহিত্য গড়ে ওঠে নি। মহীশূর শাসকদের, বিশেষ করে চিকদেবরাজের, পৃষ্ঠপোষকতায় পুরানো চিরায়ত সাহিত্যের পুনরাবির্ভাব ঘটে এবং এই সাহিত্যের বিষয়বস্তু ও দার্শনিক তত্ত্ব প্রধানত শ্রীবৈষ্ণব মতের অনুযায়ী। কথিত আছে, চিকদেবরাজ স্বয়ং 'চিকদেবরাজ বিন্নপ' এবং 'গীতগোপাল' নামে দু'খানি গ্রন্থ রচনা করেন। প্রথমখানি ছন্দস্পন্দযুক্ত গদ্যে রচিত, দ্বিতীয়খানি সঙ্গীত আকারে গ্রথিত। এমনও হতে পারে এই দুটি চিকদেবরাজের মন্ত্রী, প্রসিদ্ধ কবি ও পণ্ডিত তিরুমল রায়ের রচনা। রাজা স্বয়ং যদি গ্রন্থকার নাও হন, একথা নিঃসন্দেহ যে তিনি তিরুমল রায়, সিংগ-রায়, চিকুপাধ্যায় এবং হোন্নম্ম প্রভৃতি একদল লেখকের প্রেরণাদাতা।

প্রতিভাশালী এবং বিশিষ্ট রচনাশৈলী সম্পন্ন কবি হিসাবে তিরুমলরায়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সংস্কৃত ও কন্নড উভয় ভাষায় পণ্ডিত লেখক দুটি ভাষাতেই গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর সমস্ত রচনার বিষয়বস্তু হল পৃষ্ঠপোষক চিকদেবরাজ, তাঁর সমুজ্জ্বল রাজনৈতিক জীবন এবং সম্মোহনী ব্যক্তিত্ব। তিরুমলরায়ের রচিত গ্রন্থগুলিতে সমকালীন ইতিহাসের বহু ব্যক্তি ও ঘটনা যে মুখ্য স্থান লাভ করেছে এই ব্যাপারটি কন্নড সাহিত্যে মোটেই সুলভ নয়। তাই বলা যায়, তিরুমলরায়ের গ্রন্থাদি সে যুগের কর্ণাটকের ইতিহাস রচনার একটি খাঁটি উৎস। এমনকি তাঁর লেখা অলঙ্কার সম্পদ বিষয়ক গ্রন্থের নাম যে 'অপ্রতিম বীরচরিতে' রাখা হয়েছে, তার কারণ অলঙ্কার সমূহের সংজ্ঞাগুলির উদাহরণ দেওয়া হয়েছে 'অপ্রতিমবীর' উপাধিধারী চিকদেবরাজের বীরত্বপূর্ণ কীর্তিকলাপ থেকে।

তিরুমলার্যের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ তাঁর পরিণত বয়সের গদ্য রচনা 'চিকদেবরাজ বংশাবলী'। এই গ্রন্থে ইতিহাস, পুরাণ এবং ধর্মমতের এক অদ্ভুত মিশ্রণ ঘটেছে। পৃষ্ঠপোষক রাজার বিশ্বস্ত মন্ত্রীরূপে তিনি সমকালীন রাজনীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন এবং সেই রাজনীতির কথা তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। তাঁর বর্ণনা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অসামঞ্জস্য ও অতিশয়োক্তিতে পূর্ণ হলেও বইটির সবচেয়ে বিশিষ্ট গুণ হল ছন্দোময় সমৃদ্ধ গদ্যরীতি।

চিকদেবরাজের অপর এক মন্ত্রী চিকুপাধ্যায় কন্নড ভাষায় তিরিশের অধিক গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। এই সমস্ত গ্রন্থের বর্ণনার বিষয় শ্রীবৈষ্ণবদর্শন, পুরাণ অথবা জীবন চরিত—এক কথায় শ্রীবৈষ্ণব পন্থীদের বিশ্বকোষ। তিরুমলার্যের ভ্রাতা সিংগরার্য কন্নড ভাষায় প্রথম নাটক রচনা করেন। নাটকটির নাম 'মিত্রবিন্দগোবিন্দ', সংস্কৃত নাটক 'রত্নাবলী'র ভাবানুবাদ। প্রাচীন কন্নড ভাষায় যে নাটক রচনার ধারা প্রচলিত ছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু যে প্রথম নাটকখানি এ যুগ পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে তা হল সিংগরার্যের রচনা। নাটকখানি মৌলিকও নয়, অনুবাদ হিসাবেও উল্লেখ-যোগ্য নয়।

প্রাচীনকাল থেকেই কন্নড ভাষায় কোনো না কোনো দর্শন তত্ত্বের কথা ব্যাখ্যাত হয়ে আসছে। তবে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের যুগে এবং তার পরে দর্শনের সূত্রগুলিকে সহজ সরল কন্নড-তে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা সফল হয়েছে বলা যায়। এই পর্যায়ের দু'খানি গ্রন্থ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এক মহালিঙ্গরঙ্গ-রচিত 'অনুভবামৃত'। সরল ভাষায় ভাসিনী ছন্দে লিখিত শঙ্করের অদ্বৈতবাদের আলোচনা। বইটি চিত্তাকর্ষক উপমায় পরিপূর্ণ বলে খুব জন-প্রিয়তা লাভ করেছে। অন্য বইটি জগন্নাথ দাসের লেখা 'হরিকথামৃতসার'। ভাসিনী ছন্দে রচিত এই গ্রন্থে আছে মাধ্ব দর্শনের ব্যাখ্যা। এটিও সরল ভাষা ও উপমা প্রয়োগের জন্য প্রসিদ্ধ। তবে মহাসিঙ্গরঙ্গের গ্রন্থে বেশি আছে ন্যায়শাস্ত্রসম্মত যুক্তি এবং জগন্নাথদাসের গ্রন্থে বেশি পাওয়া যায় ভক্তিরসের উদ্দীপনা।

চিকদেবরাজের আশ্রিত কবিদের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য নাম হোন্নম্মা। রাজার পরিচারিকাদের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন সামান্য নারী। কবি

সিংগরার্য হোন্নম্মার কবিত্ব শক্তির পরিচয় পেয়ে তাঁকে উপযুক্ত শিক্ষাদান করেন। হোন্নম্মা-র গুণের কথা শুনে রাজা রাণীকে বললেন তাঁকে যেন কবিতা রচনায় উদ্‌বুদ্ধ করা হয়। এরই ফলস্বরূপ জনপ্রিয় সাংগত্য ছন্দে রচিত হল হোন্নম্মার গ্রন্থ 'হদিবদেয় ধর্ম' (সতী স্ত্রীর ধর্ম)। প্রধানত উপদেশাত্মক এই সুন্দর কাব্যখানিতে বর্ণনা কৌশল বিশেষ না থাকলেও উদাহরণ ছলে মাঝে মাঝে প্রাচীন কন্নড সাহিত্য থেকে উপাখ্যানের উল্লেখ করা হয়েছে। বহু পুরাতন ভারতীয় ঐতিহ্য অনুসারে বিবাহিতা রমণীদের প্রতি উপদেশমালা কেবলমাত্র নীতি কাব্য না হয়ে অনুপম সৌন্দর্যমণ্ডিত সাহিত্যিক সৃষ্টিতে পরিণত হয়েছে। বইটি কেবল নারীদের উদ্দেশ্যে নয় পুরুষদের উদ্দেশ্য করেও লেখা। যে সমস্ত পুরুষ স্ত্রীজাতি সম্পর্কে ঘৃণার মনোভাব পোষণ করে, তাদের নিন্দা করে এই মহিলা কবি সমাজে নারীর মর্যাদা নিয়ে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির পূর্বাভাস দিয়ে গেছেন। কাব্যটির রচনারীতি মার্জিত ও বিশুদ্ধ কন্নডর উৎকৃষ্ট নিদর্শন। চিরায়ত কাব্যের কাঠিন্য কিছু থাকলেও ভাষা অপরিচ্ছন্ন নয়। প্রবহমান সাংগত্য ছন্দে লেখা বলে বইটি সুখপাঠ্য। পরবর্তী-কালের অপর এক মহিলা কবির নাম হেলবনকট্টে গিরিরম্মা। ঈশ্বরের প্রেমোন্মত্তা এই নারী দিব্য প্রেরণার বশে কিছু গান ও গল্প লিখে গেছেন। ভগবান কৃষ্ণের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় ভক্তির জন্য তাঁকে মীরাবাঈ-এর সঙ্গে তুলনা করা চলে। দ্বাদশ শতাব্দীর কন্নড মহিলা কবি অক্কমহাদেবীর মতো তিনিও ছিলেন বিস্ময়কর ক্ষমতাসম্পন্ন মরমী কবি।

অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকে রচিত বহুসংখ্যক গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। তাদের কয়েকখানি মহীশূর রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত হলেও সেগুলি কাব্যগুণে অনুন্নত। তবে মহীশূর রাজবংশের মুম্মদি কৃষ্ণরাজ ওডেয়ার-এর অবদান অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। তিনি নিজে প্রায় পঞ্চাশখানি গ্রন্থ রচনা করে গেছেন এবং সমকালীন লেখকদের উৎসাহদানেও ছিলেন অকৃপণ। তাঁর পৃষ্ঠ-পোষক কবিমণ্ডলীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ অলিয় লিঙ্গরাজ এবং কেম্পু-নারায়ণ। মুদ্রারাক্ষসের কাহিনী নিয়ে কেম্পুনারায়ণ মিশ্র গদ্যরীতিতে লিখেছেন 'মুদ্রামঞ্জুষা'। কন্নড সাহিত্যের ইতিহাসে গ্রন্থটি অনুপম। যদিও তিনি যথেষ্টভাবে প্রাচীন ও আধুনিক ভাষার মিশ্রণ ঘটিয়েছেন তথাপি তাঁকে আধুনিক কন্নডর অগ্রদূত বলা চলে। উনবিংশ শতকের শেষভাগের কবিদের

মধ্যে বসবন্না শাস্ত্রী তাঁর অসাধারণ কবিত্বশক্তি এবং অনুবাদ ক্ষমতার জন্য বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। কালিদাসের শকুন্তলার কন্নড অনুবাদের জন্য তিনি 'অভিনব কালিদাস' আখ্যা লাভ করেন। তিনি কেবল সংস্কৃত নাটকেরই অনুবাদক ছিলেন না, 'শূরসেন চরিত্রে' নাম দিয়ে শেকৃস্পীয়রের 'ওথেলো' নাটকের অনুবাদ করে কন্নড ভাষায় বিদেশী সাহিত্য অনুবাদের পথ প্রদর্শন করেন।

প্রাচীন থেকে আধুনিক কন্নড সাহিত্যে যে যুগ পরিবর্তন ঘটে, তার যথার্থ প্রতীক হলেন লক্ষ্মীনারায়ণ নন্দলিকে, যিনি সাধারণত 'মুন্দর' নামেই পরিচিত। উনবিংশ শতকের শেষে তাঁর জন্ম এবং মৃত্যু বিশ শতকের গোড়ায়। বিদ্যালয়ের শরীর চর্চার শিক্ষকরূপে তিনি দারিদ্র্য ও ব্যাধিবিড়ম্বিত ৩১ বছরের স্বল্পায়ু জীবনে 'যক্ষগান' নামে পরিচিত লোকনাট্য এবং অন্যান্য গদ্য ও পদ্য রচনার দ্বারা কন্নড সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে যান। তিনিই প্রথম ইংরাজী সাহিত্যের মাধ্যমে পাশ্চাত্য প্রভাবে দীক্ষিত হন। 'গোদাবরী' নামে একটি উপন্যাসের কয়েকটি অধ্যায় লিখে তিনি সেটি সম্পূর্ণ করে যেতে পারেন নি। নতুন ধরনের লেখায় তাঁর ব্যাকুল আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও পাছে গ্রন্থের স্বীকৃতি ও প্রকাশে বাধা ঘটে এই ভয়ে তিনি তাঁর তিনখানি গ্রন্থই পুরানো কন্নডয় রচনা করেন। এমনকি তিনি একথাও প্রচার করেন যে বইগুলি তাঁর নিজের রচনা নয়; পূর্বতনকালের 'মুদ্দণা' নামক কোনো কবির রচনা। কিছুকাল যাবৎ এই বিতর্ক চলছিল যে 'মুদ্দণা' ও লক্ষ্মীনারায়ণ একই ব্যক্তি কিনা। পরে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে তাঁরা অভিন্ন।

তাঁর গ্রন্থগুলির মধ্যে রামায়ণের বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন কাহিনী নিয়ে রচিত 'রামাশ্বমেধ'ই সর্বশ্রেষ্ঠ। এই গ্রন্থের প্রধান বর্ণনীয় বিষয় 'পদ্মপুরাণ'-এর উপর ভিত্তি করে লেখা—রামের নির্বাসন, গৃহে প্রত্যাবর্তন এবং রাজ্যাভিষেকের পরে অনুষ্ঠিত অশ্বমেধযজ্ঞকে কেন্দ্র করে গ্রথিত। তবে এই গ্রন্থের সর্বপ্রধান আকর্ষণ কবি মুদ্দণা এবং তাঁর স্ত্রী মনোরমার চরিত্র সৃষ্টি। তাঁদের মনোরম ও হাসিখুশি সংলাপের মধ্য দিয়ে তাঁরা প্রধান প্রতিপাদ্যের কাঠামোটি তৈরি করে মুখ্য বিষয়কে দীপ্তিতে অতিক্রম করে গেছেন। গল্পটির সূচনায় ও উপসংহারে এই দম্পতীর কথোপকথন, গল্পের মাঝে মাঝেই তাঁদের উপস্থিতি কবি ও সমালোচক এই দুই বিভিন্ন শ্রেণীর মনোভাবকে স্পষ্ট করে তুলেছে।

গ্রন্থের প্রারম্ভেই বর্ষাকালের যে চমৎকার বর্ণনা রয়েছে, তাতে মামুলী প্রথানুগত বর্ণনার বদলে আছে নতুন নতুন চিত্রকল্পের শোভা। মুদ্দণার গদ্যরীতিতে যে ছন্দও আকর্ষণশক্তি তা সমগ্র কন্নড সাহিত্যে তুলনা রহিত।

নবম অধ্যায়

আধুনিক সাহিত্যের সূচনা

প্রাচীন ও মধ্যযুগের কন্নড সাহিত্য সম্পর্কে মোটামুটি পর্যালোচনা করা হল। এবারে আমাদের দেখতে হবে কবে থেকে আধুনিক কন্নড সাহিত্যের সূত্রপাত এবং কিভাবে বর্তমান শতকে এই সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হল। প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যের মতোই আধুনিক যুগের সাহিত্য সম্পর্কেও অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলা কঠিন ঠিক কোন্ সময় থেকে এর সূচনা হয়েছে। একথা সুবিদিত যে রাত্রিশেষে অন্ধকারের আবরণ ভেদ করেই দিনের আলো শুরু হয়। কিন্তু ঠিক কোন সময়টিতে উষার আবির্ভাব বলা সহজ নয়। তেমনি বলা যায়, প্রাচীন সাহিত্যের চিহ্নযুক্ত হয়েই আধুনিক সাহিত্য দেখা দিল। অবিমিশ্র আধুনিক সাহিত্যের জন্মলগ্ন নির্দিষ্ট করে বলা কঠিন। মোটামুটি ভাবে বলা যায় আধুনিক কন্নড সাহিত্যের অরুণোদয় উনবিংশ শতকের তৃতীয় দশকে, আলোর প্রথম প্রকাশ ঐ শতকের মাঝামাঝি এবং আলোর জোয়ার আসে বিংশ শতকের গোড়ায়। ঠিক ঠিক বলতে গেলে প্রকৃত সৃজনশীল রচনার সূর্য কন্নড সাহিত্যের দিগন্তে দেখা দিল এই শতকের তৃতীয় দশকে। দেখা যাচ্ছে, পৃথিবীর কোনো কোনো অঞ্চলের বিলম্বিত উষার মতো কন্নড সাহিত্যের যুগ পরিবর্তনের কালসীমাও দীর্ঘস্থায়ী। ১৯২০ সালের আগে পর্যন্ত সৃজন প্রতিভা বিচিত্রবর্ণে বিকশিত হয়ে ওঠে নি।

অন্যান্য ভারতীয় ভাষার মতো আধুনিক কন্নড সাহিত্যেরও জন্ম হল ইংরেজী শিক্ষা ও নব্য চিন্তাধারার প্রভাবে। গত ৪০/৫০ বছর ধরে রচিত সাহিত্যের গঠন, রীতি ও বিষয়বস্তুতে এই প্রভাব সুস্পষ্ট। [বলা প্রয়োজন লেখকের এই মন্তব্য সহ মূল কন্নড গ্রন্থ লিখিত হয় ১৯৬০ সালে, প্রকাশ ১৯৬৫ সালে।] একথা মনে রাখা দরকার যে নতুন প্রকাশভঙ্গির একটা প্রেরণা আগে থেকেই ছিল। পুরানো ও নতুনকে সুষমভাবে মেলাবার মতো সমন্বয়-মূলক দৃষ্টিরও অভাব ছিলনা। হাজার বছরেরও বেশি কাল ধরে এই সমন্বয় দৃষ্টি শ্রেষ্ঠ কন্নড সংস্কৃতির অঙ্গীভূত ছিল। তাই বলা যায় যে কন্নড লেখকদের অন্তঃপ্রেরণা ও সমন্বয়ী দৃষ্টি যখন ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের মাধ্যমে পাশ্চাত্য

প্রভাবের সঙ্গে যুক্ত হল, তখনই আধুনিক কন্নড সাহিত্যের জন্ম। একথা বলা ঠিক নয় যে আধুনিক কন্নড সাহিত্য কেবল বাহ্য প্রভাবের ফল।

অতি প্রাচীন কাল থেকেই পাশ্চাত্য বণিক ও দুঃসাহসিক অভিযাত্রীরা ভারতবর্ষে যাতায়াত করে আসছিল। পশ্চিমের সমুদ্র পথ দিয়ে এসে তারা কর্ণাটকের মাটিতে পদার্পণ করে এতদঞ্চলের নানা স্থানে ঘোরাফেরা করে। কিন্তু তাদের জীবন ও সাহিত্যের প্রভাব পড়ে কেবল ইংরেজদের আমলে। তারা ভারতবর্ষে প্রথম আসে ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে। ধীরে ধীরে তারা এদেশের অধিবাসীদের দুর্বলতা বুঝতে পারে এবং তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থার সুযোগ নিয়ে বিভেদনীতি প্রয়োগ করে ও উন্নত অস্ত্রশক্তির সাহায্যে সমগ্র দেশের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করে। শাসক ও শাসিতগোষ্ঠীর মধ্যে একটি যোগসূত্র রচনার জন্য তারা এদেশবাসীকে ইংরেজী শেখাবার ব্যবস্থা করলে ব্যাপারটা প্রতিক্ষিপ্ত হয়ে শাসকগোষ্ঠীর প্রতিকূলে যায়। এই প্রক্রিয়ার মধ্যে যেন নিয়তির অদ্ভুত খেলা লক্ষ্য করা যায়। যে শিক্ষা-ব্যবস্থাবলে ইংরেজ শাসকশক্তি ভারতবাসীকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্ধস্তাবকে পরিণত করে চিরদাসত্বের বন্ধনে বেঁধে রাখতে চেয়েছিল, সেই শিক্ষাব্যবস্থাই দেশাত্ম-বোধের জাগরণ ঘটিয়ে স্বাধীনতার স্পৃহাকে বলবতী করে তোলে।

যে স্বাধীন ভারতের কল্পনা এক সময়ে মিথ্যা স্বপ্ন বলে মনে হত, যোগ্য নেতৃত্বের পরিচালনায় এবং বহু মানুষের ব্যথা ও দুঃখবরণের ফলে সেই স্বপ্নই কালক্রমে বাস্তবে পরিণত হয়। কিন্তু ইংরেজ তার আগেই কর্ণাটককে নানা অংশে খণ্ডিত করে সেই বিচ্ছিন্ন অংশগুলি মুক্তি যুদ্ধে তাদের সহায়ক শক্তির মধ্যে ভাগবাঁটোয়ারা করে কন্নড দেশ ও তার অধিবাসীদের ঐক্যবোধকে মুছে দেওয়ার চেষ্টা করে। সাহিত্য ও সংস্কৃতির কথা দূরে থাক, কন্নড ভাষার অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়ে। নানা সীমান্তবর্তী অঞ্চলের বিভিন্ন ভাষার আগ্রাসে কন্নড ভাষা নানাভাবে বিকৃত হতে থাকে। কন্নডিগেরা (অর্থাৎ কন্নড-ভাষীরা) নিজেদের অভিন্ন স্বরূপ বিস্মৃত হয়ে এই বিকৃতিকেই স্বাভাবিক অবস্থা বলে মনে করে। ইংরেজী শিক্ষার ফলে কন্নডভাষীয় এইভাবে দ্বৈত-দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

সৌভাগ্যক্রমে শিক্ষিত কন্নডিগেরা একই সঙ্গে ভারতপ্রীতি ও কন্নড-প্রীতির মধ্যে কোনোরূপ বিরোধের বদলে নতুন এক জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হন।

কন্নড়ভাষার সাহিত্য ও সংস্কৃতির পুনরভ্যুদয়ের আদর্শে তাঁরা দীক্ষিত হলে গোড়ার দিকে তাঁদের কেউ কেউ গোঁড়া সংকীর্ণচেতা বলে নিন্দিত হন। কিন্তু ধীরে ধীরে তাঁদের কন্নডপ্রীতি কর্ণাটকের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। দেশের সচেতন জনশক্তির মন্ত্র হল—'স্বাধীন ভারত ও অখণ্ড কর্ণাটক'। যে ইংরেজী শিক্ষা এই অখণ্ডতাকে ব্যাহত করতে চেয়েছিল সেই শিক্ষার ফলেই যে অখণ্ড কর্ণাটকের জন্ম এর চেয়ে নিয়তির পরিহাস আর কী হতে পারে?

বিভিন্ন শাসন ব্যবস্থার অধীনে নানা খণ্ডে বিভক্ত সে যুগের কর্ণাটকে পাশ্চাত্য প্রভাব আসে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে। সমুদ্রবর্তী কর্ণাটক অর্থাৎ দক্ষিণ কানাড়া মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্ভুক্ত ছিল বলে অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় বেশ কিছু আগেই ইংরেজী শিক্ষা লাভ করে নতুন চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হয়। এ অঞ্চলের শিক্ষিত লোকেদের মধ্যে জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে নতুন দৃষ্টি-ভঙ্গী গড়ে ওঠে। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে বলা উচিত কন্নড ভাষার প্রতিভা খ্রীস্টান মিশনারীদের অনুরাগ ও সেবার কথা। আধুনিক কন্নড ভাষায় যে লিপি প্রচলিত তা সেই মিশনারীদেরই দান। প্রাচীন লিপির উপর ভিত্তি করেই এই নতুন লিপি গঠিত। কন্নড ভাষায় মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠাও তাঁদেরই কীর্তি। কেবল তাই নয়, ভারতীয় পণ্ডিতদের সাহায্য নিয়ে তাঁরা ব্যাকরণ, ছন্দ ও অভিধান জাতীয় গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করেন। কন্নড ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যয়নে বইগুলি খুবই সহায়ক। কন্নড বিদ্যাচর্চার গোড়ার দিকে এই মিশনারীদের দান শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণীয়। এঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কয়েকটি লেখা: Kerry, Maccerrel, Rieve, Kittel, Rice, এবং Caldwell, পূর্বতন মহীশূর রাজ্যে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় প্রাচীন গ্রন্থাদি সম্পর্কে গবেষণা ও প্রকাশনার কাজ অগ্রসর হতে থাকে। বেশ ব্যাপকভাবে শিলালিপির সংগ্রহ ও সম্পাদনার কাজে হাত দেওয়া হয়। **Epigraphia Carnatica** নাম দিয়ে কয়েকটি খণ্ড প্রকাশ করে **Lewis Rice** শিক্ষিত সাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হন। এই খণ্ডগুলিতে প্রাপ্ত শিলালিপি থেকে কন্নডিগেরা তাদের রাজ্যের ইতিহাস ও সংস্কৃতির পরিচয় লাভ করে।

শিলালিপি ছাড়া কাব্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক প্রাচীন গ্রন্থাদিও প্রকাশিত হয়। যেন একটা চমৎকার প্রাচীন মন্দির বহু শতাব্দী যাবৎ মৃত্তিকাগর্ভে লোকচক্ষুর অগোচরে থেকে হঠাৎ একদিন তার পূর্বতন মহিমা নিয়ে ভূপৃষ্ঠে

জেগে উঠল। কন্নড ভাষীদের পক্ষে এই ঐশ্বর্যময় ঐতিহ্যের আবিষ্কার আনন্দ ও গর্বের স্মৃতি জাগিয়ে তোলে।

উত্তর কর্ণাটকে কিন্তু রাত্রির অন্ধকার দূর হয়ে নতুন দিনের আলো আসতে অনেক দিন লেগে গেল। একদিকে যেমন ইংরেজী শিক্ষার প্রসার ছিল মন্থর, অন্যদিকে তেমনি শিক্ষিত কন্নডিগদের মন প্রতিবেশী ভাষাগুলির চাপে মাতৃভাষা বিমুখ হয়ে রইল। আজও সেই বিমুখতা সম্পূর্ণরূপে দূর হয়নি। উনবিংশ শতকের শেষার্ধে এই অঞ্চলের প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে কন্নডভাষী বালক-বালিকাদের প্রথম ভাষারূপে মারাঠী শেখানো হত। সরকারী শিক্ষা বিভাগ অনেক বছর পরে বুঝতে পারল যে এ অঞ্চলের ভাষা মারাঠী নয়, কন্নড। এবং এই উপলব্ধির মূলেও ছিল একজন ইংরেজ যিনি শিক্ষাবিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারীরূপে এই অঞ্চলে ভ্রমণের সুযোগ পেয়েছিলেন। স্থির হল যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মারাঠীর পরিবর্তে কন্নড ভাষা চালু করা হবে। কিন্তু উল্লেখ করবার মতো পাঠ্যপুস্তক তখন বিশেষ কিছু ছিল না। খুব আগ্রহ সহকারে কন্নড পাঠ্যপুস্তক লেখার কাজ শুরু হল। যে সমস্ত শিক্ষাব্রতী ও গ্রন্থকার এই কাজে বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করেন, তাঁদের মধ্যে ডেপুটি চেন্নবসপ্পা ও বেঙ্কট রঙ্গ কট্টির নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা উচিত। কালক্রমে কন্নড ও ইংরেজী ভাষায় প্রকৃত শিক্ষাদানের ফলে এমন এক নতুন শিক্ষিত শ্রেণী গড়ে উঠল, যাঁরা তাঁদের ঐতিহ্য সম্পর্কে গর্বিত এবং ইংরেজী সাহিত্য অধ্যয়নের ফলে নীতিকবিতা, ছোটগল্প, উপন্যাস প্রভৃতি আধুনিক সাহিত্যরূপের সঙ্গে পরিচিত হয়ে ঐ জাতীয় রচনার দ্বারা সেই ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধ করবার স্বপ্ন দেখতে লাগলেন।

আধুনিক সাহিত্যের প্রথম স্তর (১৮২০—১৯২০)

আগেই বলা হয়েছে যে আধুনিক সাহিত্যের অরুণোদয় হয়েছে উনিশ শতকের তৃতীয় দশকে। একথা বলার বিশেষ কারণ এই যে কেম্পুনারায়ণ রচিত 'মুদ্রামঞ্জুষা' (১৮২৩)র রচনারীতির মধ্যে পুরানো ও নতুন রীতির এক অদ্ভুত মিশ্রণ ঘটেছে। এর আগেই অবশ্য মহীশূর রাজ তৃতীয় কৃষ্ণ-রায়ের (১৭৯৮-১৮৬৮) উৎসাহ ও প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে আধুনিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রস্তুত করা হচ্ছিল। কৃষ্ণরায় নিজেই গ্রন্থকার ছিলেন।

তাঁর নামে প্রায় ৫০ খানি গ্রন্থ প্রচলিত হলেও সবগুলি তাঁর রচনা নাও হতে পারে। ২/৩ খানি অন্য বই ছিল গদ্যে লিখিত। আগামীকালের সাহিত্যে পদ্যের বদলে গদ্যই যে প্রধান হয়ে উঠবে এ যেন তারই ইঙ্গিত। এ যুগের আরও একজন গ্রন্থকার ছিলেন রাজপরিবার ভুক্ত। নাম তাঁর অলিয়-লিঙ্গরাজ। চম্পূ, সাংগত্য এবং অন্যান্য ছন্দে তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ৪৭। যদিও এটা গর্বের ব্যাপার যে সে যুগের অন্য লেখকদের তুলনায় রাজপরিবারের সদস্যরা ঢের বেশি পরিমাণে লিখেছিলেন, তবু বলা উচিত তাঁদের অধিকাংশ রচনায় সৃজন প্রতিভার স্বাক্ষর তেমন ছিলনা। রাজার আশ্রয়ে নিরাপত্তাই হোক কিংবা রাজকীয় উৎসাহের অভাবে নিরাপত্তার অভাবই হোক কোনো অবস্থাতেই গুণগত মানে উৎকৃষ্ট রচনা লেখা হয়নি, যদিও সংখ্যার বিচারে কোনো ঘাটতি ছিলনা। এই যুগের যা কিছু আধুনিক রীতি ও দৃষ্টি-সম্পন্ন লেখা রচিত হয় তার অধিকাংশই অনুবাদ অথবা ভাবানুবাদ। পূর্বেই বলা হয়েছে পুরানো ও নতুন কন্নড মিশ্রণের একটা দুঃসাহসিক চেষ্টা হয়েছিল যার মধ্যে আধুনিক গদ্যে আবির্ভাবের সামান্য আভাস পাওয়া যায়। উইলিয়াম কেরী (Kerry) কর্তৃক বাইবেল অনুবাদ শেষ হয় ১৮০৯ সালে, প্রকাশিত হয় ১৯২৩ এ। এইটিই আধুনিক কন্নডর প্রথম গদ্যগ্রন্থ বলে বিবেচিত।

এ যুগের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ হল কন্নড নাটকের উত্থান। এক হাজার বছরেরও অধিক কালব্যাপী কন্নড সাহিত্যের ইতিহাসের পাতা থেকেই নৃত্য-নাট্যের প্রচলন ছিল তার যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। কিন্তু প্রথম প্রাপ্ত নাটক সপ্তদশ শতাব্দীর সিংগরার্য লিখিত 'মিত্রবিন্দ গোবিন্দ'। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় যে নাটকগুলির সন্ধান পাওয়া যায় তার বেশির ভাগ 'যক্ষগান' ধরনের রচনা। যক্ষগান হল নৃত্যগীতপ্রধান এক ধরনের লোকনাট্য। গানের কথাগুলি আগে থেকেই রচনা করে সুর সংযোগ করা হত, কিন্তু এই জাতীয় নাটকের সংলাপ ছিল বিনা প্রস্তুতিতে উপস্থিত বুদ্ধির রচনা। লেখার কোনো ব্যবস্থা থাকত না। আলোচ্য শতকে অবশ্য পাছে হারিয়ে যায় এই আশঙ্কায় গানগুলি লিখে রাখা হতে থাকে। যক্ষগান রচয়িতাদের মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য সুব্ব এবং শান্তয়্যা নাম দুটি। এই গান তীরবর্তী কর্ণাটকের বিশেষ করে দক্ষিণ কানাড়ার দান। উত্তর কর্ণাটকে এই যক্ষগানের যে সব রকমফের

প্রচলিত, তার মধ্যে অপরাল তিম্মণ্ণা রচিত "কৃষ্ণপারিজাত" অত্যন্ত জনপ্রিয়।

ভারতের অন্যান্য অংশে ততদিনে পেশাদারী থিয়েটার দেখা দিয়েছে। মহীশূর নৃপতির উদার পৃষ্ঠপোষকতায় কন্নড দেশেও নব্যরঙ্গ মঞ্চের জন্য নাট্য সৃষ্টি দ্রুত এগিয়ে চলে। 'অভিনব কালিদাস' নামে পরিচিত বসবপ্পা শাস্ত্রী 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা', 'উত্তররামচরিত' এবং 'ষণ্ডকৌশিক' প্রভৃতি নাটকের চমৎকার নাট্যানুবাদ করেন। যতদূর জানা যায় কন্নড সৃজনশীল সাহিত্যে প্রথম বিদেশী প্রভাবের নিদর্শন শেকস্‌পীয়রের 'ওথেলো' অবলম্বনে বসবপ্পা শাস্ত্রীর রচনা 'শূরসেন চরিত' (১৮৯৫)। চুরমরি নামে জনৈক লেখকের কৃত 'ওথেলো'র অনুবাদ 'রাঘবেন্দ্র রাউ' নামে ১৮৮৫ সালে প্রকাশিত হয়। আর এক গুচ্ছ সংস্কৃত নাটকের কন্নড অনুবাদ করেন ডি. এন্. মূলবাগিলু। পূর্বোল্লিখিত কেম্পুনারায়ণের গদ্য রচনায় যেমন ছিল পুরানো-নতুনের মিশ্রণ, মূলবাগিলুর পদ্যরচনাও তেমনি মিশ্ররীতিতে গঠিত। অনুবাদ প্রধান এই যুগে কিছু পরিমাণে মৌলিক রচনাও রচিত হয়। নাট্যক্ষেত্রে লক্ষণীয় ব্যাপার হল এই যে বেঙ্কটরমণ শাস্ত্রী নামে একজন লেখক "ইগগপ্পা হেগগডেয় বিবাহ প্রহসন" নামে একটি সামাজিক নাটক রচনা করে ১৮৮৭ সালে বোম্বাই থেকে প্রকাশ করেন। বিবাহ ব্যাপারে কন্যাবিক্রয়ের সামাজিক দুর্নীতি নিয়ে যে এই প্রহসনমূলক বইটির ভাষা 'হব্যক' ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রচলিত কন্নড-র 'হব্যক' উপভাষা। আধুনিক কর্ণাটকে প্রখর বাস্তবতাবোধ নিয়ে রচিত প্রথম সামাজিক নাটক বলে কন্নড সাহিত্যের ইতিহাসে বইটি বিশেষ মূল্যবান। কিছুকাল পরে, ১৯১৯-২০ সাল নাগাদ, হুলিগোল নারায়ণরাও উত্তর কর্ণাটকের উপভাষায় কয়েকখানি ফলপ্রসূ সামাজিক নাটক রচনা করেন। সৌখীন নাট্যসম্প্রদায় সেগুলি মঞ্চস্থ করে জণগণের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয়। বহুমুখী প্রতিভা সম্পন্ন সাংবাদিক ও লেখক কেরূর বাসুদেবাচার্য ইংরেজী নাটক, বিশেষ করে শেকস্‌পীয়রের কয়েকখানি নাটক, বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে স্থানীয় ভাষায় ও পটভূমিকায় রূপায়িত করেছেন। She stoops to conquer-এর ছায়াবলম্বনে লেখা 'পতিবশীকরণ' কন্নড রঙ্গমঞ্চে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করে। ১৯২০ সালের পরে টি. পি. কৈলাসম এবং শ্রীরঙ্গ বিচিত্র আঙ্গিকে, চরিত্র সৃষ্টির গভীরতা এবং কথ্যভাষার বহুল প্রয়োগে কন্নড সামাজিক নাটকে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেন। অতঃপর বহুতর নাট্যকার সামাজিক

বিষয়বস্তু নিয়ে নাট্যরচনার নৈপুণ্যে কন্নড দর্শক-শ্রোতাদের চিত্তবিনোদন করেছেন।

ছোটগল্প ও উপন্যাসের ক্ষেত্রে প্রথম প্রথম অনুবাদের মধ্য দিয়ে মৌলিক রচনার পরিবেশ তৈরি করা হয়েছিল, পরবর্তীকালের তরুণ লেখকদের পক্ষে অনুকরণীয় আদর্শ বলে বিবেচিত হয়। **Bunyan** রচিত **Pilgrim's Progress** এর আর. ভিয়েগল-কৃত কন্নড অনুবাদ 'যাত্রিকন সঞ্চার' প্রকাশিত হয় ১৮৪৭ সালে। পরে এস্. জি. নরসিংহাচার 'আলাউদ্দীনের প্রদীপ', 'ঈসপস্ ফেবল্‌স', 'গলিভর্‌স ট্রাভেল্‌স্' প্রভৃতি গ্রন্থের অনুবাদ করেন। বঙ্কিম-চন্দ্রের গল্প-উপন্যাসের কন্নড রূপ দেন বি. .বঙ্কটাগর। আরব্যরজনীর কিছু গল্পেরও তিনি অনুবাদ করেন। গালগনাথ মারাঠী উপন্যাসের ভাবানুবাদ এবং তৎসহ কিছু মৌলিক উপন্যাস রচনা করে কন্নড পাঠকদের মধ্যে অধ্যয়নের স্পৃহা জাগ্রত করেন। বিশ শতকের প্রথম দশকে মৌলিক গল্প লিখতে শুরু করেন পঞ্জে, কেরু এবং এম. এন. কামাত। শিবরুদ্রপ্পা কুলকর্ণীর "নাদ নেলেগার' নামক ক্ষুদ্র গল্প সংকলনে এবং অন্য লেখকদের অনুরূপ সংকলনে সৃষ্টি-প্রতিভার স্পর্শ পাওয়া যায়। এই সৃষ্টিপ্রেরণা ক্রমশ ছোট গল্প থেকে উপন্যাসের দিকে ছড়িয়ে পড়ে। কন্নড ভাষায় প্রথম সামাজিক উপন্যাসের মর্যাদা লাভ করে ১৮৯৯ সালে প্রকাশিত এবং গুল্‌বাডী বেংকট রাও লিখিত 'ইন্দিরাবাই' গ্রন্থ। অতঃপর একে একে প্রকাশিত হয় বোলার বাবুরাও-কৃত 'বাগদেবী' (১৯০৫), গুল্‌বাডী অন্নাজিরাও-কৃত 'রোহিণী' (১৯০৭) কেরুর-কৃত 'ইন্দিরা' (১৯০৮)। প্রথম মৌলিক ঐতিহাসিক উপন্যাস কেরুর রচিত 'যদু মহারাজ' (১৯১৬)। পরবর্তীকালে এম্ এস্. পুত্তন্না-র উপন্যাসে তৎ-কালীন সামাজিক জীবনের হৃদয়স্পর্শী চিত্রণের পরিচয় পাওয়া যায়। কেরুর-কৃত সামাজিক উপন্যাস 'ইন্দিরা'য় কাহিনী ও গল্পাংশ দুই-ই মৌলিক, তবে কয়েকটি চরিত্র তৎকালীন মহারাষ্ট্রের প্রচলিত কিছু প্রগতিশীল মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত। এম্ এস্. পুট্টন্না-র উপন্যাসে পাওয়া যায় বিস্ময়কর বাস্তব-বোধ, এবং সংলাপ, চরিত্র সৃষ্টি ও সামাজিক পরিবেশ রচনায় খাঁটি দেশজ প্রকৃতি।

এ যুগের কবিতায় রূপবৈচিত্র্য আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু কাব্যের আসল বস্তুবিচারে মামুলি ও নীরস। কবিতার ভাষায় পুরানো রূপের সঙ্গে সঙ্গে

ধীরে ধীরে নতুন রূপ ও পদগুচ্ছ দেখা দিচ্ছে। নাটক ও উপন্যাসের মতো নব্য কবিতার সৃষ্টি ও অনুবাদের মধ্যে। পূর্বোল্লিখিত **Pilgrim's Progress** অনুবাদ 'যাত্রিকন সঞ্চার' (১৮৫৭) গ্রন্থের পদ্যানুবাদে প্রথম নব কবিতার প্রচলন হয়। মূলের ইংরেজী পদ্যগুলি সরল কন্নড়য় রূপান্তরিত হয়। তার কয়েকটি প্রাচীন ভামিনী ছন্দে রচিত, অন্যগুলি ইংরেজী পদ্যের অনুসরণে চার পঙ্‌ক্তির স্তবকে গঠিত। এই পদ্যগুলির বিশেষ গুরুত্ব এই কারণে যে এগুলি পুরানো ছন্দের ভিত্তিতে গঠিত নতুন ছন্দের প্রথম নিদর্শন। একই সময়ে মিশনারীদের প্রকাশিত একটি গীতিসংগ্রহে পাশ্চাত্য সুরে গ্রথিত ইংরেজী ও জর্মান সঙ্গীতের কন্নড তর্জমা পাওয়া যায়। তার কতগুলি গানে মিল বা অন্ত্যানুপ্রাসে চরণের প্রথমে (দ্রাবিড় মতে) এবং শেষে (পাশ্চাত্য ও আর্যভাষীদের মতো) উভয় স্থানেই পাওয়া যায়; অন্য কতগুলি গানে কেবল চরণের শেষে মিল। ত্রিমাত্রিক পর্বের চার চরণে গঠিত স্তবক নিয়ে নতুন পরীক্ষা করা হয়েছে। উনিশ শতকের একেবারে শেষে এবং বর্তমান শতকের প্রথম দুই দশকে অনুবাদের মধ্য দিয়েই নতুন কবিতার জন্ম হয়েছে। যাঁরা ইংরেজী কবিতার কন্নড রূপান্তর করেছেন, তাঁদের মধ্যে বিশিষ্টতার অধিকারী এইচ. নারায়ণরাও, পঞ্জে মঙ্গেশরাও, এস্ জি নরসিংহাচার, গোবিন্দ পাই এবং (পর্যায়ক্রমে সর্বশেষ হলেও গুরুত্বে নয়) বি এস্ শ্রীকণ্ঠাইয়া (যিনি 'শ্রী' নামেই অধিকতর পরিচিত)—এঁরা সকলে সাহিত্যক্ষেত্রে পথিকৃৎরূপে সম্মানিত। তাঁদের রচনা থেকেই আধুনিক কন্নড ভাষায় মৌলিক নীতি কবিতা লেখার প্রেরণা আসে। উল্লিখিত কবিদের মধ্যে 'শ্রী' ব্যতীত সকলেই প্রায় পুরানো ছন্দ ও রীতি প্রয়োগ করেছেন। নতুন ছন্দ ও নতুন কাব্যরীতির প্রবক্তা ছিলেন 'শ্রী'। নতুনত্ব আমদানির ঝোঁক মিশনারীদের কবিতায় ও গানেও লক্ষ্য করা গিয়েছিল সত্য, কিন্তু সেগুলির আবেদন ছিল সীমাবদ্ধ। 'শ্রী'কেই প্রথম পাওয়া যায় উত্তম অনুবাদ এবং মৌলিক প্রতিভাসম্পন্ন কবিরূপে। তাই তাঁকে কন্নড কাব্যের অসাধারণ মেধাসম্পন্ন পথপ্রদর্শক রূপে গণ্য করা হয়। ইংরেজী **Golden Treasury**-র কয়েকটি সুপরিচিত কবিতার পদ্যানুবাদ নিয়ে প্রকাশিত তাঁর 'ইংগ্‌লিকা গীতগলু' বইটি (১৯২০) আধুনিক কবিতার ইতিহাসে মাইলস্টোনরূপে বিবেচিত। 'শ্রী' এবং অন্যান্য কবি যাঁরা ইংরেজী থেকে অনুবাদ করেছেন, তাঁদের রচনা এই কথারই সাক্ষ্য দেয় যে একজন উত্তম

অনুবাদক সাধারণত একজন মৌলিক কবিও বটে। অবশ্য অনুবাদক এইচ. নারায়ণরাও কোনো মৌলিক কবিতা লিখেছিলেন বলে জানা যায় না। তবে এস. জি. নরসিংহাচার কয়েকটি কবিতা লিখে গেছেন। সংখ্যায় বেশি না হলেও কয়েকটি উৎকৃষ্ট কন্নড গীতি-কবিতার লেখক পঞ্জে মঙ্গেশরাও এবং 'শ্রী'। আধুনিক যুগের একজন বিশিষ্ট কবিরূপে গোবিন্দ পাই সম্মানিত। আধুনিক কন্নড ভাষায় প্রথম মৌলিক কবিতার লেখক বোধ করি পঞ্জে মঙ্গেশরাও। পঞ্জে সহ গোবিন্দ পাই, 'শ্রী', শান্তকবি এবং বেন্দ্রে আধুনিক গীতিকবিতার স্রষ্টা।

আধুনিক সাহিত্যের দ্বিতীয় স্তর (১৯২১-৫৮)

আধুনিক সাহিত্যের সূচনা থেকে পরবর্তী একশ বছরের যে দ্রুত পর্যবেক্ষণ করা হল, তাতে বলা যায় যে অজস্র কিরণ দিয়ে পূর্ব দিগন্ত উজ্জ্বলকারী সূর্যের মতো আধুনিক কন্নড সাহিত্যও প্রকাশ ভঙ্গির বৈচিত্র্য নিয়ে অসাধারণ দীপ্তিতে দীপ্যমান। ভারতবর্ষ তথা কর্ণাটকের ইতিহাসে ১৯২১ সাল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ এই বছরেই বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন শুরু করে স্বাধীনতার বেদীমূলে চরম আত্মত্যাগের জন্য দেশবাসীর প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান মহাত্মা গান্ধী। অভূতপূর্ব জাগরণের ফলে সমস্ত দেশ আলোড়িত হয়ে ওঠে এবং দেশের যুবসমাজ দেশপ্রেম, আত্মত্যাগ,স্বদেশী প্রীতি এবং ভাষাপ্রীতির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়। দেশাত্মবোধক সঙ্গীতে আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠে। সাহিত্যজগতে নতুন প্রেরণা, নতুন বিষয়, নতুন রীতি এবং নতুন ছন্দের প্রচলন ঘটে। দেশপ্রেমিকরা যেমন স্বাধীনতার জন্য বিদেশী সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতা করলেন, লেখকেরাও তেমনি মাতৃভাষায় তাঁদের আত্মপ্রকাশের অধিকারকে দৃঢ় করবার জন্য পুরানো রীতিনীতি বিসর্জন দিলেন। আগেই বলা হয়েছে, স্বাধীনতার যে মূলসূত্রগুলি আমরা ইংরেজদের কাছে শিখেছিলাম, সেইগুলিই বৃটিশ শাসন থেকে দেশের মুক্তি ঘটাবার প্রেরণাশক্তিরূপে কাজ করে। শিক্ষিত ভারতীয় চেতনায় ইংরেজী সাহিত্যের গভীর প্রভাব ভারতীয় সাহিত্যের রূপে ও ভাবে নিগূঢ় পরিবর্তন ঘটিয়ে দেয়। শিক্ষিত সম্প্রদায় শেকস্‌পীয়র ও মিল্‌টনের রচনাবলী পাঠ করে অতিশয় উল্লাসবোধ করেন, ওয়ার্ডসওয়ার্থ-শেলী-কীট্‌সের নীতিকবিতার

সঙ্গে তাঁদের একাত্মতা বোধকল্পে তাঁরা মিল এবং মর্লির চিন্তাধারার সার সংগ্রহ করেন এবং স্কট ও ডিকেন্সের উপন্যাস থেকে প্রেরণা পান। ইংরেজী সাহিত্যের নানা ঘটনায় ও চরিত্রে তাঁদের মন পূর্ণ হয়ে ওঠে। পরে আবার এই অত্যুৎসাহের প্রতিক্রিয়ায় কেউ কেউ ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য উৎসুক হয়ে ওঠেন। বেদ ও বেদান্ত অধ্যয়নের ফলে তাঁদের সম্মুখে নতুন পথ খুলে যায়। তাঁরা কেউ কেউ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সমন্বয় সাধনের জন্য মনেপ্রাণে যত্নশীল হলেন। যে নতুন চেতনা সমগ্র ভারতবর্ষকে সঞ্জীবিত করেছিল, কিছুকাল পরে হলেও সেই নব চেতনায় কর্ণাটকও উদ্দীপিত হয়ে ওঠে। ১৯২০ সালের পর থেকে এ অঞ্চলের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে এই চেতনার ব্যাপক বিস্তার ঘটে, সঙ্গে সঙ্গে দেশপ্রীতি ও ভাষাপ্রীতিও উত্তরোত্তর বর্ধিত হয়। বিদ্যাবর্ধক সংঘ এবং কর্ণাটক সাহিত্য পরিষদের মতো সংস্থার উদ্যোগে দেশ ও ভাষাকে ঐক্যসূত্রে বাঁধার জন্য সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা শুরু হয়। সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র ও গ্রন্থাদির মধ্যে নতুন ধরনের পদ্যরীতি গড়ে উঠতে থাকে। ১৯২১ থেকে ১৯৪৭ কালসীমা মৌলিক সৃজনশীল রচনার পক্ষে প্রশস্ত হয়ে দেখা দেয়। মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলিতে একের পর এক কঠোর পরীক্ষার মধ্য দিয়ে চলতে চলতে ভারতবর্ষ ১৯৪৭-এর ১৫ আগস্ট বিদেশী শাসন থেকে মুক্তি লাভ করে। এই যুগে বেঁচে থাকার সংগ্রাম যেমন তীক্ষ্ণ হয়, সাহিত্য ক্ষেত্রেও তেমনি টানাপোড়েন চলতে থাকে। একাধিক অর্থে এই যুগকে বলা যায় স্বাধীনতা সংগ্রামের কাল। ১৯৪৭-এর পরবর্তীকালকে বলা যায় স্বাধীনতা-উত্তর কর্মতৎপরতার যুগ। কারো কারো মতে ১৯৩৯ সালের পর থেকে মুক্তিসংগ্রামের সঙ্গে প্রগতিশীল সাহিত্যের আন্দোলনও যুক্ত হয়। স্বাধীনতালাভের পরবর্তী ৩০/৪০ বছর যাবৎ কতগুলি ঘটনা ও শক্তি কন্নডভাষীদের জীবনে ও সাহিত্যে যে বিচিত্র প্রভাব বিস্তার করে তার ফলে সাহিত্যের রূপে ও বিষয়বস্তুতেও বৈচিত্র্য সঞ্চারিত হয়। পূর্বের চেয়েও বর্তমানে সেই ধারা জোরদার হয়ে ওঠে। আজকের সাহিত্য আধুনিক জীবনের মতোই জটিল। কাজেই বিশেষ একটা যুগকে কতগুলি বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত বলে চিহ্নিত করে এই সিদ্ধান্তে আসা ঠিক হবে না যে পরবর্তীযুগ পূর্ববর্তীযুগের সমস্ত ধারাকে সরিয়ে দিয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠা করেছে।

নতুন কবিতার প্রথম স্ফুরণ হয়েছিল প্রধানত অনুবাদ অথবা ভাবানুবাদের মধ্য দিয়ে। এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় উত্তম কবিতা অনুবাদের মধ্যেও যে সৃজনশক্তির পরিচয় থাকতে পারে সেকথা অস্বীকার করা যায় না। কন্নড সাহিত্যের পরবর্তী স্তরে চতুষ্পার্শ্ববর্তী জীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ মৌলিক সৃষ্টি প্রচুর পরিমাণে দেখা দিল। এই নব্য কবিতা আন্দোলনের পুরোধাদের মধ্যে ছিলেন মহীশূরের শ্রী ভি. ভি. গুণ্ডাপ্পা এবং মাস্তি, ম্যাঙ্গালোর অঞ্চলের পঞ্জে, গোবিন্দ পাই এবং মুলিয় তিম্মপ্পাইয়া। ধারওয়াড় অঞ্চলের বেন্দ্রে, সালী এবং আনন্দকন্দ। এঁদের চারদিকে এসে সমবেত হলেন তরুণ উদীয়মান কবিরা। বিশেষ করে স্মরণীয় 'শ্রী'-র নেতৃত্বে তালিরু গোষ্ঠী, পঞ্জের নেতৃত্বে মিত্রমণ্ডলী এবং বেন্দ্রে-র নেতৃত্বে 'গেলেয়র গুম্পু' (বন্ধুগোষ্ঠী)। এই সাহিত্যিক আন্দোলনের প্রথম সারিতে যাঁরা ছিলেন তাঁরা অনেকেই ইংরেজী শিক্ষিত লোক হলেও, একথা অস্বীকার করা যায় না যে কিছুসংখ্যক সামান্য ইংরেজী জানা কিংবা ইংরেজী অনভিজ্ঞ কবিও নতুন ধাঁচের কাব্য রচনা করে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন।

কুবেম্পু, পুতিনা, শঙ্করভট্ট, বিনায়ক এবং অন্যান্যরা অগ্রজ কবিদের নিকট সংস্পর্শে ও প্রভাবে এসে ইংরেজী কবিতায় যে যাঁর নিজস্বভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে কন্নড সাহিত্যে নতুন নতুন গীতিকাব্যের সম্পদ দান করে যান। তাঁদের কেউ কেউ উল্লাসভরে গেয়ে শোনান কন্নড দেশের অতীত গৌরব গাথা যা ছিল সাহিত্য সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ ফল।

এছাড়া ছিল লোক সাহিত্যের সংগ্রহ ও প্রকাশ। নিরক্ষর গ্রাম্য লোকের মুখে মুখে লোকসঙ্গীত শুনে ও সংগ্রহ করে যাঁরা সেগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশের উদ্যম নিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে প্রথম দুটি উল্লেখযোগ্য নাম পল্লী অঞ্চল থেকে আগত প্রসিদ্ধ কবি মধুরসেন এবং সিম্পি লিঙ্গন্না। এই নতুন কর্মোদ্যম (লোকসাহিত্য সংগ্রহ) কর্ণাটকের অন্যান্য অঞ্চলেও গৃহীত হয়। এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি বেন্দ্রে বেশ কিছু অর্থবহ কবিতা লিখলেন লোকসঙ্গীতের ভঙ্গিতে। ওয়ার্ড্‌সওয়ার্থ কোলরিজ প্রভৃতির সময়ে ইংল্যাণ্ডে যে ধারা দৃষ্টিগোচর হয়েছিল সেই ধারা কর্ণাটকেও দেখা দেয়, বিশেষ করে পুরানো পল্লীসঙ্গীতে আগ্রহ এবং সমকালীন কবিদের রচনায় তাদের প্রভাব সৃষ্টিতে। আধুনিক কন্নড-র এই যুগকে বলা যায় গীতি-কবিতা বা রোমান্টিক কাব্যের যুগ।

এই নতুন কবিতার কয়েকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল মনের মুক্তি, অভিনবত্ব ও বৈচিত্র্য। প্রাচীন সাহিত্যে যে গীতিপ্রবণতা ছিল তা প্রধানত বিশেষ বিশেষ ধর্মবিশ্বাসের বা অতীন্দ্রিয়বাদের সঙ্গে যুক্ত। অপরপক্ষে আধুনিক লিরিক সমস্ত রকম ধর্মমত থেকে মুক্ত। আধুনিক কবি আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা খুঁজে পেয়েছে। তার মানে এই নয় যে সে অতীতের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। চাইলে সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারে, আবার চাইলে সে তার প্রকৃতি ও অভিজ্ঞতার উপযোগী করে সেই অতীতকে কাজেও লাগাতে পারে। পাশ্চাত্য প্রভাবে আধুনিক সাহিত্যে নতুন নতুন কাব্যরূপের সৃষ্টি হয়েছে। যেমন অমিত্রাক্ষর ছন্দ, মুক্তছন্দ, সনেট, অপেরা প্রভৃতি। নতুন কবিতায় সামাজিক সচেতনতা থাকলেও এই কবিতা মূলত আত্মনিষ্ঠ ও অন্তর্মুখী। এই ধারার প্রতিক্রিয়ায় সারা ভারত প্রগতিশীল লেখক সংঘের একটি শাখা কর্ণাটকেও প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৩৯ সাল থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কাল সীমায় এই দল লেখকদের দৃষ্টিভঙ্গিতে বিত্তহীন হওয়ার এবং খেতখামারে ও কারখানার মজুরদের বিষয়ে লেখার আহ্বান জানিয়ে একটা আন্দোলনের সূচনা করে। কিন্তু এই দলের প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে নি। ১৯৪৭ সালে এল ভারতের স্বাধীনতা। স্বাধীন ভারতের সমস্যাগুলির সহজ সমাধান খুঁজে পাওয়া গেল না। বছরের পর বছর গড়িয়ে যায়, অপরিণত গণতান্ত্রিক কাঠামোর সেই সমস্যাগুলি আরও জটিল হয়ে ওঠে। কিছু কিছু কবি বেশ বুঝতে পারলেন যে নতুন পরিস্থিতিতে কাব্যরচনা নতুন আঙ্গিক ও নতুন চিত্রকল্পের দরকার হয়ে পড়ে। এই ভাবেই আধুনিকতাবাদী কবিতার জন্ম। কর্ণাটকে আধুনিকতাবাদের আদর্শ ব্যাখ্যা ও আধুনিকতাপন্থী কবিতা রচনার কাজে প্রথম ব্যক্তি হলেন কবি বিনায়ক। অডিগ প্রমুখ অন্যান্য কবিরা আধুনিকতাবাদের নিজ নিজ ধারণা অনুযায়ী বিনায়কের অনুসরণে ঘোষণা করেন যে রোমান্টিক কাব্যের যুগ শেষ হয়ে আসছে। আধুনিকতাপন্থী কবিতার প্রকৃতি ও রূপকল্পনা নিয়ে নানারকম বিদ্যাবুদ্ধির কসরৎ দেখা দিল। এখন তো স্পষ্টই মনে হয় যে আধুনিকতাবাদী লেখকদের মধ্যেও বিভিন্ন দল বিদ্যমান।

ছোটগল্পের উৎপত্তি পঞ্জে, কামাত এবং কেরূর-এর লেখনীতে। সেই ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী বিস্তীর্ণ হয় মাস্তির গল্পগুলিতে। ১৯২০ সাল থেকে ছোট-গল্পের ধারা নিজস্ব বেগ ও বিস্তার নিয়ে প্রবাহিত হয়ে আসছে। ছোটগল্পের

আধুনিক সংজ্ঞা অনুযায়ী মাস্তি-ই কন্নড-র প্রথম ছোটগল্প লেখক। তাঁর ছোটগল্পে আঙ্গিকের সচেতনতার বদলে সহজ সাবলীল শিল্পকলা প্রকাশমান। তাঁর এই প্রেরণার প্রধান উৎস হল তাঁর চারদিককার মানুষ ও তাদের সংস্কৃতি সম্পর্কে লেখকের গভীর বোধ ও উপলব্ধি, যার প্রতিফলন ঘটেছে লোকগুলির কথায় ও কাজে। ঠিক একই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাই আনন্দকল্প, সি. কে. বেঙ্কটরামাইয়া, গোরূর রামকৃষ্ণ আয়েঙ্গার এবং কৃষ্ণকুমারের গল্পে, যদিও তাঁদের প্রকৃতি অনুযায়ী তাঁদের বিষয়বস্তু ও ধরনধারণ কিছু পৃথক। এই সমস্ত গল্পে সাধারণ মানুষের, বিশেষ করে পল্লীবাসীদের, বিভিন্ন দিক প্রতিবিম্বিত। কারন্ত, অ না কৃ, তরাসু এবং আরও কয়েকজন তুলে ধরেছেন মানুষের মূঢ়তা ও দুর্বলতা এবং দুঃখকষ্টকে। মিবৃজি অন্নারাও এবং বসবরাজ কত্তিমনির মতো গল্পকার দেশের দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষের ভয়ঙ্কর ছবি এঁকেছেন। আনন্দ এবং গোপাল কৃষ্ণরাও পারিপার্শ্বিক জীবনের দুঃখদুর্দশা সম্পর্কে অবহিত থাকলেও তাঁদের গল্পে ফুটে উঠেছে সৌন্দর্য ও আনন্দময় জীবনের ছবি। উভয়ের ছোটগল্পে আঙ্গিকের চাতুর্য লক্ষণীয়। আধুনিকতাপন্থী লেখকেরা ছোটগল্পে অর্থবহ দান রেখে গেছেন দুটি উপায়ে—আধুনিক নরনারীর চিত্ত বিশ্লেষণে এবং বিষয়বস্তুর প্রতীকী উপস্থাপনায়। বললে মোটেই অতিশয়োক্তি হবে না যে কন্নড ছোটগল্প বিষয়বস্তুতে বিচিত্র, পরিধিতে ব্যাপক এবং আঙ্গিকে বিভিন্ন। তবে একথাও স্বীকার্য যে বেশ কিছু রচনা দুর্বল ও অপরিচিত, অনুকরণমূলক এবং গুণগতমানের তুলনায় মেদবহুল। মোটের উপর বলা যায়, উৎকর্ষের বিচারে কন্নড সাহিত্যে কবিতার পরেই ছোটগল্পের স্থান।

আগেই বলা হয়েছে যে কন্নড ভাষায় মৌলিক উপন্যাস রচনা শুরু হয় গুলওয়াডি, বোলার, কেরূর এবং পুত্তন্নার হাতে। কালক্রমে নব্য মানবতাবাদের প্রেরণায় বেশি প্রচলিত হয় সামাজিক উপন্যাস। সামাজিক উপন্যাসের প্রথম যুগে আদর্শমূলক বাস্তবতা এর দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রভাবিত করে এবং মধ্যবিত্তের জীবনকথা প্রধান বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে। ধীরে ধীরে পরিধি বিস্তৃত হতে থাকলে সামাজিক উপন্যাসে দরিদ্র ও নিপীড়িত শ্রেণীর জীবন চিত্রিত হয়। এই জাতীয় উপন্যাসে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেন আনন্দকন্দ, কারন্ত, অ. না. কৃ. কুবেম্পু, গোকাক, কত্তিমণি, তরাসু, নিরঞ্জন,

মিরজি, ইনামদার, পুরাণিক, ত্রিবেণী, এম্. কে. ইন্দিরা এবং অন্য কয়েকজন। এঁদের বিষয়বস্তু নির্বাচনে উজ্জ্বল অভিনবত্ব আছে বটে, কিন্তু জীবনের বিশালতা এবং সমস্যার প্রাচুর্যের তুলনায় বৈচিত্র্য বেশি নেই। যে দুখানি বৃহৎ উপন্যাসে মলেনাড অঞ্চলের মানুষের জীবনকাহিনী ব্যাপকভাবে বর্ণিত, তা হল কুবেম্পুর "কানূরু সুব্বম্মা হেন্‌গভিতি" এবং "মলেগলল্লি মদুমগলু"। কারন্তের "মরলি মন্নিগে" উপন্যাসেও অনুরূপ বিশালতা ও তাৎপর্য—এতে একই পরিবারের তিন পুরুষের কাহিনী বলা হয়েছে। গোকাক-এর "সমরসবে জীবন"ও উপন্যাসের মহাকাব্যোচিত আয়তনের বৃহৎ পটভূমিকায় চরিত্রচিত্রণ লক্ষণীয়। সাধারণত যা হয়ে থাকে, নিকৃষ্টমানের সস্তা উপন্যাসের কেবল সংখ্যা বৃদ্ধি নয়, উৎকৃষ্ট উপন্যাসের তুলনায় তাদের জনপ্রিয়তাও বেশি। ঐতিহাসিক উপন্যাসের সফল প্রবক্তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম আনন্দকন্দ, দেবুডু, তরাসু, এবং পুট্টস্বামাইয়া। 'সান্তলা' কাহিনীর ঘটনা বিন্যাসে বিস্ময়কর ক্ষমতার পরিচয় কে. ভি. আয়ার এই গোষ্ঠীভুক্ত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছেন। আরও কিছু তরুণ লেখক ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। পাশ্চাত্য কথাসাহিত্যের মতো কন্নড কথাসাহিত্যও আঞ্চলিক, সমস্যাপ্রধান, মনস্তাত্ত্বিক বিশেষ-করে চেতনা প্রবাহমূলক এবং আধুনিকতাবাদী উপন্যাসে দেখা দিয়েছে।

নাট্যজগতে কিছু অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন লেখক যে তাঁদের শ্রেষ্ঠ শক্তি নিয়োজিত করেছেন এটা কন্নডভাষীর পক্ষে অবশ্যই গর্বের বিষয়। কিন্তু একথা বলা যায় না যে একটু একটু করে শক্তিলাভ করলেও কন্নড রঙ্গমঞ্চ তখনই সাবালক হয়ে উঠেছে। পেশাদার ও সৌখীন মঞ্চের মধ্যে বিরাট ব্যবধান। শিল্পগুণ এবং অভিনয় কলার সংযোগে যথার্থ জনপ্রিয় নাটকের সংখ্যা অল্পই। কন্নড নাট্যক্ষেত্রে কয়েকটি বিশিষ্ট নাম হল কৈলাসম্, শংস, শ্রীরঙ্গ এবং কারন্ত। এঁরা সকলেই নাটকীয় অন্তর্দৃষ্টি, নাট্যবস্তু ও আঙ্গিকের পরীক্ষা নিরীক্ষায় আগ্রহ এবং মঞ্চবোধের প্রচুর পরিচয় দিয়েছেন। অবশ্য তাঁদের নাটকগুলিতে গুণ ও দোষ দুইই বর্তমান। সংলাপের দীপ্তিতে কৈলাসম্-এর স্থান সকলের চেয়ে উঁচুতে। ঐতিহাসিক ঘটনা বিন্যাসে সাহসের উৎকর্ষ সন্দেহাতীত। শ্রীরঙ্গ তাঁর কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন কঠোর সামাজিক ব্যঙ্গ, উদ্ভট কল্পনাশক্তি এবং ক্ষিপ্র রসিকতাবোধে। কাব্যনাট্য

ও অপেরা সৃষ্টির পরীক্ষায় কারন্ত সফল। একাংক রচনায় এই সব নাট্য-কারদের সঙ্গে বেন্দ্রে, কুবেম্পু, পর্বতবাণী এবং তংকের নাম করা দরকার। সম্প্রতি গিরিশ কর্ণাড, লঙ্কেশ সহ আরও কয়েকজন অভিনব বিষয়বৈচিত্র্য ও আঙ্গিকের ক্ষেত্রে এগিয়ে আসছেন। 'প্রত্যুৎপন্ন নাটক এবং রেডিও নাটক-রূপে নাট্যকলার নতুন দুটি বিভাগ দেখা দিয়েছে।

ব্যক্তিগত রচনা এবং চিন্তামূলক প্রবন্ধ কন্নড সাহিত্যে সম্পূর্ণ নতুন হলেও এক্ষেত্রে দক্ষতা দেখিয়েছেন এ. এম্. মূর্তিরাও, এন. কস্তুরী, পি. টি নরসিংহাচার, বীচি এবং রাকু। এঁদের কেউ কেউ গুরুগম্ভীর চিন্তাশীল রচনায় পারদর্শী, অন্য কেউ কেউ হাস্যরসমূলক ব্যঙ্গাত্মক রচনায়। নতুন নতুন লেখক এই দ্বিতীয় শ্রেণী নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। প্রথম দিকে বিজ্ঞানমূলক সাহিত্য ছিল খুবই সামান্য। সম্প্রতি রাজ্যবিশ্ববিদ্যালয়-গুলির প্রকাশন বিভাগের এবং অন্য উদ্যমী প্রকাশকদের অনলস প্রচেষ্টায় এই সাহিত্যের প্রভূত উন্নতি সাধিত হচ্ছে। এইভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমস্ত শাখায় গবেষণাধর্মী পুস্তক এবং দর্শন ও সংস্কৃতি বিষয়ক গ্রন্থাদিসহ ভ্রমণ-কাহিনী ও জীবনী সাহিত্য ও প্রসারিত হয়েছে।

দশম অধ্যায়

আধুনিক কবিতা

সাহিত্যের কয়েকটি সুপরিচিত শাখায় আধুনিক কন্নড সাহিত্যের অগ্রগতি সম্পর্কে নবম অধ্যায়ে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। বর্তমান অধ্যায় থেকে প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ নিয়ে কিছু বিশদ আলোচনা প্রসঙ্গে কন্নড স্যাহিত্যের বিকাশ সাধনে সংশ্লিষ্ট লেখকদের অবদান সম্পর্কে মূল্য নির্ণয় করা হচ্ছে।

আধুনিক কবিতার একেবারে গোড়ার ভাব-স্ফুরণের মধ্যেপঞ্জে মঙ্গেশ রাও র (১৮৭৪-১৯৩২) কবিতা সংখ্যায় কম হলেও গীতিকবিতার আবেগপূর্ণ প্রগাঢ়তায় এবং প্রকাশের বলিষ্ঠতায় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। তাদের বেশির ভাগ শিশুদের জন্য লিখিত এবং পাঠ্য পুস্তকে মুদ্রিত হলেও উৎকর্ষের বিচারে উপেক্ষণীয় নয়। এমনি একটি কবিতার নাম 'উদয়রাগ'। এতে সূর্যোদয়ের রঙীন দৃশ্য বর্ণনাচ্ছলে সুকৌশলে একটি উপদেশাত্মক বাণী ব্যক্ত করা হয়েছে। 'বেঙ্কান গালিয়াত' নামে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কবিতায় সবলভঙ্গিতে বর্ণিত হয়েছে কীভাবে দক্ষিণা বাতাস গতিবেগ বৃদ্ধি করে প্রবাহপথে বিপর্যয় সৃষ্টি করে। ধীর সমীর থেকে প্রভঞ্জন সৃষ্টির ক্রমবর্ধমান বেগমাত্রা কবি যে উপযুক্ত চিত্রকল্প ও কাব্যভাষার সাহায্যে রূপায়িত করেছেন তা সত্যই বিস্ময়-জনক। ছন্দ, লয়, গতি, শব্দ ও ধ্বনির সুসংগত সমন্বয়ে অভীপ্সিত ফল-শ্রুতির জন্য কবিতাটি নিখুঁত শিল্প সৃষ্টির নিদর্শন হয়ে আছে।

বি. এম্. শ্রীকণ্ঠাইয়া ('শ্রী') (১৮৮৪-১৯৪৬)

ইতিপূর্বেই 'শ্রী'কে আধুনিক কবিতা আন্দোলনের নেতা ও পথ প্রদর্শক-রূপে পরিচিত করা হয়েছে। 'ইংগলিশ গীতগল্প' নামে তাঁর যুগপ্রবর্তক ক্ষুদ্র বইটিতে নিজস্ব তিনটি মৌলিক কবিতা ও ষাটটি ইংরেজী কবিতার অনুবাদ রয়েছে। রোমাণ্টিক ধারার ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, শেলী, বার্নস্, প্রভৃতির এবং ব্রাউনিং প্রভৃতি অন্য কবিদের কয়েকটি সুপ্রসিদ্ধ কবিতা বাছাই করে সেগুলির কন্নড পদ্যানুবাদ করেন। কার্যত সেগুলি অনুবাদ হলেও অনুবাদ প্রক্রিয়ায়

মৌলিক কবিতার স্থান নিয়ে প্রকাশমান। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কবি মূল কবিতার সারাংশ অনুধাবন করে কন্নড ভাষায় উপযুক্ত শব্দ ও ছন্দের ছাঁচে প্রবাহিত করেছেন। সার্থক অনুবাদের উত্তম নিদর্শন রূপে গ্রহণযোগ্য এই কবিতাগুলির মধ্যে Thomas Hood-এর 'The Bridge of Sighs'-এর অনুবাদকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলা চলে। 'শ্রী' তাঁর এই গ্রন্থের দৃঢ় ভিত্তির উপর গীতিকবিতাকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে তরুণ কবিদের সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছেন। প্রকৃতি, প্রেম ও দেশাত্মবোধ প্রভৃতি ইংরেজী কাব্যের বিষয়বস্তু কন্নড রূপ ধারণ করে সে যুগের নবীন কবিদের অনুরূপ কবিতা রচনার প্রেরণা জুগিয়েছে। ছন্দের নতুন আদর্শ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে 'শ্রী' যে কন্নড কাব্যরীতির প্রবর্তন করেছেন তা অতীতের সাহিত্যভাণ্ডার থেকে সংগৃহীত খাঁটি কন্নড শব্দ দিয়ে গঠিত। এইভাবে তিনি কন্নড কাব্যের পথপ্রদর্শক ও অগ্রগণ্য গুরুরূপে আধুনিক কবিতাকে সঠিক পথে পরিচালনা করার প্রেরণা দিয়ে গেছেন।

তাঁর নিজস্ব মৌলিক কবিতা সংগ্রহের নাম 'হোঙ্গনসুগলু' অর্থাৎ 'সোনার স্বপ্নগুলি'। নামটি খুবই সার্থক। কারণ এই কবিতাগুলির মধ্যে পাই কবির ব্যাপক জীবনদৃষ্টি, ভারতবর্ষ তথা মহীশূরের জন্য তাঁর জ্বলন্ত অনুরাগ এবং কন্নডদেশের গৌরবময় অতীত ও উন্নতিশীল ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উপলব্ধি করবার মতো তাঁর সহজ বোধশক্তি। তাঁর একটি শ্রেষ্ঠ কবিতার নাম 'কন্নড তায় নোট'—কবির চোখে দৃষ্ট কন্নড মায়ের পীড়িত দৃষ্টির কাব্যরূপ। মায়ের মুখে উচ্চারিত কিছু তীক্ষ্ণ কটু শব্দ এইরূপ :

'শোনো ভাই, আমি এক বৃদ্ধা তত্ত্বাবধায়িকা মা, এক সময়ে ছিলাম খুব স্বচ্ছন্দে। এখন আমি দরিদ্র ও জীর্ণ, আমার সন্তানেরা অধঃপতিত ও নিদারুণ যন্ত্রণাকাতর। আমি আরও কৃশ হয়ে পড়েছি, আমি মুমূর্ষু, তবু আমার কপালে মরণ নেই। নতুন বর্ষাপাতে নতুন স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হয় এবং আমার ভগিনীদের নতুন গর্ববোধে পুনর্যৌবন লাভ হয়। তারা সকলেই মনোহর, স্বর্ণসম মূল্যবান। চেয়ে দেখো, এদিক ওদিক হেলেদুলে তারা সকলে আনন্দোৎসবে রত। কী মধুর দৃশ্য!' এই কাহিনীর উপসংহারে মা যখন বার বার বলে, 'আমার সন্তানদের জীবনে একদিনের তরেও আনন্দ নেই, উৎসব নেই', তখন তা মর্মস্পর্শী হয়ে ওঠে। ওড্ (Ode) বা

গাথাকবিতার ঢঙে ছয়টি অংশে এবং শতাধিক পঙ্‌ক্তিতে রচিত এই কবিতা চিরপ্রেরণার উৎস। কবির অন্যান্য কবিতার মধ্যে 'শুক্রগীতে' কবিতায় তাঁর জীবনদৃষ্টির সারাংশ নিহিত—'একমাত্র সত্যেরই জয় হবে, অসত্যের নয়। জ্ঞানই অমৃত, অজ্ঞতা নয়। সর্বজনীন দৃষ্টিময়ী ভারতমাতাকে—বিশ্বভারতীকে প্রণাম করো, অন্য কোথাও মাথা নত করার দরকার নেই।'

গোবিন্দ পাই

গোবিন্দ পাই প্রথম প্রজন্মের একজন অগ্রণী কবি। তাঁর মৌলিক গীতি-কবিতাসমূহ 'গিলিবিন্দু' নামক গ্রন্থে সংগৃহীত। এছাড়া স্বতন্ত্রভাবে আছে তাঁর ওমর খৈয়াম প্রভৃতির অনুবাদ। তাঁর কবি-প্রতিভার সার্থকতা ঐশ্বর্যপূর্ণ চিত্রকল্প নির্মাণে, যার মধ্যে তাঁর ইতিহাস চেতনা ও পাণ্ডিত্যের ছাপ সুস্পষ্ট। কখনও কখনও তাঁকে বিচার বুদ্ধিহীন পণ্ডিতী পেয়ে বসে এইভাবে যে তিনি কাব্যে অসাধারণ শব্দ প্রয়োগ করে টীকায় তার ব্যাখ্যা যোগ করে দেন। একথা অবশ্য অস্বীকার করা যায় না, তাঁর কয়েকটি শ্রেষ্ঠ কবিতায় প্রকৃত কবিত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। 'যুদ্ধের আহ্বান' নামে একটি জর্মান কবিতার অনুবাদে তাঁর বলিষ্ঠ ও পরার্থপরায়ণ জীবন দর্শনের পরিচয় আছে। গোবিন্দ পাই তাঁর বৃহত্তর কবিতাগুলিতে ইতিহাসের যে কয়েকজন মহা-পুরুষের শেষ দিনটি বর্ণনা করেছেন তাতেই তাঁর গভীর বোধশক্তির পরিচয় এবং সেখানেই তাঁর অসাধারণ অবদানের স্বাক্ষর॥ এক্ষেত্রে তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা 'গোলগোথা' কাব্যতে যীশুখ্রীস্টের ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার দিনের ঘটনাগুলি খুব জীবন্তভাবে বর্ণিত হয়েছে। একজন ভারতীয় কবি স্থান ও কালের দিক থেকে বহু দূরবর্তী একটি বিষয় নির্বাচন করে সেই শোকপ্রদ ঘটনার ভৌগোলিক অবস্থান ও ইতিহাস গভীর ও বিশদভাবে অধ্যয়ন করে এবং তাঁর মানসপাত্রে সমস্ত উপদেশ যেভাবে আত্মসাৎ করেছিলেন, চারশো পঙ্‌ক্তির এই কাব্যটি কবির সেই মানসিকতা ও কল্পনাশক্তির বাঙ্‌ময় সাক্ষ্য। উপযুক্ত চিত্রকল্পে অর্থপূর্ণ ব্যাখ্যানে এবং স্বতঃস্ফূর্ত শব্দসম্ভারে সমৃদ্ধ এই কবিতাটি অত্যন্ত প্রগাঢ় সৃজনশক্তির উদাহরণ। কবিতাটিতে উপমা ও রূপক অলঙ্কারের প্রাচুর্য থাকলেও সেই অলঙ্কার কখনও ঔচিত্যের সীমা লঙ্ঘন করে শব্দাড়ম্বরে পরিণত হয় নি। কবিতাটির প্রথম কয়েকটি পঙ্‌ক্তির মধ্যেই সুরটি বাঁধা হয়ে

গেছে। 'মোরগ তৃতীয়বার চীৎকার করে উঠে যীশুখ্রীস্টের ভাবী ইহুদী অত্যাচারীদের বিবেকের মতো ঝিমিয়ে পড়ে। বিচারক যে রূঢ় পদ্ধতিতে শুনানীর কাজ পরিচালনা করেন তার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে চন্দ্র অস্তমিত হয়।' যখন যীশুখ্রীস্টকে গোলগোথা পাহাড়ে নিয়ে গিয়ে ক্রুশে চড়ানো হল, তখন তাঁকে দেখে মনে হল যেন শ্যেন পক্ষী কবলিত একটি নিরীহ পাখি, যেন পশ্চিম আকাশে উদীয়মান বিবর্ণ ক্ষীণ চন্দ্র, যেন ধনুকে যোজিত শর, যেন মৃত্যু-তরুতে দোলায়িত অমরত্বের ফল। উপমাগুলি সার্থক ও সুসংগত। কবি একই সুরে বুদ্ধের শেষ দিনটি নিয়ে 'বৈশাখী' নামে ৬০০ পঙ্‌ক্তির একটি দীর্ঘতর কাব্য রচনা করেন। এই কাব্যেও অনুরূপ বুদ্ধিবৃত্তি এবং অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন কল্পনাশক্তি প্রদর্শিত হলেও 'বৈশাখী'তে গোলগোথার মতো সমুন্নত ভাবটি লক্ষ্যগোচর হয় না।

ডি· ভি· গুণ্ডাপ্পা

প্রথম প্রজন্মের অপর এক প্রসিদ্ধ কবি ডি. ভি. গুণ্ডাপ্পা। তাঁর প্রকীর্ণ কবিতাগুলি 'বসন্তকুসুমাঞ্জলি' এবং 'নিবেদন' নামক সংগ্রহ গ্রন্থে সংকলিত। বেলুর-এর চেন্নকেশব মন্দিরে প্রাচীর মূর্তির সৌন্দর্য বর্ণনা করে তিনি যে গানগুলি লিখেছিলেন তা 'অন্তঃপুরগীতে' নামে সংগৃহীত। 'উমরন ওসগে' নাম দিয়ে তিনি ওমর খৈয়ামেরও কন্নড অনুবাদ করেছেন। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা চার চরণ বিশিষ্ট স্তবকের প্রায় এক হাজার স্তবকে গ্রথিত 'মাংকু তিম্মন্না কগ্‌গা'। এই কাব্যে গল্পের আকর্ষণ বলতে কিছু নেই, চরিত্র চিত্রণও দুর্বল। এতে আছে পরিণত বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন কবির জীবন সম্পর্কে গভীর মন্তব্য। আর আছে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিন্তার গভীর জ্ঞান এবং স্বীয় বিশাল অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা কবির জীবনদর্শন। এই সকল জ্ঞানের কথাকে যে কেবল ছন্দোবদ্ধই করা হয় নি, প্রায় সার্থক কাব্যে রূপায়িত করা হয়েছে তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত : 'পুস্তক লব্ধ বিদ্যা মাথার মণির মতো। আর মনের মধ্যে বিকশিত জ্ঞান বৃক্ষোৎপন্ন পুষ্পের মতো।'…'জীবন হল ঝটকা গাড়ি, নিয়তি তার 'সাহেব' (অর্থাৎ চালক), তোমরা সেই চালকের নির্দেশে চলা ঘোড়া, যেমন আদেশ তেমনি ছুটতে হবে কোনো বিবাহমণ্ডপ অথবা কবরখানার দিকে। তুমি যদি হোঁচট খেয়ে পড়ে যাও, মাটি তোমাকে বরণ করে

নেবে।' জীবন সম্পর্কে ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্যাদি ছাড়া কবি তাঁর জ্ঞানের কথায় সাহস বিশ্বাস বিকীর্ণ করেন: 'বিচার লাভের জন্য লড়াই করবে মক্কেলের মতো, যখন বিচারকের রায় বেরোবে সাক্ষীর মতো উদাসীন থাকবে, তপস্বীর মতো জীবন নির্বাহ করো আর অন্তরে থাকো পাখির মতো নির্বিকার।...জীবন হল কঠিন সংগ্রাম। এই ভয়ে যে পালিয়ে যায় সে কি নিয়তির কঠিন দণ্ড এড়াতে পারবে? হৃদয়কে ইস্পাতের মতো দৃঢ় করো, মনকে শক্ত করে বাঁধো, নিয়তির মুখোমুখি দাঁড়াও, তোমার জয় অবশ্যম্ভাবী।'

মাস্তি বেঙ্কটেশ আয়েঙ্গীর ('শ্রীনিবাস')

আধুনিক কন্নড সাহিত্যের একজন বড় লেখক হলেন মাস্তি। 'শ্রীনিবাস' ছদ্মনামে তিনি বহুসংখ্যক গীতিকবিতা ও আখ্যান কাব্য লিখে কন্নড কাব্য সাহিত্যে অসাধারণ কীর্তির অধিকারী। তিনি যে আধুনিক হয়ে দেশের শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতিকে আত্মভূত করে নিতে পেরেছেন তার থেকেই তাঁর স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের আভাস মেলে। ভগবদ্‌ভক্তি, ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ, সদাচারে বিশ্বাস, দেশপ্রীতি এবং নারীজাতির প্রতি সম্মান—এই সমস্ত গুণ কবির সত্তার গভীরে দৃঢ়মূল থেকে তাঁর রচনায় প্রকাশিত হয়েছে। গদ্য পদ্য উভয় ক্ষেত্রে গল্প বলায় তিনি সুদক্ষ। তাঁর রচনারীতি সহজ সরল এবং শিল্পকৌশল পূর্ণ হয়েও চাতুর্য বিহীন। বিন্নহ, অরুণ, তাবরে, চেলুবু, মলার, সুণীতা, মানবী প্রভৃতি তাঁর কয়েকটি কাব্যসংকলন। 'বিন্নহ' এবং 'মানবী' গ্রন্থে তাঁর ভক্তিসংগীত সংকলিত। প্রথাগত ভক্তিকাব্যের সগোত্র হলেও সেগুলি শুধু অনুকরণাত্মক নয়, কবিচিত্তের অকপট অভিজ্ঞতা থেকে উৎসারিত ভাবানুভূতির ফলে আবেগচঞ্চল। উন্নত চিত্রকল্প বা প্রগাঢ় আবেগ সমৃদ্ধ তো বটেই, এই গান ও কবিতাগুলির প্রাণকেন্দ্রে যেমন আন্তরিকতা, তেমনি স্বচ্ছ-স্বাভাবিকতা বর্তমান। 'তাবরে' এবং 'চেলুবদেবী' কবিতা দুটি জীবন ও প্রকৃতি সম্পর্কে কবির নিজস্ব প্রতিক্রিয়ার নিদর্শন। দ্বিতীয় কবিতাটিতে পাই বিন্ধ্যপর্বতমালায় অপরাহ্ণবেলার এক চমৎকার সূর্যাস্তের সময়ে একটি রমণী এসেছে নদীতে জল নেওয়ার জন্য; এই দৃশ্যে কবি যে সৌন্দর্য দৃষ্টি লাভ করেন তা থেকে বুঝতে পারেন যে, যে-সৌন্দর্য আমাদের হৃদয় জয় করে তা হল

জগতের মানবিক দিক, অদৃশ্য দেবতার গোপন লীলা রহস্য। 'মালার' গ্রন্থে নানা ঘটনা ও ব্যক্তিকে নিয়ে লেখা আশিরও বেশি সনেট সংকলিত। তাঁর কয়েকটি আখ্যান কাব্য হল গৌডর মল্লি, রামনবমী, মুকন মক্কলু, নবরাত্রি। 'রামনবমী'তে এমন এক গ্রাম্য মোড়লের কাহিনী বলা হয়েছে যে বিশ্বাস করত যে নির্বাসনযুগে ভ্রমণ করতে করতে রামনবমীর দিনে সীতা ও লক্ষ্মণ সহ রামচন্দ্র নিকটবর্তী একটি গাছের সামনে এসে দাঁড়ান এবং প্রতি বছর ঐ দিনটিতে সেখানে তাঁকে দেখা যায়। এই ঘটনায় কবিচিত্তে সত্যের চিন্তা জেগে ওঠে। তিনি বলেন—'যা আমাদের জীবনকে আলোকিত করে তা-ই হল সত্য। যা আলোকিত করে না, তা হল সত্যের অপচ্ছায়া।' কথাটির তাৎপর্য হল এই যে, যে-বিশ্বাস বিভ্রান্ত হলেও সঠিক পথে চালিত করে তারই নাম সত্য। 'নবরাত্রি' গ্রন্থে বিভিন্ন প্রসঙ্গের উপর অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত প্রায় ২০টি আখ্যান কাব্য রয়েছে। কাহিনীর সরল প্রবাহ থেকে মনে হতে পারে এক্ষেত্রে পদ্যছন্দ প্রায় গদ্যেরই তুল্য, কিন্তু একটি সূক্ষ্ম কবিত্বময় চেতনা যে গল্পগুলিকে বিশেষ সৌন্দর্য মণ্ডিত করেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

দিবাকর

সুপ্রসিদ্ধ স্বদেশভক্ত রঙ্গনাথ দিবাকর কন্নড ভাষায় ভারতীয় দর্শন ও ভক্তি সাহিত্যের উপর ব্যাখ্যানমূলক কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন। সাহিত্যিক গঠনে তাঁর 'অন্তরাত্মনিগে' নামক ক্ষুদ্র বইটি দ্বাদশ শতকের বচন সাহিত্যের সঙ্গে তুল্য বলে বিশিষ্ট। অন্তরাত্মাকে উদ্দেশ করে লিখিত ৫৭টি গীতোচ্ছ্বাসে আমরা লেখকের অন্তর্দর্শন, ভক্তি, উল্লাস প্রভৃতি মানসিক অবস্থার পরিচয় পাই। কয়েকটিতে অতীত ও বর্তমানের প্রতিধ্বনি শোনা যায়। তৎসত্ত্বেও বইটি বিশিষ্ট এই কারণে যে এতে এমন এক আধুনিক ভক্তের আত্মপ্রকাশ রয়েছে যিনি আধ্যাত্মিক পথে অগ্রগতির জন্য ব্যাকুল অথচ বিশেষ কোনো ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত নন।

সালি

সালি রামচন্দ্ররাও এমন একজন আবেগপ্রবণ প্রবীণ কবি যিনি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও উচ্চ আদর্শের চিন্তায় রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠেন। রচনারীতি ও

ছন্দগঠনে সাধারণত তিনি প্রাচীন পন্থার অনুগামী। তাঁর 'চিত্রসৃষ্টি' নামক গ্রন্থে সংকলিত কবিতাগুলির মধ্যে যে জ্বলন্ত স্বদেশপ্রেম, কন্নড ভাষার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ, ঐকান্তিক প্রকৃতি প্রেম এবং উচ্চ আদর্শবোধ প্রতিফলিত, তার প্রশংসা না করে পারা যায় না। তাঁর রচনাশৈলী সাধারণত কান্তকোমল পদাবলী হলেও জীবন ও প্রকৃতির ভয়ঙ্কর দিক বর্ণনায় তদুপযোগী হয়ে ওঠে। মাঝে মাঝে তাঁর কল্পনা অত্যুচ্চ গ্রামে পৌঁছে যায়। রবীন্দ্রনাথের কবিতার দ্বারা প্রভাবিত তাঁর 'অভিসার' ঐ একই বিষয়ে রচিত একটি চমৎকার আখ্যান কবিতা। ব্যক্তিগত শোকের ফলে রচিত তাঁর 'তিলাঞ্জলি' একটি মর্মস্পর্শী শোকগাথা।

ডি. আর. বেন্দ্রে (অম্বিকাতনয়দত্ত)

আধুনিক কন্নড কবিতার অন্যতম বিশিষ্ট পথিকৃৎ রূপে তো বটেই, আধুনিক কন্নড সাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষ বলেও বেন্দ্রে সুপ্রসিদ্ধ। 'অম্বিকাতনয়-দত্ত' এই ছদ্মনামে তিনি 'কৃষ্ণকুমারী' থেকে শুরু করে বিপুল সংখ্যক গীতিকবিতা ও আখ্যান কাব্য রচনা করেছেন। 'গরি' থেকে 'বাহত্তর' পর্যন্ত তাঁর কাব্যসংকলনের সংখ্যা প্রায় কুড়ি। তাঁর কয়েকটি কাব্যসংকলন সমবেত-ভাবে 'অরলুমরলু' নামে প্রকাশিত। দৈহিক, জৈব, মানসিক ও অতি-মানসিক—জীবনের সর্ব অংশ থেকে তিনি বিষয়বস্তু বেছে নিয়েছেন। তাঁর বেশির ভাগ কবিতা গীতধর্মী, তবে কয়েকটি কবিতায় বর্ণনার ধারাবাহিকতা রয়েছে। যেমন, তাঁর বিবাহিত জীবন নিয়ে লেখা দীর্ঘ কবিতা 'সাখীগীত'। প্রতীকী তাৎপর্য মণ্ডিত একগুচ্ছ কবিতা রয়েছে 'মূর্তি' নামক গ্রন্থে। ব্যক্তিগত শোক নিয়ে রচিত শোকসঙ্গীত 'হাডুপাডু'। কয়েকটি গীতিকবিতার পটভূমি কোনো কল্পিত গল্প বা নাটক। সমুদ্রগর্ভ থেকে হঠাৎ দৃষ্টিপথে আসা দ্বীপের মতো ঐ কবিতাগুলিও অকস্মাৎ আবিষ্কৃত হয়। বেন্দ্রের রচনার গঠন বিন্যাস জটিল ও ছলনাময় বলে তাঁর কবিতায় কবির ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা কতটা প্রতিফলিত বলা কঠিন।

এক অর্থে বেন্দ্রের কবিতা কেবল আবেগপ্রসূত উচ্ছ্বাস নয়, সেগুলি নান্দনিক স্তরে একপ্রকার বুদ্ধিবৃত্তির কসরৎ। অভিজ্ঞতা ও চিন্তার বিভিন্ন স্তর-সম্পৃক্ত তাৎপর্যে পরিপূর্ণ। এই শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলি প্রকৃতিতে

বহুমাত্রিক। গীতধর্মিতা না হারিয়েও সেগুলি বৌদ্ধিক ও অতীন্দ্রিয় ইঙ্গিত-পূর্ণ বোধাতীত সৌন্দর্যের প্রকাশ। বেন্দ্রের এমনি একটি মহৎ কবিতার নাম 'ভাবগীতে'। 'হক্কি হরুতিদে নোভিদিরা' সৃষ্টি-সংক্রান্ত চিত্রকল্পময় এমন একটি কবিতা যাতে কাল-বিহগের পলায়ন বর্ণিত। সর্বব্যাপক জীবননীতি রূপে কবির পূর্ণ আনন্দের স্বপ্ন প্রতীকরূপে চিহ্নিত হয়েছে 'হুনিয়োমু বার' কবিতায়। আমাদের দেশে বিভিন্ন শ্রেণীর বৈষম্য এবং দুঃস্থ মানুষের ভয়াবহ দারিদ্র্যের উপর প্রচণ্ড রকমের আলোকপাত করা হয়েছে 'তুত্তিন চীল' এবং 'কুরুদ কাঞ্চন' কবিতা দুটিতে।

'তুত্তিন চীল' কবিতায় ক্ষুধার্ত জনগণের চরম নৈরাশ্য যে ভয়ঙ্কর শব্দরূপ পেয়েছে তার কিছুটা এইরকম : 'মৃত দেবতার উপর স্মৃতি-স্তম্ভ নির্মাণ করতে করতে ধর্মের ধূপ জ্বালাতে জ্বালাতে, নিঃশ্বাসের ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে এবং মৃত্যু যন্ত্রণা অনুভব করতে করতে দরিদ্রের গ্রাস-স্থলী (অর্থাৎ উদর) আর্তনাদ করে সমস্ত দুনিয়াটাকে গরগর করে গিলে ফেলতে চাইছে।' 'কুরুদ কাঞ্চন' কবিতায় ধনের ঔদ্ধত্য বর্ণনা করা হয়েছে অত্যন্ত হৃদয়বিদারক সৃজন-শীল চিত্রকল্পের সাহায্যে। একটি ক্ষুদ্র গীতের মধ্য দিয়েও যে কত মহৎ কবিতার সৃষ্টি হতে পারে এই কবিতাটি তারই নিদর্শন।

কথ্যভাষার প্রয়োগকে গভীর অর্থবহ করে তুলতে বেন্দ্রে অতুলনীয়। অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে তিনি লোকসাহিত্যের বিভিন্ন রূপকে ব্যবহার করেছেন। তিনি পরীক্ষা করেছেন নানারকম ছন্দ নিয়ে, এমনকি বৈদিক ছন্দও বাদ যায়নি। তাঁর কবিতায় নিগূঢ় অধিবিদ্যার উপাদান বেশি হওয়াতে ভাষা প্রায়ই জটিল ও অপরিচ্ছন্ন। তাঁর বৌদ্ধিক তত্ত্ব ও অতীন্দ্রিয় অনুভূতি তাঁর সমগ্র সত্তায় ও রচনায় এমনভাবে অনুস্যূত যে বিচক্ষণ পাঠকের পক্ষেও তাঁর রচনার সম্পূর্ণ তাৎপর্য বোঝা কঠিন। কোনো কোনো কবিতায় শব্দ ও ছন্দের উচ্ছ্বাসময় সমৃদ্ধি মূল বক্তব্যকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। এই সমস্ত ত্রুটি সত্ত্বেও কবির একটা বিশ্বজাগতিক চেতনা তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলির মূল প্রেরণা। এই চেতনা প্রকৃতিতে ও বক্তব্যে মৌলিক এবং ভাবার্থে গভীর। বেন্দ্রের কাব্যরচনার ফলে কন্নড কবিতা অসাধারণ দীপ্তি এবং একটা নতুন মাত্রা লাভ করে সমৃদ্ধতর হয়েছে।

কৃষ্ণশর্মা বেটগেরি (আনন্দকন্দ)

প্রথম দলের বিশিষ্ট কবি আনন্দকন্দ তাঁর প্রেরণা পেয়েছিলেন প্রাচীন কন্নড ক্লাসিক এবং লোকসাহিত্য থেকে। স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগে দেশাত্মবোধক কবিতা রচনা দিয়ে তাঁর সাহিত্য চর্চার সূত্রপাত। তারপরে তিনি কবিতা লিখেছেন শিশুচিত্ত, প্রকৃতি ও প্রেম নিয়ে। তাঁর 'মুদ্দন মাতু' কন্নড ভাষায় শিশুদের জন্য রচিত প্রথম কবিতাপুস্তক। শিশুর মনের কথা বলা হয়েছে বলে এই প্রসঙ্গে স্বভাবতই রবীন্দ্রনাথের Crescent Moon ('শিশু') বইটির কথা মনে পড়বে, কিন্তু 'মুদ্দন মাতু' আদৌ রবীন্দ্র প্রভাবিত নয়। এটিকে সাহিত্যে সাদৃশ্যের দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করা যেতে পারে। 'বিরহিণী' এবং 'ওডনাডি' নামক কাব্য দুটিতে প্রেম, মিলনানন্দ, বিরহবেদনা প্রভৃতি চিরপুরাতন বিষয়গুলি বর্ণিত। কন্নড কাব্যে গজল প্রবর্তনের কৃতিত্ব তাঁরই। মোটামুটিভাবে বলতে গেলে তিনি বিষয়বস্তু ও চিত্রকল্পের চেয়ে কাব্যভাষার শ্রুতিমধুর শব্দ নির্বাচনে বিশিষ্টতর।

শ্রীধর খানোলকর জীবনভর ভাগ্য-বিড়ম্বিত কবি। দুর্ভাগ্যে আশঙ্কিত কবি চিরকাল মানসিক উৎফুল্লতা বজায় রেখেছিলেন। আনন্দকন্দের মতো তিনিও জাতীয় আন্দোলনের লেখা শুরু করে আখ্যানমূলক কবিতা ও লোকগাথা রচনায় কৃতিত্ব দেখান। তাঁর 'বোয়িগলু' কাব্যে দরিদ্র নিপীড়িত মানুষের মর্মস্পর্শী জীবন চিত্র অঙ্কিত। অপর এক কবি এম্. আর. শ্রীনিবাস মূর্তি তাঁর 'য়মন সোলু' কাব্য সংকলনে তথাকথিত ধার্মিক মানুষের ভণ্ডামির মুখোস খুলে ধরেছেন। প্রধানত নাট্যকার হলেও শ্রীরঙ্গ তাঁর 'আহ্বান' গ্রন্থে চতুষ্পার্শ্বের জীবন সম্পর্কে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করেছেন।

চেন্নমল্ল হলসঙ্গি (মধুরচন্ন)

মধুরচন্ন উচ্চকোটির অতীন্দ্রিয়বাদী কবি। নবকবিতার ঐকতানে তিনি তাঁর নিজের সুর যোগ করে দিয়েছেন। পল্লীগ্রামেই তাঁর জন্ম, পল্লীগ্রামেই তিনি মানুষ। প্রাথমিক স্তরের উপরে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ ঘটেনি। কিন্তু কঠোর পরিশ্রমের বলে তিনি ইংরেজী সমেত কয়েকটি ভাষা শিখে নিজেকে শিক্ষিত করে তোলেন। সবচেয়ে বড় কথা, শ্রীঅরবিন্দের

শিষ্যরূপে তিনি আধ্যাত্মিক সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। অন্বোপলব্ধির গভীরে প্রবেশ করে তিনি সেই উপলব্ধির কথাই কাব্যে রূপায়িত করেন। তাঁর রচনার পরিমাণ বেশি নয়, কিন্তু এই রচনার পশ্চাতে যে সাধনা তার ইতিহাস অতি গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর সবচেয়ে মূল্যবান গ্রন্থ 'নন্ন নল্ল'। ঈশ্বরের ঐকান্তিক অন্বেষণ ও উপলব্ধির ফলে কবি যে দুর্লভ শান্তি ও আনন্দ লাভ করেছিলেন সেই সব কথাই এই গ্রন্থে বর্ণিত। বন্ধুত্ব বিষয়ক রূপক কাব্য 'মধুরগীত'। কবির কাছে আধ্যাত্মিকতা-বিহীন কাব্য অর্থহীন। এমনকি তাঁর 'দেবতা পৃথিবী' গ্রন্থভুক্ত গীতি-কবিতাগুলিও প্রগাঢ়ভাবে আধ্যাত্মিক।

রি সীতারামাইয়া (রি. সী.)

যে সমস্ত প্রসিদ্ধ কবি জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে প্রাচীন ও নবীন দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যবর্তী পন্থা গ্রহণ করেছিলেন, রি. সী. তাঁদের একজন। তাঁর গীতি-কবিতার চার-পাঁচখানি সংকলনে তাঁর কবি-মানসের প্রাচুর্য ও নমনীয়তার পরিচয় রয়ে গেছে। তাই তাঁর কাব্যে পরস্পর বিপরীত ভাব লক্ষ্য করা যায়—একদিকে নাস্তিকতা, অন্যদিকে ভক্তি ও ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ, একদিকে ঐতিহ্যগত মূল্যবোধ সম্পর্কে শ্রদ্ধা, অন্যদিকে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ও নতুন দিনের আহ্বান। তাঁর কাব্যের সবচেয়ে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল জীবন ও চিরন্তন মূল্যবোধে বিশ্বাস—যে বিশ্বাসের প্রেরণা এসেছে প্রাচীন ভারতের বোধ এবং আধুনিক পৃথিবীর প্রগতিশীল চিন্তাধারা থেকে। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ চিন্তা ও স্বপ্নের প্রকাশ ঘটেছে 'কস্মৈদেবায়', 'অভীহি', 'হেম্মরা' প্রভৃতি কবিতায়। কবি কাব্যের গঠন সম্পর্কে বেশি সচেতন ছিলেন বলে মাঝে মাঝে তাঁর মূল বক্তব্য বাহ্য অলঙ্কারের অতিশয্যে অস্পষ্ট হয়ে যায়।

কে. রি. পুট্টপ্পা (কুরেম্পু)

আধুনিক কন্নড-র প্রথম সারির কবি কুরেম্পুর মধ্যে লিরিক ও ক্লাসিকের সমন্বয় ঘটাতে সংখ্যায় প্রচুর ও গুণমানে সমৃদ্ধ কবিতার সৃষ্টি হয়েছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য সুপরিচিত মলেনাড অঞ্চলের ক্রোড়ে জন্মলাভ করে কালক্রমে তিনি প্রকৃতির কবি রূপে সর্বশ্রেষ্ঠ হয়ে ওঠেন। প্রাচীন ও আধুনিক ভারতের মহাপুরুষদের কাছ থেকেও যেমন, তেমনি প্রসিদ্ধ ইংরেজ ও ভারতীয়

কবিদের কাছ থেকেও তিনি প্রেরণা লাভ করেন। প্রাচীন কন্নড কবিতার শ্রেষ্ঠ অংশ আকণ্ঠ পান করে তিনি তাঁর চিন্তা ও শব্দসম্ভারকে সমৃদ্ধ করেন। তাঁর প্রায় ২০ খানি কাব্যসংকলনে বিষয়বস্তুর ব্যাপকতা লক্ষণীয়। তবে তাঁর সৃষ্টির মধ্যে প্রকৃতিই প্রাধান্য লাভ করেছে। তাঁর কাব্যের প্রধান দুটি আবেগ হল প্রকৃতি-প্রেম ও ঈশ্বর-প্রেম। কখনও কখনও প্রভেদ ঘুচে গিয়ে এই দুটি অভিন্ন হয়ে ওঠে। তাঁর ঋতু পর্যায়ের কবিতায় প্রকৃতির যে অতি-মনোহর বর্ণনা পাওয়া যায় তার কিছু অংশ এইরূপ: ফুল থেকে ফুলে উড়ে উড়ে মধু পান করতে করতে মৌমাছিরা পরস্পরকে ডেকে ডেকে বলে—'এসো, এই যে বসন্ত এসে গেছে।' শীতের ঠাণ্ডা চলে যাচ্ছে, পুষ্পভারনত লতায় লতায় আনন্দমত্ত মৌমাছিরা মুক্ত আত্মার মতো গুঞ্জন করছে। কোকিল ডাকে কুহুকুহু, টিয়ে পাখি কিচির মিচির, বসন্ত যে এসে গেছে'। একথা ঠিক যে তাঁর কবিতার কোথাও কোথাও সচেতন বা অচেতনভাবে অন্য কবিদের প্রতিধ্বনি শোনা যায়। কিছু কিছু কবিতা ভাবানুবাদ বা ছায়াবলম্বনে রচিত। যেমন 'কিন্দরযোগী' ব্রাউনিং-এর **Pied Piper of Hamelin** অবলম্বনে লেখা হলেও কুবেম্পুর কবিতাটি মৌলিক কবিতার মতো শ্রুতিমধুর ও সুখপাঠ্য।

কুবেম্পুর কবিতার সমৃদ্ধির মূল কারণ তিনটি—কবির কল্পনাশক্তি, দৃষ্টির গভীরতা এবং সাবলীল রচনারীতি। তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতা আধুনিক কাব্যজগৎকে অসাধারণ সৌন্দর্য দান করেছে। প্রকৃতি বিষয়ক কবিতায় তিনি অতুলনীয়। কখনও কখনও কবির অসংযম ও অনৌচিত্যবোধে তাঁর কবিতার সৌন্দর্য ও মহিমা ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

কুবেম্পুর শ্রেষ্ঠ কীর্তি হল এপিককাব্য 'শ্রীরামায়ণ দর্শনম্'। নিজস্ব জীবন দর্শনের আলোকে তিনি বাল্মীকির রামায়ণকে নতুন ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন বলে কিছু কিছু ঘটনা ও চরিত্রে বড় রকমের পরিবর্তন ঘটেছে। চারটি খণ্ডে এবং ২০০০০ পঙ্‌ক্তিতে রচিত এই কাব্য সত্যই বিস্ময়কর। আধুনিক যুগ গীতিকবিতার যুগ, এযুগে মহাকাব্য রচনার সুযোগ নেই—সমালোচকদের এই উক্তি যেন মিথ্যা বলে মনে হয়। এমন কথা অবশ্য বলা যেতে পারে, আমরা যে যুগে বাস করছি সে যুগের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও ত্রুটি বিচ্যুতি প্রতি-ফলিত হয়নি বলে কুবেম্পু-র কাব্য আধুনিকযুগের এপিক নয়। তবে একথা

স্বীকার্য যে কবির উপর কাব্যের বিষয় বা রূপ চাপিয়ে দেওয়া চলেনা, তিনি তাঁর রুচি ও ইচ্ছা অনুযায়ী নিজের জীবনদর্শনকে সাহিত্যের যে কোনো শাখায় রূপায়িত করবার মতো স্বাধীনতার অধিকারী।

পি. টি· নরসিংহাচার (পুতিনা)

সূক্ষ্ম মানসিকতা সম্পন্ন একজন বিশিষ্ট কবি নরসিংহাচার। তাঁর কবি-ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য হল দৃষ্টির স্বচ্ছতা ও কল্পনার সূক্ষ্মতা। জীবনের প্রতি আসক্তি এবং জীবন সম্পর্কে ঔদাসীন্য থেকে উদ্‌ভূত প্রকৃতির ও মনের শান্তি তাঁর রচনাকে প্রভাবিত করেছে। গীতি-কবিতার ভাবে ও রূপে তিনি পাশ্চাত্য প্রভাব থেকে মুক্ত না হলেও তাঁর কাব্য-প্রেরণা মূলত ভারতীয়। আজ পর্যন্ত প্রকাশিত তাঁর ৭।৮ খানি সংকলনে গীতিকবিতা ও দীর্ঘ কাব্য দুই-ই আছে। এই সমস্ত রচনায় তিনি বর্ণনা করেছেন প্রকৃতির গভীর ও কমনীয় দিক এবং জীবন-অবগুণ্ঠনের পশ্চাতে অবস্থিত দৃশ্যাবলী। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ তুলে দেওয়া যায় তাঁর 'চিকুলু' কবিতা থেকে কোকিলের অবিরত কুহুধ্বনি সম্পর্কে এই পঙ্‌ক্তিগুলি: 'এই মধুর গান শুনে আমার মনে হয় এ যেন অমরাবতীর অধীশ্বর ইন্দ্রপ্রেরিত দূত। স্বর্গের অপ্‌সরা যখন দেবালোককে ভুলে গেছে এবং মর্ত্যলোক যখন তার বিরহের আশঙ্কায় শঙ্কিত, তখন যেন এই দূতকেই পাঠানো হয়েছে।' সূক্ষ্ম চিত্রকল্পের সাহায্যে এই কবিতাটিতে অনন্তের আনন্দ ও রহস্য অভিব্যক্ত। আর একটি কবিতায় কবির যথার্থ প্রকৃতি ও মহান ধর্ম বোঝাতে গিয়ে একটি আধুনিক চিত্রকল্প ব্যবহৃত: 'তুমি যেন প্রাপক বেতারের মতো ভাবযন্ত্র, যে যন্ত্রে ধরা পড়ে উচ্চ প্রেরকযন্ত্র থেকে ঘোষিত সঙ্গীত। 'ভাবযন্ত্র' তোমাকে প্রকৃতি তৈরি করেছেন স্থপতিরূপে এবং যে যন্ত্রে শোনা যায় শিব-সঙ্গীত।' একই বিষয় নিয়ে সবিস্তারে বলা হয়েছে 'রসসরস্বতী' কবিতায়। তাঁর সমস্ত কবিতায় যে দুটি বিষয় সুস্পষ্ট, তা হল কল্পনার গতি এবং শব্দের প্রবাহ। তবে একথাও স্বীকার্য যে মাঝে মাঝে কবির অপরিচ্ছন্ন শব্দ ব্যবহারের ফলে তিনি বেশ দুর্বোধ্য হয়ে ওঠেন।

জি. পি. রাজরত্নম্ (রত্ন)

কন্নড কাব্যে নতুন সুর সংযুক্ত করে জি. পি. রাজরত্নম্ (রত্ন) প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। তাঁর কাব্যের অভিনবত্ব প্রধানত পাওয়া যায় 'রত্নন পদগলু' এবং 'নাগন পদগলু' নামক দুটি সংকলন গ্রন্থে। 'রত্নন পদগলু' (রত্ন কবির পদাবলী) একজন কাল্পনিক মদ্যপের কথ্য বুলিতে লিখিত। মদ্যপ স্বভাবতই তাঁর অদ্ভুত দৃষ্টিভঙ্গীতে জগৎকে দেখে থাকে। কবিতার ক্ষেত্রে এই বিশেষ পরীক্ষা প্রশংসনীয় কেবল নগ্ন বাস্তবতা এবং বিষয় ও রীতির সমন্বয়ের মধ্যেই নয়, বিচক্ষণ পাঠকের চোখে যে গভীর অর্থ ধরা পড়ে তার জন্যও বটে। এই শ্রেণীর একটি শ্রেষ্ঠ কবিতা 'এন্দাদ-তোন্দ্রে'। এতে মাতালের চোখে পৃথিবীর উল্টা-পাল্টা ছবিটি চমৎকার-রূপে চিত্রিত। মাতাল বলছে, 'এই হতভাগা পথটা। এ সব কী বিশৃঙ্খলা ? কুৎসিত অঙ্গভঙ্গি করে নাচানাচি করছ কেন ? তুমি আমাকে ঠকিয়ে মাতাল করে দিয়েছ। এই চাঁদ, তোমার মুখটা বাঁকা কেন ? আরে, তুমিও দেখছি পাঁড় মাতাল। রাস্তার আলোগুলিও দেখছি মাৎলামি করতে করতে ঘুরে ঘুরে মরছে। এই সব মাতালের কাছে থাকা আমার পক্ষে অসম্মানকর। কাজেই আমাকে আবার শুঁড়িখানায় ফিরে যেতে হবে।' 'শান্তি' নামক গ্রন্থেও তাঁর কিছু নীতিকবিতা সংকলিত। শিশুদের জন্য লিখিত তাঁর কয়েকটি কবিতা বেশ জনপ্রিয় হয়েছে।

টি এন্. শ্রীকণ্ঠাইয়া

প্রসিদ্ধ কন্নড পণ্ডিত টি. এন্. শ্রীকণ্ঠাইয়ার গীতি-কবিতা সংখ্যায় কম হলেও বর্ণনীয় বিষয় ও রীতিতে সেগুলি নিখুঁত বলা চলে। তৎকালের উদীয়মান কবিদের প্রকাশিত কাব্য-সংকলনের মধ্যে প্রথম দুখানি সংকলন 'তলিরু' এবং 'বিরিয়াকনিকে' এই কবির ১২টি কবিতার সমষ্টি। 'ওলুমে' গ্রন্থে যে প্রেমের কবিতা সংকলিত, তার মধ্যে একটা মর্যাদাপূর্ণ স্বাভাবিকতার স্পর্শ আছে। 'নেট্রনটিয়রু' জাতীয় কয়েকটি কবিতায় কবির কল্পনা বাস্তবতার দৃঢ়ভিত্তির উপর তার সৌধ নির্মাণ করেছে।

কে. শঙ্করভট্ট

সমুদ্রতটবর্তী কর্ণাটকে যে কবির জন্ম ও বয়ো-বৃদ্ধি, সেই কে. শঙ্করভট্ট ঐ অঞ্চলের প্রাকৃতিক শব্দ ও দৃশ্যের ব্যাপারে সংবেদনশীলতার পরিচয় দিয়ে খ্যাতি লাভ করেছেন। ৩।৪ খানি কাব্য সংকলনের মধ্যে 'নালমে' গ্রন্থে তিনটি আখ্যানমূলক কবিতার প্রত্যেকটিই অত্যন্ত গীতধর্মী। কবির কল্পনা-শক্তি এই কবিতাগুলিতে চূড়ান্ত রূপ পেয়েছে। বিভিন্ন ঘটনা অবলম্বনে অচরিতার্থ প্রেমের ট্রাজেডি বর্ণনাই এগুলির মুখ্য বিষয়। 'হন্নিয় মদুবে' (হন্নি-র বিবাহ) কবিতার বিষয়বস্তু হন্নির জন্য নির্দিষ্ট ধনী পাত্রকে হন্নির প্রত্যাখ্যান এবং অতঃপর প্রেমিকের সঙ্গে তাঁর আত্মোৎসর্গ। 'মাদ্রিয়চিতে' করুণা অভিশাপগ্রস্ত পাণ্ডু এবং তার পত্নী মাদ্রীর করুণ কাহিনীর মধ্য দিয়ে প্রেমের মিলন বিরহ বর্ণিত। সবগুলি কবিতায় কবির চিন্তা, রচনারীতি ও অনুভবশক্তির পরিণতি সুস্পষ্ট।

বি. কে. গোকাক (বিনায়ক)

বস্তুবাদী ও স্বপ্নদ্রষ্টা এই দুয়ের সমন্বয় ঘটেছে যে সব অত্যুৎকৃষ্ট কবিদের মধ্যে গোকাক তাঁদেরই একজন। মলেনাড সীমান্তের প্রকৃতি তাঁকে রোমাঞ্চিত করেছে। কন্নড ও ইংরেজী কাব্যের অতীন্দ্রিয়বাদী ঐতিহ্য তাঁর কবি-প্রতিভাকে পুষ্ট করেছে। প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে বিদেশ যাত্রা, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বাস, নানা ধরনের লোকের সঙ্গে বিস্তৃত যোগাযোগ—এই সমস্ত তাঁর অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করে তাঁর মনের দিগন্তকে প্রসারিত করেছে। তাঁর চিন্তার ভিত্তি তৈরি হয়েছে শ্রীঅরবিন্দের দর্শনের আধারে। সমাজতত্ত্বের অধ্যয়ন তাঁর সামাজিক চেতনাকে উন্নীত করে তুলেছে। কন্নড কবিতার ক্ষেত্রে তিনি দু'একটি নতুন পথের দিশারী এবং কবিতার ভাব ও রূপ নিয়ে কিছু উৎকৃষ্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষাও তিনি করেছেন। পনেরোটিরও বেশি সংকলন গ্রন্থে উন্নত শ্রেণীর গীতিকবিতা, দীর্ঘতর কাব্য এবং কাব্যনাট্যের সাক্ষাৎ মেলে। তাঁর গীতিকাব্যে প্রতিফলিত এক উচ্চাভিলাষী ও গ্রহিষ্ণু ব্যক্তিত্বের ছায়া। তাতে ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণের উচ্চ আদর্শ শক্তিশালী ভাষায় ব্যাকুল-ভাবে প্রকাশিত। কবির মানসগঠনে পাওয়া যায় ইংরেজ কবি শেলীর ধরনের

স্বপ্নালুতা। কিন্তু বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে তিনি কোনো ব্যাপারে উগ্রতার দিকে ঝুঁকে না পড়ে ভারতীয় পটভূমি ও নিজস্ব সাধনার ফলে বিভিন্ন সুরকে একটি নিজস্ব ঐকতানে বিধৃত করেন।

জাহাজে তাঁর বিলাত যাত্রার কালে তিনি নানামূর্তিতে সমুদ্রকে দেখার যে সুযোগ পান, তা-ই তাঁকে সমুদ্র বিষয়ক গান রচনায় (সমুদ্র গীতগলু) অনুপ্রাণিত করেছে। মুক্তছন্দে লেখা এই কবিতাগুলি প্রাচীন ক্লাসিক সাহিত্যের গতানুগতিক সমুদ্র বর্ণনা থেকে স্বতন্ত্র বলে কন্নড কাব্যে দুর্লভ সামগ্রীরূপে বিবেচিত। এই কাব্যগ্রন্থের 'নৌকাযাত্রা'র ন্যায় কবিতা এক নতুন মাত্রা সৃষ্টি করে কবিচিত্তে নতুন সমাজ চেতনার আভাস দিয়েছে। বিষয়টি আরও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে তাঁর 'অভ্যুদয়' ও 'নব্য কবিতেগলু' গ্রন্থে। শেষোক্ত বইটিতে কবি তাঁর আধুনিকতা পন্থী কবিতাগুলি প্রকাশ করে কন্নড কাব্যে নতুন ধারার প্রবর্তন করেন।

'দ্যুবাপৃথিবী' এবং 'বাল ডেগুলদল্লি' তাঁর দুটি শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ। প্রথম গ্রন্থে আছে দুটি দীর্ঘ কবিতা। তার একটিতে পৃথিবী থেকে আকাশের দিকে চেয়ে দেখা, অপরটিতে বিমানপোত থেকে পৃথিবীর দিকে দৃষ্টিপাত। চিত্রকল্পের ঐশ্বর্য এবং দৃষ্টির গভীরতা কাব্যের উৎকর্ষ বাড়িয়ে দিয়েছে। দ্বিতীয় কাব্য-গ্রন্থে আধুনিক জীবনের পটভূমিকায় মসীবর্ণে পরিলিখিত একগুচ্ছ বহু বিস্তীর্ণ চরিত্রচিত্র। চরিত্রগুলিকে উপস্থাপিত করা হয়েছে জীবনমন্দিরের পূজারী-রূপে। বিনায়কের সৃষ্টি সমুচ্চয় কবিতার উপাদানে সুসমৃদ্ধ হলেও একথা বলা দরকার যে প্রকাশভঙ্গি সর্বদা অনুভূতির উপযুক্ত হয়ে ওঠেনি। তাঁর রচনাশৈলীতে একপ্রকার অনির্দেশ্যতা ও অসমতা লক্ষ্য করা যায়। তৎসত্ত্বেও যে মধুর ও সুখপাঠ্য ছন্দ ও পদগুচ্ছ তাঁর কাব্যকে অলঙ্কৃত করেছে এবং তাঁর কয়েকটি শ্রেষ্ঠ কবিতায় অনুভূতি ও প্রকাশের সুষম মিশ্রণের সাক্ষ্য হয়ে রয়েছে সেগুলির কথা ভুললে চলবে না।

রসিকরঙ্গ

ব্যক্তিত্বগুণে বিশিষ্ট আর এক কবি রসিকরঙ্গ পারিপার্শ্বিক প্রকৃতি ও জীবন সম্পর্কে অনুরাগী ও গভীর সংবেদনশীল। তাঁর জীবন ও কাব্য সাধনায় স্থায়ী প্রভাব ফেলেছে প্রাচীন কন্নড কবিতার সমস্ত পর্ব। চারটি গ্রন্থে

সংকলিত তাঁর গীতিকবিতায় দেখা যায় সৌন্দর্যপ্রীতি, প্রেমের প্রতি বিশ্বাস, আধ্যাত্মিক আকুলতা, দুঃখকষ্টে অবিচলিত অদম্য আশাবাদ। 'চাতকব্রত' এবং 'জোক্কবন জানি' নামে দুটি দীর্ঘ কবিতাও তিনি লিখেছেন। প্রথম কবিতায় নতুন প্রতীক ও পুরাণরূপে চাতক পাখির গল্প বর্ণিত। দ্বিতীয়টি লোকরীতি অনুযায়ী রচিত একটি আধুনিক গাথাকাব্য। রসিকরঙ্গের কবিতায় কবির নিজস্ব ধাঁচের শক্তি ও কমনীয়তা দুই-ই আছে। মাঝে মাঝে রচনা দুর্বল ও অতৃপ্তিকর বলে মনে হয়। মনে হয় যেন একখণ্ড কালো মেঘ প্রবল বর্ষণের বদলে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি ঝরিয়েই চলে গেল।

দারিদ্র্যের কঠোর নির্যাতন ভোগ করেও যিনি সেই দুঃখকষ্টকে অতিক্রম করে মহত্ত্বে উপনীত হয়ে কঠিন প্রস্তরভেদী ফুলের মতো সুন্দর হয়ে উঠেছেন, তিনি কবি ঈশ্বর ষণকাল। 'কোরিকে' নামক সংকলনে তিনি কেবল দুঃখের কথা বলেই ক্ষান্ত হননি, বলেছেন মহত্ত্বের কথা যা দুঃখেরই দান। একটি কবিতায় তিনি বলেছেন, সমস্ত পৃথিবী হাস্যময় হয়ে উঠুক, আনন্দে মত্ত হোক, আর সমস্ত পৃথিবীর দুঃখ এসে জড়ো হোক আমার দুয়ারে। কারণ আমি যখন কাঁদব, বিশ্ববাসী কি আমায় বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরবে না? আমি হাসছি, আর পৃথিবী কাঁদছে, সে আমি কখনো সইতে পারব না।'

পূর্বে উল্লিখিত মধুর চেন্নর কবি বন্ধু সিম্পি লিঙ্গন্না হিন্দী কবি (সূর্যকান্ত) ত্রিপাঠীর 'মিলন' কবিতার অনুবাদ করেছেন, এবং আধ্যাত্মিক ধারায় কিছু গীতিকবিতা ও বচন কবিতাও লিখেছেন। 'মুগিলজেন্নু' সংকলনে তাঁর দৃষ্টি-ভঙ্গীর উদারতা ও প্রতীক রচনার ক্ষমতা বিস্ময়কর।

দিনকর দেশাইও একজন বিশিষ্ট কবি। শিশুদের জন্য কবিতা লেখা ছাড়া তাঁর কবিতায় সাধারণ মানুষের জন্য যথেষ্ট উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। সমসাময়িক ঘটনাবলীর উপর বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য সহ তার অসংখ্য 'চুটক' (শ্লেষাত্মক ক্ষুদ্র পদ্য) কন্নড ভাষায় মুখে মুখে প্রচলিত।

কে. এস. নরসিংহস্বামী একজন উঁচুদরের কবি। কালের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে যিনি পরিণতি লাভ করেছেন এবং বাইরের প্রভাব বা বিশেষ কোনো দলের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে স্বীয় মানসিকতাকে মুক্ত রেখেছেন। যে বইটি তাঁকে জনপ্রিয় করে তোলে তার নাম 'মাইসূর মল্লিগে'। এই কবির সংকলনে তিনি দাম্পত্য প্রেমের অকপট প্রকাশে কুণ্ঠিত হননি বটে, কিন্তু সমুন্নত

মহিমা থেকেও কখনো বিচ্যুত হননি। এই কবিতাগুলির মধ্যে প্রকাশিত সংযম, হাস্যরস, উন্নতরুচি সাহিত্যে তথা সমাজে প্রেমকে একটা বিশেষ মর্যাদা দান করেছে। এই কবিতাগুলি বেন্দ্রে, কুবেম্পু প্রভৃতি আধুনিক কবিদের রচনার সমপর্যায়ভুক্ত হলেও নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বর্জিত নয়। কবির পরবর্তী সংকলনগুলিতে একটা তীক্ষ্ণ সমাজ-সচেতনতা এবং শিল্প কৌশলে কমনীয় ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের পরিচয় পাই। কখনও কখনও গৌণ বিষয় বা ঘটনা তাঁর কবিতায় গতানুগতিক হয়ে ওঠে এবং গম্ভীর ও হালকা রচনারীতি মিশ্রিত হয়ে যায়।

প্রতিভাশীল কবি ডি. এস্. কম্বুকি-র সংবেদনশীলতা বিশ্বের সৌন্দর্যে ও রহস্যে উদ্‌বোধিত হয় এবং কমনীয় ছন্দে লয়ে শিল্পরূপ লাভ করে। তাঁর কবিতা সংকলনগুলিতে এই সুরের কয়েকটি হৃদয়স্পর্শী কবিতা স্থান পেয়েছে। তাঁর 'ভাবতীর্থ' কাব্যগ্রন্থের কয়েকটি কবিতায় কন্নড দেশের শিল্প-সম্পদ ও তীর্থস্থান-গুলির প্রশস্তিমূলক বর্ণনা পাওয়া যায়।

আর একজন প্রতিভাসম্পন্ন কবি এস. ভি. পরমেশ্বর ভট্ট। জীবন ও প্রকৃতির প্রতি যাঁর প্রতিবেদনশীলতা শ্রেষ্ঠ লিরিক ধারার অনুগামী। 'বিজয়-নগরের শুকপাখি'র উপর কবিতাটি তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা। শুকপাখির চিত্রকল্পের সাহায্যে যখন সেই পুরানো বিজয়নগরের গৌরবময় দিনগুলির স্মৃতি ফিরে এল, তখন শুকপাখি আর কেবল পাখি হয়ে রইল না।

কৃষ্ণমূর্তি পুরানিক-এর দেশাত্মবোধক কবিতাগুলি খুব প্রেরণাময়। দারিদ্র্য, অন্যায় অত্যাচার ও নির্যাতন সম্পর্কে লিখতে গিয়ে তাঁর কলম উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। আর একজন কবি পৈজাবর সদাশিবরাও। অতি অল্প বয়সে ইটালীতে তাঁর অকালমৃত্যুর ফলে কন্নড সাহিত্য একজন প্রতিশ্রুতি-সম্পন্ন কবির কাব্য থেকে বঞ্চিত হয়েছে। তাঁর কবিতার সংখ্যা স্বল্প হলেও তাৎপর্য গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর একটি শক্তিশালী কবিতার নাম 'বরুণের প্রতি আহ্বান'— ইটালীর এক বর্ষণসন্ধ্যার বর্ণনামূলক এই কাহিনীটিতে চিত্রকল্প ও শব্দ ব্যবহারের নতুনত্ব ও সমৃদ্ধি লক্ষণীয়।

কাব্যে আধুনিকতাবাদ প্রবর্তনের পূর্বেই যে সমস্ত কবি তাঁদের নিজস্ব ভঙ্গিতে বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছেন, তাঁদের নামোল্লেখ করা ছাড়া সংক্ষেপেও তাঁদের সম্পর্কে কিছু বলা বলা সম্ভব হচ্ছেনা। তাঁদের কয়েকজন হলেন

পাণ্ডবেশ্বর গণপতিরাও, বি. এইচ. শ্রীধর, ভি. জি. ভট্ট, এম্. ভি, সীতা-রামাইয়া এবং বিনীত রামচন্দ্র। আধুনিক কন্নডকাব্যে সময়োপযোগী দান তাঁরা রেখে গেছেন।

আধুনিকতাপন্থী আন্দোলনের একজন বিশিষ্ট পুরোধারূপে এবং প্রথম সারির কবিরূপে সুপরিচিত গোপালকৃষ্ণ আডিগ। এক অর্থে দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রজন্মের কবিদের মধ্যে তিনি প্রধান যোগসূত্র। তাঁর প্রথম দুটি সংকলনের লিরিকগুলি প্রকৃতিতে রোমান্টিক। পরবর্তী সংকলনসমূহে রোমান্টিকতার স্থানে প্রাধান্য পায় আধুনিকতাবাদ। যে নামেই চিহ্নিত করা যাক না কেন, আডিগর কবিতা দৃষ্টি-ভঙ্গি ও সমাজচেতনার গুণে সবল ও প্রগতিপন্থী। এই নতুন প্রবণতা তাঁর শেষদিককার কবিতায় বড় বেশি স্পষ্ট হয়ে দেখা যায়। আধুনিকতাপন্থী আঙ্গিকের আরও অগ্রগতি হয় 'ভূমিগীত' এবং 'চণ্ডেমদ্দলে' গ্রন্থে। তাঁর 'হিমগিরির কন্দর', 'গোন্দলপুর' জাতীয় কয়েকটি কবিতা ভাবে ও রূপে খাঁটি আধুনিকতাপন্থী বলে বিবেচিত হতে পারে। এই সমস্ত কবিতার সূক্ষ্মচিত্রকল্প ও অভিনব কাব্যভাষা উপভোগ্য সন্দেহ নেই, তবে কথ্য ও গুরুগম্ভীর ভাষার যথেচ্ছ সংমিশ্রণে এবং ইংরেজী শব্দ ও উদ্ধৃতির নির্বিচার প্রয়োগে যে ক্লিষ্ট কৃত্রিম রচনারীতির সৃষ্টি হয়েছে তাঁর প্রশংসা করা যায় না। আরও যে কয়েকজন কবি নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য নিয়ে আধুনিকতাবাদের পথে অগ্রসর হচ্ছেন তাঁরা হলেন রামচন্দ্র শর্মা, চন্দ্রশেখর পাটীল, চন্দ্রশেখর কম্বার, নিসার আহমেদ, পি. লঙ্কেশ এবং এ. কে. রামানুজন একদল তরুণতর কবি নতুন আঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় মিশ্র সাফল্য লাভ করেছেন। এঁদের কয়েকজনের রচনায় মুক্ত ছন্দ নামে যা প্রচলিত তাকে নির্ভেজাল গদ্য ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। এগুলি আদৌ কবিতা কিনা তা গভীরভাবে বিচার্য।

সম্প্রতি বছর কয়েকের মধ্যে তৃতীয় প্রজন্মের কবিরা আবির্ভূত হয়েছেন। তাঁদের শতাধিক কবিতাসংকলন পড়ে মনে হয় কিছু সংখ্যক সংকলন কবিতা রচনার চেষ্টামাত্র, অন্যগুলিতে দোষত্রুটি সত্ত্বেও ভবিষ্যৎ প্রতিশ্রুতির আভাস আছে। রোমান্টিক বা আধুনিকতাপন্থী লেবেল দিয়ে তাদের চিহ্নিত করা যায় না। মহিলা কবিদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য জয়াদেবীতায়ি লিগাডে, যাঁর দুখানি বিশেষ গ্রন্থের মধ্যে একখানি হল শোলাপুরের সিদ্ধরাম

যোগীর জীবনী কাব্য। অন্যান্য কবিরা হলের বি. জানকম্মা, জানকী বৈকাদি, পার্বতীদেবী হেগগডে এবং এল জি. সুমিত্রা। সাধারণভাবে বলা যায়, আধুনিক কন্নড কবিতার ক্ষেত্রে মহিলা কবিদের আরও উৎকর্ষের পরিচয় দিতে হবে।

নতুন প্রজন্মের কয়েকজন নামকরা কবিদের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ না করলে আধুনিক কন্নড কবিতার এই দ্রুত পর্যবেক্ষণও অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এঁদের একজন হলেন চেন্নবীর কণবি যাঁর কবিপ্রতিভা নিঃসন্দেহ উচ্চশ্রেণীর এবং রীতি ও দৃষ্টিভঙ্গিতে মৌলিক। তাঁর দশখানি সংকলন গ্রন্থের প্রত্যেকখানিতে কবি-অনুভূতির প্রগাঢ়তা এবং চিত্রকল্পিত কাব্যভাষায় অভিনবত্ব লক্ষণীয়। তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু হল : বহু বিচিত্ররূপে প্রকৃতি ও প্রেমজগতের অবিরাম লীলা এবং তৎসহ জীবনের কঠিন বাস্তবতা ও মানব প্রকৃতির জটিলতা। তাঁর কবিতায় রোমান্টিকতা ও আধুনিকতাবাদের মিশ্রণ ঘটেছে বলে বিশেষ কোনো লেবেল এঁটে দেওয়া কঠিন।

অনুরূপ ক্ষমতা ও সম্ভাবনার অন্য এক কবি জি. এস্. শিবরুদ্রপ্পা। তাঁর কবিতায় এক বিচক্ষণ ও সংবেদনশীল মনের প্রকাশ। বিষয়ে ও ভঙ্গিতে রোমান্টিকতা দিয়ে শুরু করে তিনি আধুনিকতাবাদ পর্যন্ত পরিভ্রমণ করেছেন। কিন্তু কোনোটিকেই তিনি অযৌক্তিকভাবে আঁকড়ে থাকেননি। তাঁর কিছু কিছু রচনায় মৌলিকতার ছাপ সুস্পষ্ট। অন্যান্য কবিদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য সিদ্ধয়্যা পুরানিক, গঙ্গাধর চিত্তাল, এইচ. বি. কুলকর্ণী, এস্. আর. একুকুণ্ডি এবং রামচন্দ্র কোত্তল্‌গি। এই সমস্ত কবি কাব্য সাধনায় ক্রমশ উন্নতি লাভ করছেন।

কবি বেন্দ্রে তাঁর একটি কবিতায় লিখেছেন যে প্রকৃতিতে শতবৃক্ষে শত শব্দ ধ্বনিত এবং তার একটি অপরটির চেয়ে মধুরতর। কথাটা সমৃদ্ধ ও বিচ্ছিন্ন অভিব্যক্তিময় আধুনিক কন্নড কবিতা সম্পর্কে প্রযোজ্য।

একাদশ অধ্যায়

ছোটগল্প ও উপন্যাস

গত পঞ্চাশ বছরে কন্নড ভাষায় ছোটগল্প ও উপন্যাসের ক্ষেত্রে বিশেষ অগ্রগতি হয়েছে। ছোটগল্পিকা এবং উপন্যাসিকাও রচিত হয়েছে।

ছোটগল্পকারদের মধ্যে মাস্তি নিঃসন্দেহে সর্বপ্রথম ও সর্বাগ্রগণ্য। তাঁর প্রকাশিত গল্পের সংখ্যা যাটেরও বেশি। তিনি জাত গল্পকার এবং তাঁর গল্পরচনায় উচ্ছ্বাস ও সাবলীলতা লক্ষণীয়। তাঁর সমস্ত গল্পেই দেখা যায় পারিপার্শ্বিক জীবন সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ, লোক-সাহিত্যের গল্পমালা সম্পর্কে জীবন্ত কৌতূহল এবং কন্নডগদ্যের সংস্কৃতি সম্পর্কে বিশেষ শ্রদ্ধা। তাছাড়া তাঁর মনের দিগন্ত ভারাকর্ষ বহির্বিশ্বের জীবন ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রসারিত। তাই তিনি একই সময়ে লিখতে পেরেছেন, মহান জার্মান কবি গ্যেয়টের জীবনের শেষ দিনটি সম্পর্কে গল্প এবং রামানুজাচার্যের বিবাহিত জীবন নিয়ে গল্প 'আচার্যপত্নী'। তাঁর গল্পের কিছু কিছু উপন্যাস নেওয়া হয়েছে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও জাপান প্রভৃতি দেশ থেকে। প্রাচীন ভারতীয় উপন্যাস অবলম্বনে গল্পরচনায় তিনি যে কল্পনাশক্তির প্রয়োগ করেছেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় 'হেমকূটছন্দ' 'বন্দমেলে' এবং 'গৌতমীয় কতে' নামক গল্পে! দুটি গল্পেরই ইঙ্গিত পেয়েছিলেন কালিদাসের 'শকুন্তলা' থেকে। সাধারণ ছোটগল্প থেকে আকারে ও পটভূমিতে তাঁর বৃহত্তর গল্পের নাম 'সুব্বন্না'। গানের মধ্য দিয়ে জীবনে জ্ঞানবান হয়ে উঠেছে এমনি একজন গায়কের জীবন ও ব্যক্তিত্ব এই গল্পটির বিষয়। মাস্তির শিল্পকলার আসল কথা হল অত্যন্ত সরল ও স্বাভাবিক ভঙ্গিতে গল্পবলার রীতি। বস্তুত ধরা বাঁধা সুনির্দিষ্ট কোনো আঙ্গিকের অভাবই তাঁর আঙ্গিক। তাঁর শ্রেষ্ঠ গল্পগুলি কৌশলবিহীন কলাকৌশলের জন্যই সুপরিচিত, কোনো আঙ্গিকের উৎকর্ষের জন্য নয়। মানব জীবন ও চরিত্রের বিশেষ করে কন্নড সংস্কৃতির মহৎ অংশগুলির, সূক্ষ্ম চিত্রণে তাঁর কৃতিত্ব বিশেষ গর্ব ও প্রশংসার বস্তু। তাঁর গল্পগুলি ভাবে ও রূপে এমন কিছু স্বাদ ও উৎকর্ষ লাভ করেছে যা মাস্তিসুলভ নামে অভিহিত হতে পারে।

মাস্তির কয়েকজন সমকালীন গল্পকার—যেমন, নবরত্ন রামরাও, এ. আর.

কৃষ্ণশাস্ত্রী এবং এস্. জি. শাস্ত্রী—তাঁদের রচনায় মধ্যে তীক্ষ্ণ বাস্তববোধ, পরিণত অভিজ্ঞতা এবং সরল শিল্পকৌশলের পরিচয় দিয়েছেন। এছাড়া কারন্ত, দেবুড়ু, সি কে বেংকটরামাইয়া এবং আনন্দকন্দ ছোটগল্প এবং সাহিত্যের অন্যান্য ক্ষেত্রে বিশিষ্ট অবদানের জন্য স্মরণীয়। কারন্ত অত্যন্ত কঠোরভাবে সামাজিক দোষত্রুটি ও কুসংস্কারগুলি তুলে ধরেছেন। প্রাচীন ও আধুনিক যুগের চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক অধ্যয়ন করেছেন দেবুড়ু। শহর ও গ্রামগঞ্জের জীবনের কয়েকটি দিক চিত্রিত করেছেন সি কে বেংকটরামাইয়া। উত্তর কর্ণাটকের প্রথম গল্পকারদের অন্যতম আনন্দকন্দ গ্রাম্যজীবন ও লোকাচার বিষ্যার সঙ্গে সুপরিচিত। লোক-কথা এবং শিলালিপির বিবরণের উপর ভিত্তি করে লেখা তাঁর গল্পগুলি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল! আনন্দকন্দের রচনারীতি মার্জিত, পরিচ্ছন্ন ও সুরুচিপূর্ণ।

অপর এক গল্পলেখক আনন্দ তাঁর আঙ্গিকের নৈপুণ্যে ছোটগল্পের মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছেন। গোটা পঁচিশেক গল্পের মধ্যে ২০টি মৌলিক, গোটা পাঁচেক ভাবানুবাদ। তাঁর কয়েকটি ছোটগল্পে আধুনিক গল্পের আঙ্গিক চমৎকার ফুটে উঠেছে—গঠনের কাঠিন্য, সংলাপের নৈপুণ্য, এবং সর্বোপরি গল্পের উপসংহারে উৎকণ্ঠা ও বিস্ময়বোধ। কিন্তু কখনও কখনও টেকনিকের বাড়াবাড়ি গল্পের স্বাভাবিক সৌন্দর্যকে নষ্ট করে ফেলে। শিশুমনের এবং সুখী দাম্পত্যজীবনের চিত্র অঙ্কনে আনন্দের তুলনা নেই। সামাজিক সমস্যা এবং তজ্জনিত করুণ পরিণতির কথাও তিনি বলেছেন।

কে. গোপালকৃষ্ণরাও, কে. কৃষ্ণকুমার এবং এ. এন্. কৃষ্ণরাও বেশ দক্ষতার সঙ্গে কয়েকটি বিষয় নিয়ে গল্প লিখে কন্নড ছোটগল্পকে সমৃদ্ধ করেছেন। অন্য কিছুর চেয়ে পাত্রপাত্রীর চরিত্র বিশ্লেষণের দিকেই তাঁর বিশেষ লক্ষ্য। তির্যক প্রাণীসহ সকলের জীবন ব্যাপারেই কৃষ্ণকুমারের ব্যগ্র-আগ্রহ। ঘটনার বর্ণনে তাঁর অনুপুঙ্খবোধও বিস্ময়কর। একদিকে সামাজিক ব্যাধির কঠোর সমালোচক এ. এন্. কৃষ্ণরাও অন্যদিকে উদার ক্ষমাশীল দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী। আর একজন বিখ্যাত গল্পলেখক ভারতীপ্রিয়, মনুষ্য-প্রকৃতি ও বর্ণনাকৌশল সম্পর্কে যাঁর বোধশক্তি উচ্চ সমাদর পেয়েছে। যে সমস্ত গল্পকার পল্লী অঞ্চলে বাস করে গ্রামীণ জীবন ও চরিত্র অঙ্কন করেছেন, তাঁদের মধ্যে বিশেষ প্রশংসনীয় গোরূর রামস্বামী আয়েঙ্গার, মির্জি অন্নারাও এবং বসবরাজ

কত্তিমণি। গ্রাম্য জীবনের বহু চিত্তাকর্ষক চরিত্রের লেখাচিত্র অঙ্কন করে গোরুর কন্নড সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। যদিও তাঁর সবগুলিকে ঠিক ঠিক ভাবে ছোটগল্প বলা যায় না, তবু সেগুলি ছোটগল্পের মতোই পাঠককে সমান-ভাবে নিবিষ্ট করে রাখে। গ্রাম্য পরিবেশের জীবন সম্পর্কে মিজি অন্নারাও একনিষ্ঠভাবে ওয়াকিবহাল। দুর্ভিক্ষ অবস্থার মধ্যে যাদের বাঁচতে হয় এমন সব দরিদ্র ও নিপীড়িত মানুষের জীবন-কথা নিয়ে ভয়ঙ্কর চিত্র এঁকেছেন বসবরাজ কত্তিমণি। অসাম্য অবিচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার। অন্যান্য লেখকদের মধ্যে এইচ. পি যোশী, তেংগসে, শ্রীস্বামী এবং এম্. ভি. সীতারামাইয়া ছোটগল্পের ক্ষেত্রে সুনাম অর্জন করেছেন। বেন্দ্রে ও কুবেম্পুর মতো যে সমস্ত লেখক কন্নড কাব্যের সমৃদ্ধি সাধনে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী তাঁরা উচ্চাঙ্গের গল্প রচনাতেও ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। কস্তূরী রাজরত্নম্, বীচি এবং ভি. জি. ভট্ট হাস্যরসাত্মক গল্পের সঙ্গে সঙ্গে উচ্চমানের ছোটগল্পও লিখেছেন। প্রগতিশীল লেখকের মধ্যে তরাসু এবং নিরঞ্জন তাঁদের অভীপ্সিত উপাদানের ব্যবহারে নিজস্ব জীবন দর্শনকে তুলে ধরেছেন। গত তিন-চার দশকে এত বেশি, সংখ্যক গল্পলেখক তাঁদের সংকলন প্রকাশ করেছেন যে তাঁদের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করাও সম্ভব নয়। তাঁদের কয়েকজন বেশ কিছু উপযুক্ত গল্প লিখেছেন সন্দেহ নেই, তবে তাঁদের শিল্প-কলার পরিণতি সাধনে আরও অনেক প্রয়াসী হতে হবে। অপর কয়েকজন ছোটগল্পের কোনো কোনো শাখায় ইতিপূর্বেই কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। বিশেষ করে অশ্বত্থ কর্ণাটকের বাইরে বিশেষ বিশেষ অঞ্চলকে কাহিনীর পটভূমিরূপে সৃষ্টি করে নতুন পথ খুলে দিয়েছেন। তাঁর রচনা থেকে বোঝা যায় যে তিনি আঙ্গিক নিয়ে বাড়াবাড়ি না করেও আঙ্গিক সম্পর্কে সচেতন। চরিত্র সৃষ্টিতে এবং অনুপুঙ্খের বর্ণনায় তিনি একাধারে সংযত ও আত্ম-প্রত্যয়শীল। এন্. বেন্দ্রে তাঁর বিষয়বস্তুর সক্ষম রূপদানে হঠাৎ খ্যাতির আলোয় এসে পড়েন। বৃহত্তর ভারতের বিষয়বস্তু নিয়ে গল্প লিখে ভি. এম্. জেলী কন্নড ছোটগল্পের পরিধিকে আর প্রসারিত করে তুলেছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে পূর্ব রণাঙ্গনে তাঁর অভিজ্ঞতা এবং পূর্ব এশিয়ার জীবন ধারা পর্যবেক্ষণের ফলে তিনি তাঁর গল্পে নতুন নতুন বিচিত্র ঘটনা সংস্থান সৃষ্টি করে পাঠকের আগ্রহ সঞ্চারে বিশেষ সাফল্য লাভ করেছেন। ব্যাসরায় বল্লাল

তাঁর ছোট গল্পে তুলে ধরেছেন স্বাধীনতা সংগ্রামের যুগ, দেশবিভাগজনিত সমস্যা এবং স্বাধীনতা-উত্তর যুগের অন্যান্য সমস্যাবলী। ডি. বি. কুলকর্ণী এমন কয়েকটি সুন্দর ছোটগল্প লিখেছেন যার বৈশিষ্ট্য মার্জিত চরিত্র বিশ্লেষণ, যদিও কখনও কখনও তা নকশা বা ব্যক্তিগত প্রবন্ধের পর্যায়ে গিয়ে পড়েছে। সাম্প্রতিক লেখকদের মধ্যে যশবন্ত চিত্তল অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়ে ক্রমশই উৎকৃষ্ট গল্প লিখে চলেছেন। মহিলা গল্পকারদের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান হলেও এখনও তাঁরা পথ খুঁজে বেড়াচ্ছেন। গৌরম্মা, বাণী, গীতাদেবী, জয়লক্ষ্মী প্রভৃতি কয়েকজন বিষয়বস্তুর দক্ষ উপস্থাপনার দ্বারা সুখ্যাতি লাভ করেছেন।

আধুনিকতাপন্থী কবিতার সঙ্গে সঙ্গে আধুনিকতাপন্থী ছোটগল্প রচনাও শুরু হয়ে গেছে। প্রথম প্রথম এই ধারায় রামচন্দ্র শর্মা এবং ইউ. আর. অনন্ত-মূর্তির মতো মাত্র অল্প কয়েকজন প্রবক্তা ছিলেন। পরবর্তী যুগে এই সংখ্যা ক্রমশই বেড়ে চলেছে। রামচন্দ্র শর্মা খুব স্বচ্ছতার সঙ্গে না হলেও সাফল্যের সঙ্গে এই আঙ্গিক প্রয়োগ করেছেন। ইউ. আর. অনন্তমূর্তির 'যে গল্প কখনো শেষ হবে না' নামক গল্পসংকলনে আধুনিকতাপন্থী গল্পের উৎকৃষ্ট উদাহরণ 'লুলি হেংগরুলু'। গল্পটি প্রথম থেকে চমকপ্রদ পরিণতি পর্যন্ত পাঠকের মনকে আঁকড়ে ধরে রাখে। তবে গল্পের মধ্যে ইংরেজী উদ্ধৃতিগুলি অপরিহার্য বলে মনে হয় না।

উপরে প্রদত্ত দ্রুত ও সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে কন্নড ছোটগল্পের বৈচিত্র্য ও উৎকর্ষ সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা করা যেতে পারে। এই আলোচনায় অন্যান্য ভারতীয় ভাষা কিংবা বিদেশী ভাষা থেকে অনূদিত গল্পের কথা ধরা হয় নি। শিশুদের জন্য লিখিত গল্প কিংবা দৈনিক পত্রিকা ও সাময়িক পত্রে প্রকাশিত গল্পের কথাও নয়। সমগ্রভাবে দেখলে কন্নড ছোটগল্প প্রচুর ও বিচিত্র। কিন্তু কিছু ব্যতিক্রমের কথা ছেড়ে দিলে একথা বলা যায় না যে জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা উচ্চপর্যায়ের কলাশিল্পে উন্নীত হয়েছে। কয়েকটি ভালো ছোট গল্পে কোনো-না-কোনো ত্রুটি রয়ে গেছে—কোনো গল্পে আকস্মিক দ্রুত পরিণতি, কোনো গল্পে বিশ্বাসযোগ্যতার অভাব, আবার কোনো গল্পে স্বীয় মতপ্রচারে আগ্রহ। সেই সঙ্গে একথাও স্মরণীয় যে কন্নড ছোটগল্পের ক্ষেত্রে গর্ব ও আনন্দ করার মতো কয়েকটি অত্যুচ্চ শীর্ষবিন্দুও রয়েছে।

ছোটগল্প থেকে উপন্যাসের দিকে তাকালে দেখা যায় যে কাহিনীর পরিধি আরও প্রসারিত হয়েছে। গত পঁচিশ-তিরিশ বছর যাবৎ উপন্যাস রচনার পরিমাণ এত বেশি বেড়ে গেছে এবং বেড়ে যাচ্ছে যে কোনো সমালোচকের পক্ষে হাল আমলের সমস্ত উপন্যাস পড়ে ব্যাপক মূল্যায়ণ করা অসম্ভব।

কন্নড উপন্যাসিকদের মধ্যে সর্বোচ্চ গৌরবের স্থান যাঁর প্রাপ্য তাঁর নাম কে শিবরাম কারন্ত। ছোট বড় মিলিয়ে পঁচিশখানিরও বেশি উপন্যাসে তিনি কর্ণাটকের সামাজিক জীবনের বিভিন্ন দিক চিত্রিত করেছেন। একথা বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, যে সমাজকে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছেন ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জেনেছেন, সেই সমাজই তাঁর রচনার উপজীব্য। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করেই তিনি লিখবেন এই ছিল তাঁর প্রতিজ্ঞা। এই অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য তিনি কর্ণাটকের, বিশেষ করে তাঁর জন্মভূমি দক্ষিণ কানাড়ায়, সর্বত্র ঘুরে বেড়িয়েছেন। যেমন প্রচুর তাঁর অভিজ্ঞতা, তেমনি গভীরভাবে তিনি ভেবেছেন জীবনের সমস্যার কথা। তাঁর ব্যক্তিত্বের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে যদিও তিনি নিজস্ব ধরনের আদর্শবাদে অটল বিশ্বাসী, তবু কঠোর তাঁর বাস্তববোধ। তাঁর বাস্তববোধের মূলে রয়েছে একটি অকপট আকাঙ্ক্ষা—ভবিষ্যৎকালের জীবন গড়ে তোলা কত কঠিন হবে তা জানার জন্য বর্তমানকালের জীবনকে অনুধাবন করা।

এক অর্থে তাঁর সমস্ত উপন্যাসই আঞ্চলিক কারণ যে অঞ্চলের সঙ্গে লেখক ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত সেই অঞ্চলের পটভূমিতেই তাঁর কাহিনী ও চরিত্রগুলি ঘুরে বেড়াচ্ছে। এর মধ্যে আবার বলা যায়, 'মরলি মন্নিগে' 'বেট্টর জীব' এবং 'কুড়িয়র কুসু' এই উপন্যাস তিনখানিকে যেন আঞ্চলিক রূপেই তৈরী করা হয়েছে। 'মরলি মন্নিগে' তাঁর সবচেয়ে বৃহৎ উপন্যাস, সমুদ্রতীরবর্তী একটি দরিদ্র পরিবারের তিনপুরুষ ব্যাপী জটিল জীবন-কাহিনী চিত্রিত। পার্ল বাক রচিত সুপ্রসিদ্ধ 'গুড আর্থ' উপন্যাসের সঙ্গে কিছু কিছু মিল থাকলেও 'মরলি মন্নিগে' ঐ বিদেশী বইয়ের অনুকরণ নয়, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র উপন্যাস। গত একশ বছর ধরে দক্ষিণ কানাড়ার পারিবারিক জীবনে যে সব পরিবর্তন এসেছে এবং সেই পরিবর্তনের ফলে সে সমস্ত সমস্যার উদ্ভব ঘটেছে, কারন্ত তাঁর পরিণত ও সক্ষম শিল্প-কৌশলে বেশ বলিষ্ঠভাবে সেই সব পরিবর্তন ও সমস্যার জীবন্ত চিত্র এঁকেছেন। বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন সময়ে সমুদ্রের ভিন্ন ভিন্ন রূপসহ উপন্যাসের

আঞ্চলিক পটভূমি এই গ্রন্থের স্থানীয় রূপটিকে বাঙ্‌ময় করে তুলেছে। প্রকৃতির সার্থক বর্ণনা, তৎসহ শিল্পীর সংযত দৃষ্টিভঙ্গি, নিয়ন্ত্রিত ব্যাখ্যান, নির্ভুল নিখুঁত চরিত্র সৃষ্টি, বিষয়বস্তুর সুবিস্তৃত স্থানীয় বোলচালের উপযুক্ত ব্যবহার এই সমস্ত গুণে 'মরলি মন্নিগে' মহৎ উপন্যাসের মর্যাদা লাভের অধিকারী। এই বিশাল উপন্যাসে ভারতীয় নারীদের ধৈর্য, দুঃখ ও আত্মত্যাগের প্রতি-মূর্তিরূপে পারোতি, সরসোতি, নাগবেণী প্রভৃতি নারী চরিত্রের স্মরণীয় চিত্রণ দেখে বিস্মিত হতে হয়।

'মরলি মন্নিগে'-র চেয়ে আকারে ছোট হল আর একটি সফল আঞ্চলিক উপন্যাস 'বেট্টদজীব'। এই উপন্যাসে কথাবস্তু, চরিত্র ও পটভূমির চমৎকার সমাবেশ ঘটেছে। 'কুড়িয়র কূস্‌' আকারে মাঝারী গোছের হলেও বিস্তারে 'মরলি মন্নিগে'-র কাছাকাছি। এই উপন্যাসে মলেকুড়িয়র নামে পরিচিত উপজাতীয় লোকদের সামাজিক ও ধর্মীয় আচার-আচরণ এবং শিকার অভিযান সহ তাদের যাবতীয় পুঙ্খানুপুঙ্খ জীবন কথার বিবরণ অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভঙ্গিতে উপস্থাপিত করা হয়েছে। অন্যান্য উপন্যাসে শিবরাম কারন্ত বর্ণিত সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যার সংখ্যা কম নয়। তাঁর উপন্যাসসমূহের মধ্যে সবচেয়ে হৃদয় বিদারক ছবি আঁকা হয়েছে 'চোমনদুড' গ্রন্থে। একজন অস্পৃশ্য হরিজন সারাজীবন ধরে একটু একটু করে নিজস্ব জমি সংগ্রহের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেও সে ভূমিহীন মজুর হিসাবে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করল। সেই মর্মন্তুদ কাহিনীই 'চোমনদুডি'র বর্ণনীয় বিষয়। অন্যান্য উপন্যাসে পাই বৈধব্যের যন্ত্রণা, পতিতার কাহিনী, বিবাহিতজীবনে বিরোধ, রাজনৈতিক স্বার্থপরতা ও ভণ্ডামি, ইস্কুল মাস্টারের দুর্গতি ইত্যাদি। কারন্তের সাহিত্য জীবনের প্রথম দিকে তাঁর শিল্পকলা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে মেশানো এবং উপদেশাত্মক। ধীরে ধীরে তা আবেগহীন ও অনাসক্ত হয়ে ওঠে। বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা অনুপুঙ্খের শিল্পীসুলভ বোধ এবং বাস্তব ও যুক্তিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর শিল্পের প্রধান কথা। নিজের ব্যক্তিগত কথা তুলে না ধরেও জীবনকে পর্যবেক্ষণ ও উপস্থাপনের কৌশল তিনি আয়ত্ত করেছেন। কখনও কখনও তিনি কঠিন পরিস্থিতির বর্ণনাতেও দ্রুত অতিক্রম করে যান এবং তাতে পাঠকের বিশ্বাসে টান পড়ে তৎসত্ত্বেও তিনি একজন শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক যাঁকে নিয়ে কেবল কর্ণাটক নয়, সারা ভারতবর্ষ গর্ববোধ করতে পারে।

অ. না. কৃষ্ণরাও এমন একজন প্রতিভাশালী প্রাজ্ঞ জনপ্রিয় কথাশিল্পী যাঁর উপন্যাস পাঠের জন্য কর্ণাটকের লোক উন্মাদ হয়ে ওঠে। সামাজিক ও ঐতিহাসিক বিষয় নিয়ে অসাধারণ সাবলীল ভঙ্গীতে তিনি শতাধিক উপন্যাস লিখে গেছেন। বিশেষ করে তিনি একজন শিল্পীকে নিয়ে উপন্যাসমালা রচনা করেছেন। চিত্রকর, গায়ক, অভিনেতা, সাহিত্যিক, ভাস্কর—বিভিন্নরূপে শিল্পীর প্রকাশ। একজন শিল্পীকে তাঁর আদর্শ রূপায়ণের জন্য দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হন, সেই পথে তাঁর উত্থান পতন এবং শিল্পীর সাধনা ও সিদ্ধির উপর এই উপন্যাসগুলি বিশেষ আলোকপাত করে। 'সন্ধ্যারাগ' তাঁর একখানি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলে সম্মানিত। গায়ক লক্ষ্মণ সন্ধ্যার যে উপযুক্ত রাগ আয়ত্ত করবার জন্য সারাজীবন কাটিয়েছিল, সেই রাগে মার্গসঙ্গীত গাইতে গাইতে গায়কের জীবনাবসান হল। গায়করূপে লক্ষ্মণের চরিত্রচিত্রণই উপন্যাসের বিষয়। কয়েকখানি উপন্যাসে লেখক ভারতীয় সংস্কৃতির চিরন্তন মূল্যবোধের সমর্থন করেছেন এবং নারীজাতিকে প্রায় দেবীর পর্যায়ে উন্নীত করে তার প্রশংসা কীর্তন করেছেন। অন্য কয়েকটি উপন্যাসে আধুনিক-কালের পটভূমিতে তিনি নিকৃষ্টতম নরনারীর ছবি এঁকে জীবনের কদর্য বাস্তবতার ভয়ঙ্কর রূপ দেখিয়েছেন। খান তিনেক উপন্যাসে বড় বড় শহরে পতিতাদের বর্ণনায় গা ঘিনঘিন করে। অ. না. কৃ সাধারণত ঘটনা বিন্যাসে এবং ধ্বনির সংলাপের সাহায্যে গল্প-রস অক্ষুণ্ণ রাখায় পারদর্শী। কিন্তু কখনও কখনও তাঁর কথাবস্তু স্বাভাবিকতা ছেড়ে কৃত্রিম হয়ে ওঠে, চরিত্রগুলি সঙ্গতি হারায় এবং কোনো চরিত্রের আত্মবাদ বা আদর্শবাদ বদ্ধসংস্কারে পরিণত হয়। এই দোষগুলি থেকে মুক্ত হলে তাঁর উপন্যাস গুণমানে উন্নত হয়ে আরও হৃদয়স্পর্শী হতে পারত।

আর একজন প্রতিভাবান ও বহুপ্রসূ লেখক টি. আর. সুব্বারাও অথবা তরাসু। তাঁর লেখা খান তিরিশেক উপন্যাসের মধ্যে বেশির ভাগই সামাজিক। চিত্রদুর্গের পলেগরদের নিয়ে লেখা তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাসখানা প্রকাশিত হলে দুর্লভ ইতিহাস কল্পনা ও উৎকৃষ্ট কাহিনী বর্ণনার জন্য বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। চিত্রদুর্গের সামন্তরাজদের রাজত্বকালে আবির্ভূত এক আত্ম-মর্যাদাবান্ প্রতিভাশালী গায়কের জীবনকাহিনী নিয়ে রচিত 'হংসগীতে' তাঁর একখানি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। এই উপন্যাসে ব্যবহৃত নতুন আঙ্গিক হল : লেখকের

বর্ণনায় গল্প গড়ে ওঠেনি, গায়কের পরিচিত বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন দৃষ্টি-কোণ থেকে বলা বিবরণের মধ্য দিয়ে কাহিনী বিকাশলাভ করেছে। তরাসু তাঁর সামাজিক উপন্যাসগুলিতে পতিতাবৃত্তির সাধারণ সমস্যা এবং পারিবারিক জীবনে ভাঙনের কথা বার বার করে বলেছেন। তাঁর 'পুরুষাবতার' উপন্যাসে তিনি একটি নতুন সমস্যা উন্মোচন করেছেন · দাবীদারহীন এক অনাথ শিশুর ভয়ঙ্কর জীবনকথা চিত্রণে সফলও হয়েছেন। তাঁর বর্ণনা কৌশল ও অন্তর্দৃষ্টি অনস্বীকার্য। কিন্তু কথাবস্তু আরও সংহত ও সংযত এবং চরিত্রসৃষ্টি সুসংগত হলে তাঁর কথাশিল্প আরও পরিণতি লাভ করবে।

খানকুড়ি উপন্যাসের রচয়িতা বসবরাজ কত্তিমণি অকপট এক স্পষ্টভাষী লেখক। তিনি নিজে ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং তাঁর দুখানি উপন্যাসে সেই সংগ্রামের কথা লিখেছেন। তাঁর অন্যান্য উপন্যাসে যে প্রসঙ্গগুলি প্রকাশ্য-ভাবে তিনি সাহসের সঙ্গে উত্থাপিত করেছেন তার কয়েকটি হল : ধনী ও গরীবের সংঘর্ষ, অস্পৃশ্যতার অভিশাপ, সাম্প্রদায়িকতা, ভণ্ডামি ইত্যাদি। এতকাল পর্যন্ত লেখকদের উপেক্ষিত অবজ্ঞাত ও নিপীড়িত মানুষদের জীবনকথাও তিনি তুলে ধরেছেন। এর ফলে তাঁর রচনায় যেমন নতুনত্ব এসেছে, তেমনি এসেছে সাহসী পদক্ষেপ। প্রায়ই বাস্তব জীবনের ব্যক্তি ও ঘটনাবলী ভিন্ন পোশাকে তীক্ষ্ণ সমালোচনার বিষয় হয়েছে। বস্তুতান্ত্রিক উপন্যাসে স্বাভাবিক হলেও এর ফলে লেখকের পক্ষপাতশূন্য ন্যায়পরায়ণতা ক্ষুণ্ণ হতে বাধ্য। তাঁর একখানি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'মস্নু মত্তু হেন্নু' (মসী ও নারী) যার মধ্যে কঠিন বাস্তবতার সঙ্গে সংযম ও অনাসক্তির সংযোগ ঘটেছে। সংক্ষেপে বলা যায়, তাঁর উপন্যাস-গুলিতে ধ্বনিত হয়েছে অকথ্য অবিচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং প্রকাশ পেয়েছে বাস্তব জীবনের বিভিন্ন প্রসঙ্গের লেখা। তিনি যদি আরও বেশি পরিমাণে প্রকৃত শিল্পীসুলভ নিরপেক্ষতার অনুশীলন করতেন, তাঁর গ্রন্থাদির মূল্য নিঃসন্দেহে আরও বেড়ে যেত।

ঔপন্যাসিক নিরঞ্জন তাঁর রচনার বলিষ্ঠতার জন্য বিখ্যাত। প্রবন্ধ ও ছোট-গল্প ছাড়া তিনি খানকুড়ি উপন্যাস লিখেছেন, তার বেশির ভাগই সামাজিক উপন্যাস। তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাস 'কল্যাণস্বামী'। কুর্গের সাহসী লোকেরা ইংরেজদের কাছ থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেবার যে ব্যর্থ চেষ্টা করেছিল তারই কীর্তিকলাপ 'কল্যাণস্বামী'তে বর্ণিত। কেরলের অধিবাসীরা স্বাধীনতা

সংগ্রামে যে দুর্জয় সাহস দেখিয়েছিল 'চিরস্মরণে' উপন্যাস তারই ইতিবৃত্ত। সামাজিক ও অর্থনৈতিক দুর্গতির মধ্যে অসহায়ভাবে আর্তনাদ করছে যে সব সাধারণ মানুষের দল, গ্রন্থকার তাদেরই জীবনের সুস্পষ্ট ছবি এঁকেছেন তাঁর সামাজিক উপন্যাসগুলিতে। 'বিমোচনে' উপন্যাসে পাওয়া যায় লেখকের আঙ্গিকের উপর দখল এবং চরিত্র সম্পর্কে জ্ঞান।

পঞ্চাশেরও অধিক উপন্যাস রচনা করে কৃষ্ণমূর্তি পুরাণিক সুখ্যাতি অর্জন করেছেন। তাঁর অনেকগুলি উপন্যাস সস্তা সাহিত্যমালা পর্যায়ে প্রকাশিত হলেও সেগুলি কিন্তু সস্তা জনপ্রিয়তা লাভের জন্য লিখিত হয়নি। বস্তুত, তিনি বরাবরই শিল্পের একটি বিশিষ্ট স্তর রক্ষা করে চলেন এবং কথাবস্তু সংগঠন ও চরিত্র অধ্যয়নে বস্তুবাদ ও আদর্শবাদের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য-বিধানের চেষ্টা করেন। 'মুত্তুরিদে' 'বেররিনে বেলে' প্রভৃতি কয়েকটি তাঁর সুলিখিত উপন্যাস। শক্তিশালী লেখক ভি. এম. ইনামদার বারোটিরও বেশি উপন্যাসে শিক্ষিত শ্রেণীর সমস্যাকে নিপুণ চরিত্রজ্ঞান ও ঘটনার সাহায্যে বিশ্লেষণ করেছেন। বিশেষ চিত্তাকর্ষক অংশ তাঁর সংলাপ। বাবা-মায়ের কলঙ্কিত জীবন কীভাবে তাদের সন্তানদের জীবনে অভিশাপ ডেকে আনে এই রকম একটা নতুন বিষয়কে তিনি 'শাপ' উপন্যাসে খুব দক্ষতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। মির্জি অন্নারাও তাঁর ঘনিষ্ঠ পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে গ্রাম্যজীবনের প্রতি পাঠক সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে দশখানি ভালো উপন্যাস লিখেছেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'নিসর্গ' খুব জনপ্রিয় হয়েছে। এতে উত্তর-কর্ণাটকের সীমান্ত-ব্যাপী জনসাধারণের কথ্যভাষায় একটি পুত্রবধূর দুঃখকষ্টের হৃদয়স্পর্শী বর্ণনা রয়েছে। বৃহদায়তন 'রাষ্ট্রপুরুষ' উপন্যাসে কর্ণাটকের গ্রামে গ্রামে যে মুক্তি-সংগ্রাম চলেছিল তার অনুপুঙ্খ বিবরণ রয়েছে।

এম্. ভি. সীতারামাইয়া সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় বর্তমান সামাজিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন। লেখিকাদের মধ্যে ত্রিবেণী তাঁর বিষয় বৈচিত্র্য এবং ঔপন্যাসিক গুণাবলীর জন্য কন্নড কথাসাহিত্যে তাঁর যোগ্য স্থান করে নিয়েছেন। তাঁর উপন্যাস সমূহে প্রদর্শিত মানব মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে লেখিকার জ্ঞান প্রশংসনীয়। 'বেক্কিন কন্নু' এবং 'সারপঞ্জর' নামক তাঁর দুটি প্রধান রচনায় তিনি মানসিক নীতিভ্রষ্টতার যুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণ করেছেন এবং বেশ কলাকৌশলের সঙ্গে দেখিয়েছেন কীভাবে পারিবারিক ও সামাজিক কারণে

এইসব বিকৃতির সৃষ্টি হয়। অন্য দুজন নারী কথাশিল্পী এম. কে. ইন্দিরা এবং গীতা কুলকর্ণী নিপুণ রচনাশক্তিতে যশস্বিনী হয়ে উঠেছেন।

গীতিকবিতা, ছোটগল্প এবং নাটকের মতো অন্যান্য শাখায় সাহিত্য রচনা করে যাঁরা প্রসিদ্ধ লাভ করেছেন, তাঁদের কয়েকজন অল্প কিছু উপন্যাস লিখে সাহিত্যের এই শাখাটিতেও মূল্যবান অবদান রেখে গেছেন। তাঁদের কয়েকখানি উপন্যাস শ্রেষ্ঠ শিল্পকৃতি বলে গণ্য হয়ে থাকে। ১৯১০ সালে আনন্দকন্দই সর্বপ্রথম 'সুদর্শন' নামে একখানি সামাজিক উপন্যাস লেখেন। পরবর্তীকালে তিনি আরও একখানি সামাজিক উপন্যাস এবং দুখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেন। তাঁর 'মগল মদুবে' এবং 'অশান্তি পর্ব' বিশেষ উৎকৃষ্ট উপন্যাস বলে বিবেচিত। দেবুডু লিখেছেন চারখানি উপন্যাস। তাঁর 'অন্তরঙ্গ' কন্নড ভাষায় প্রকাশিত প্রথম মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস। 'মায়ুর' ঐতিহাসিক, এবং 'মহাব্রাহ্মণ' ও 'মহাক্ষত্রিয়'কে পৌরাণিক উপন্যাস বলা যেতে পারে। সব কখানি উপন্যাসই গ্রন্থকারের কল্পনাশক্তি ও বর্ণনা-নৈপুণ্যের পরিচায়ক। কুবেম্পু দুখানি বড় উপন্যাস লিখেছেন—'কানুরু সুব্বনা হেগ্‌গডিতি' এবং 'মলেগলল্লি মদুমগলু'। দুটিতেই বিশাল পটভূমিকায় মলেনাড অঞ্চলের মানুষদের জীবন বিস্ময়কর অনুপুঙ্খবোধ ও স্থানীয় পরিবেশ সমেত সুচিত্রিত। ব্যাপারটা লক্ষণীয় যে একজন রোমান্টিক ও অধ্যাত্ম-পরায়ণ বলে বিবেচিত কবিকে তাঁর উপন্যাসে সমপর্যায়ের বস্তুবাদী কথাশিল্পী রূপে পাই। বি. কে গোকাক তাঁর 'সমবয়তে জীবন' নামক সুবৃহৎ উপন্যাসে দাম্পত্যজীবনের কলহ ও মিলনের ছবি এঁকেছেন এবং বহু উল্লেখযোগ্য চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। রসিকরঙ্গ শিক্ষিত বেকারদের সমস্যা, কর্ণাটকের সমস্যা এবং ভারতবর্ষের খাদ্যসমস্যা নিয়ে যথাক্রমে 'বালুরি' 'কারণপুরুষ' এবং 'অন্না' নামে তিনখানি সমস্যামূলক উপন্যাস লিখেছেন। নাট্যকার শ্রীরঙ্গ লিখিত দুখানি উপন্যাসের মধ্যে চারখানি স্বাধীনতা-উত্তর যুগের রচনা। পূর্ববর্তী উপন্যাস দুখানির একখানিতে বিষয়বস্তু ভূতের ভয়; দ্বিতীয়খানিতে সামান্য গল্প অবলম্বনে সমাজের প্রতি তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ। তিনখানি কৃতিত্বপূর্ণ উপন্যাসের রচয়িতা কে. শঙ্করভট্ট। 'চন্নবসবনায়ক' এবং 'চিকবীররাজেন্দ্র' নামক দুখানি ঐতিহাসিক উপন্যাসে মাস্তি বলিষ্ঠ ভঙ্গিতে দেখিয়েছেন কীভাবে কেলডি এবং কোডগু রাজপরিবার আন্তঃকলহ ও নৈতিক অধঃপতনের ফলে ইংরেজদের

কাছে নতি স্বীকার করে। উপন্যাসের দিগন্তে নতুন অপ্রত্যাশিত নক্ষত্র হলেন কে. ভি. আয়ার। তাঁর 'রূপদর্শী' উপন্যাসে তিনি একটি সংক্ষিপ্ত গল্পের দুর্বলভিত্তির উপর একটি প্রকাণ্ড সার্থক কলামন্দির নির্মাণ করেছেন। সুপ্রসিদ্ধ চিত্রকর মাইকেল এঞ্জেলো যীশুখ্রীস্টের উপর ছবি আঁকার মডেল হিসাবে একটি বালককে খুঁজে বার করবার চেষ্টা করছেন—এই হল উপন্যাসের মুখ্য কথাবস্তু। তাঁর অপর উপন্যাস 'শান্তলা' হোয়সলরাজ বিষ্ণুবর্ধনের পত্নী শান্তলার মহৎ চরিত্র অবলম্বনে লেখা বিশিষ্ট ঐতিহাসিক উপন্যাস। বিজ্জলের রাজত্ব এবং বসবেশ্বরের জীবন ও নীতির পটভূমি হিসাবে কল্যাণ চালুক্যদের শেষ যুগের কাহিনী অবলম্বনে উপন্যাসমালা রচনা করেছেন বি. পুট্টস্বামইয়া।

সমস্ত প্রসিদ্ধ উপন্যাসিক অথবা সমস্ত উৎকৃষ্ট উপন্যাসের আলোচনা দূরে থাক, সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করাও হয়েছে বলে দাবী করা যায় না। কেবল কয়েকজন উপন্যাসিক এবং উপন্যাসের সঙ্গে পাঠককে পরিচিত করা হল মাত্র। এই অধ্যায় শেষ করার আগে সাম্প্রতিক কালে প্রকাশিত যে দু-একখানি উপন্যাস মনে রাখার মতো তাদের উল্লেখ করা হচ্ছে। একখানি সমগ্র পল্লীজীবনের শক্তিশালী পূর্ণাঙ্গ চিত্র রাওবাহাদুরের 'গ্রামায়ণ', দ্বিতীয়খানি ঐতিহ্য ও আধুনিকতার সার্থক সংঘর্ষ চিত্রিত করে রচিত এস. এল, ভৈরপ্পার 'বংশবৃক্ষ'।

দ্বাদশ অধ্যায়

নাট্যজগৎ

পূর্বের এক অধ্যায়ে কন্নড নাটকের উৎপত্তি ও বিকাশ সম্পর্কে মোটামুটি আভাস দেওয়া হয়েছে। যদিও উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে এবং কিছু পরে দু-তিনখানি মৌলিক নাটক প্রস্তুত হয়েছিল, তথাপি বলা যায় ধারাবাহিকভাবে মৌলিক নাটক রচনা শুরু হয়েছে এই শতকের বিশের দশকে। নাটকের ক্ষেত্রে ভাব, রূপ ও রীতি নিয়ে বেশ কয়েকটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়ে গেছে। কিন্তু সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল পেশাদারী ও সৌখীন নাটক ও নাট্যাভিনয়ের মধ্যেকার বিস্তর ব্যবধান। প্রথমটিতে আনন্দ-বিধানই বড় কথা, দ্বিতীয়টিতে শিল্প ও চিন্তা অধিকতর মূল্যবান। প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় বিচারে তৃপ্তিকর নাটক দুর্লভ। ফলে দুয়ের ব্যবধান বেড়েই গেছে। পদ্য নাটক, সংগীতধর্মী নাটক বা অপেরা, অমিত্রাক্ষর ছন্দের নাটক, রেডিও-নাটক—এ সবই প্রচুর পরিমাণে লেখা হয়েছে। এছাড়া আছে পূর্ণাঙ্গ ও একাঙ্কী নাটক। তন্মধ্যে একাঙ্ক নাটকের সংখ্যা ও উৎকর্ষ দুই-ই বেশি।

শ্রী (বি. এস্. শ্রীকণ্ঠাইয়া) যেমন তাঁর 'ইংলিশ গীতগলু' বইটি দিয়ে আধুনিক কন্নড কাব্যের প্রেরণা জুগিয়েছেন, তেমনি 'গদাযুদ্ধ নাটক' 'অশ্বত্থামন' এবং 'পারসীকরু' এই তিনখানি ছায়াবলম্বনে রচিত নাটক দিয়ে তিনি কন্নড কাব্য নাটকের সূচনা করে গেছেন। অন্য ভাষার শিল্প সৃষ্টিকে মাতৃভাষায় রূপায়িত করার যে দক্ষতা ও প্রতিভা তাঁর ছিল তাতে ছায়ানুবাদ বা ভাবানুবাদগুলিও মৌলিক রচনা বলে মনে হত। ডি. ভি. গুণ্ডপ্পা 'বিদ্যারণ্য' নামে একখানি সুখপাঠ্য নাটক রচনা করেন। গোবিন্দ পাই রচিত 'হেবেরুলু' প্রসিদ্ধ একলব্য উপাখ্যানের উপর একখানি কঠিন উত্তেজক নাটক। মাস্তি পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক মিলিয়ে বারোখানি নাটকের রচয়িতা। তন্মধ্যে 'যশোধরা' অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা, 'চিত্রাঙ্গদা' কবিত্বপূর্ণ গদ্যে, অন্যগুলি সাধারণ গদ্যে। 'যশোধরা' তাঁর শ্রেষ্ঠ পদ্যনাটক, শ্রেষ্ঠ গদ্য নাটক 'তালিকোটে'।

নবীন নাট্যকারদের মধ্যে টি. পি. কৈলাসম ছিলেন অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তি। কন্নড নাট্যজগতের দিগন্তে অকস্মাৎ উজ্জ্বল নক্ষত্ররূপে আবির্ভূত হয়ে অচিরকাল মধ্যে তিনি তাঁর নিজের নাট্যগোষ্ঠী তৈরি করেন। মহাকাব্যের বিষয় থেকে 'একলব্য', 'কর্ণ' প্রভৃতি গুরুগম্ভীর নাটক তিনি লিখেছিলেন ইংরেজীতে, সমস্ত সামাজিক নাটক লিখেছেন মাতৃভাষায়। তন্মধ্যে গুরুগম্ভীর ও হাস্যরসাত্মক দুরকমই আছে। তিনি নাটক লিখেছেন বলা ঠিক হবে না। যাঁরা তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসেছিলেন তাঁরা সকলেই জানেন যে তাঁর অধিকাংশ নাটক রূপ লাভ করেছে তাঁর মনের ছাঁচে। নাটকগুলি যেন তৈরী হয়েই তাঁর জিহ্বাগ্রে এসে হাজির হত। বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে হঠাৎ তিনি মঞ্চনির্দেশসহ নাটকের সংলাপ বলে যেতেন। যেন অন্য কোনো বই থেকে মুখস্থ বলে যাচ্ছেন এইভাবে স্বরভঙ্গি এবং অভিনেয় মুদ্রাসহ সেই সংলাপের পুনরাবৃত্তি করতেন। নাট্যকারের এই সব মৌখিক রচনার কিছু কিছু লিপিবদ্ধ হয়েছে, বাকি অংশ হারিয়ে গেছে। তাঁর প্রথম নাটক 'তোল্লুগট্টি' (ফাঁপা ও ঘন) কন্নড নাট্যক্ষেত্রে একটা নিঃশব্দ বিপ্লব সৃষ্টি করে—নাটকের আঙ্গিকের মধ্য দিয়ে জীবনের অপরিত্যাজ্য মূল্যবোধকে তুলে ধরে। সংলাপে কথ্য কন্নডর মধ্যে প্রচুর ইংরেজী শব্দের বুক্‌নি। নাটকে পুট্টু ও মাধু এই দুই ভাইয়ের বৈপরীত্য চমৎকার ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। পুট্টু গ্রন্থকীট, মাধু দিলখোলা ও মজাদার লোক। গ্রন্থশেষে এই কথাই ব্যঞ্জিত হয়েছে যে গ্রন্থকীট ছেলে পরীক্ষায় প্রথম হলেও প্রকৃতিতে ফাঁপা বা শূন্য, তাই পক্ষান্তরে মাধু পরীক্ষায় ফেল করলেও রুগ্না মায়ের সেবা শুশ্রূষা করে যথার্থই পূর্ণগর্বতার পরিচয় দিয়েছে। এই নাটকের ভূমিকায় প্রসিদ্ধ সমালোচক সি. আর. রেড্ডি বলেছেন—'সর্বোত্তম রীতিতে কাটা একটি সর্বোৎকৃষ্ট হীরকখণ্ড।' এই প্রশংসা অতিরঞ্জিত হলেও স্বীকার করতেই হবে যে কৈলাসম্-এর অসাধারণ নাট্যপ্রতিভার এই হল প্রথম প্রকাশ। তাঁর নাটকগুলিতে বিভিন্ন ধরনের নর-নারীর চরিত্র বিশ্লেষণ করা হয়েছে—স্ত্রৈণস্বামী, রাজনৈতিক ভণ্ড, মক্কেলহীন আইনজীবী, জাঁদরেল স্ত্রী এবং প্রাচীনপন্থী বিধবা। 'সূলে' (প্রতিভা) বইটিই বোধ করি তাঁর সবচেয়ে শক্তিশালী নাটক। এই নাটকের প্রভাব অসামান্য। লেখক দেখিয়েছেন পতিতাবৃত্তি একটি অভিশাপ যা মৃত্যু ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে দূর করা যায় না।

অপেক্ষাকৃত ছোট নাটক 'হোমরুল'-এ জনৈক গৃহকর্তার স্ত্রী ও মায়ের নিরন্তর সংঘর্ষের মধ্যে গৃহকর্তাকে স্বীকার করতে হয়েছে যে 'পরিবারে একজনই কর্তা, এবং তিনি আর কেউ নন, স্বয়ং গৃহিণী। সত্য বটে কৈলাসমের ঘটনাসংস্থান যথাযথ, চরিত্রগুলি বুদ্ধিদৃপ্ত ও ব্যঙ্গনিপুণ, তবু নাট্যিক-দৃষ্টিতে তাঁর নাটকগুলি ত্রুটিপূর্ণ, কারণ কখনও কখনও ঘটনাগুলি অবিশ্বাস্য, বিভিন্ন চরিত্রের সংলাপে বুদ্ধির সমানদীপ্তিতে উজ্জ্বল, স্বগতোক্তি অতিশয় দীর্ঘ এবং সংলাপে ইংরেজী বুক্‌নির বাড়াবাড়ি। এক্ষেত্রেও কন্নডদেশের উপর দিয়ে ঝোড়ো হাওয়ার মতো বয়ে যাওয়া কৈলাসম্-এর প্রতিভা অলৌকিক এবং ভারতীয় নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাসে প্রশংসার যোগ্য।

অপর একজন শক্তিশালী ও শিল্পসম্পদে গরীয়ান্ নাট্যকার আদ্য রঙ্গাচার্য (শ্রীরঙ্গ)। কন্নড নাটকে তাঁর অবদান যথার্থই অতুলনীয়। তাঁর রচনার মধ্যে কুড়িখানি নাটক সামাজিক, তিনখানি ঐতিহাসিক এবং অনেকগুলি একাঙ্কী। তিনিই সর্বপ্রথম ও সর্বাগ্রগণ্য নাট্যকার যিনি প্রথানুগত সমাজকে হুল ফোটানো ব্যঙ্গ দিয়ে কঠোর সমালোচনা করেছেন এবং তাঁর সামাজিক নাটকের বিষয়বস্তুতে প্রথাবহির্ভূত আধুনিক চিন্তাধারার সমর্থন করেছেন। স্বাধীনতা-লাভের পূর্বে লিখিত তাঁর নাটকগুলিতে কয়েকটি মুখ্য চরিত্রের মুখ দিয়ে সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে তাঁর মতামত প্রচার করেছেন, তাছাড়া ধর্মীয় ভণ্ডামিও তাঁর তীক্ষ্ণ আক্রমণের লক্ষ্য হয়েছে। তাঁর সমস্ত নাটকই ব্যঙ্গ ও উদ্‌ভট কল্পনার মিশ্রণ, দীর্ঘায়িত সংলাপে শ্লেষাত্মক উক্তি ব্যবহারের মিশ্রণ। তাঁর একটি শ্রেষ্ঠ নাটক 'হরিজনবার'। এই নাটকে এক গৃহকর্তার দ্বিমুখী চরিত্রের নোংরামি উদ্‌ঘাটিত, যে নির্যাতনে চমক সৃষ্টির জন্য হরিজনদের উন্নতির কথা বলে বেড়ায়। এর বিপরীতে দেখা যায় তার প্রাচীনপন্থী পত্নীকে যে বস্তিজীবনের খানা থেকে একটি হরিজন শিশুকে তুলে এনে তাকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচায়। স্বাধীনতা-উত্তর যুগে তিনি সাধারণভাবে রাজনীতিকদের ক্ষমতা দখলের লড়াই-এর উপর তাঁর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করেছেন আর দেখিয়েছেন জীবনের সর্বস্তরে আজ আমদের দেশ কীভাবে নৈতিক সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছে। স্বাধীনতা-উত্তর যুগে লেখা একখানি গুরুত্বপূর্ণ নাটক 'শোকচক্র'। এতে দেখানো হয়েছে স্বাধীনতার পূর্ব ও পরবর্তীকালের রাজ-নৈতিক কর্মীদের মনোভাব ও উচ্চাভিলাষের বৈপরীত্য। তিনি রঙ্গমঞ্চের

কলাকৌশল নিয়ে কয়েকটি সার্থক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। তন্মধ্যে আছে একই সময়ে মঞ্চের উপর দুটি সমকালীন দৃশ্যের প্রবর্তন। প্রায় সমস্ত নাটকেই এই এমন সব চরিত্রের সৃষ্টি করেছেন যারা নাট্যকারের মুখপাত্ররূপে তাঁর আদর্শ প্রচারের জন্য এবং সমস্ত প্রসঙ্গের উপর তাঁর মন্তব্যাদি প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত বলে মনে হয়। তাঁর আঙ্গিকে হাস্যকর ও গুরুগম্ভীর এই দুটো চিত্রের অদ্ভুত মিশ্রণ দেখা যায়। সংলাপ কখনও সূক্ষ্মভাবে চরিত্রের অভিব্যক্তি ঘটিয়েছে বলে পাঠকের প্রশংসা লাভ করে। কখনও আবার শ্লেষকৌতুকের অতিশয্যের দ্বারা ধৈর্যচ্যুতি ঘটায়। তৎসত্ত্বেও মোটের উপর শ্রীরঙ্গ একজন মৌলিক প্রতিভাশালী ও উদ্ভাবনাময় কল্পনাশক্তি-সম্পন্ন নাট্যকার, কন্নড সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি উচ্চস্থান লাভের যোগ্য।

প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিক কারন্ত নাট্যক্ষেত্রে তাঁর নিজস্ব ধরনে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে কন্নড রঙ্গমঞ্চে নিজস্ব অবদান রেখেছেন। দুখানি তাঁর পূর্ণাঙ্গ নাটক, তবে একাঙ্কী সৃষ্টির পরিমাণ অনেক বেশি। তাঁর পরীক্ষার সাফল্য বেশি লক্ষণীয় ক্ষুদ্র নাটকে। তাঁর বিশেষ দান পদ্য নাটক ও অপেরায় যেগুলিকে তিনি রঙ্গমঞ্চে সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেছেন।

নাট্য-প্রতিভায় কৈলাসম্-এর কাছাকাছি আসতে পেরেছেন সংসা। তবে দুজনের মধ্যে অমিলও অনেক। কৈলাসম লিখেছেন পৌরাণিক ও সামাজিক নাটক, সংসার বিশেষ ক্ষেত্র ঐতিহাসিক নাটক। তাঁর লেখা তেইশখানি নাটকের সন্ধান পাওয়া গেছে। সবগুলিই মহীসুর রাজাদের ইতিহাসের ঘটনা ও চরিত্রের উপর ভিত্তি করে রচিত। এই ইতিহাস তিনি তন্ন তন্ন করে অধ্যয়ন করে শেক্‌স্‌পীরীয় বেগ ও শক্তি নিয়ে তাঁর নাটক রচনা করেন। তাঁর একখানি শ্রেষ্ঠ নাটক 'বিগড বিক্রমাদিত্য'। তাতে রাজার প্রতি বাহ্য আনুগত্যের ভাব দেখিয়ে রাজার এক উচ্চাকাঙ্ক্ষী সেনাপতি সিংহাসন দখলের জন্য কীভাবে শলাপরামর্শ করছিল এই বিষয়টি দুর্লভ নাট্যকৌশলে চিত্রিত। চরিত্র বিশ্লেষণের অনুরূপ ক্ষমতা তাঁর অন্যান্য নাটকেও লক্ষণীয়।

কয়েকজন প্রসিদ্ধ কবিও নাট্য রচনায় হাত লাগিয়ে বিশেষ সাফল্য লাভ করেন। কুবেম্পু শেক্‌স্‌পীয়রের 'হ্যামলেট' ও 'টেম্পেস্ট' অবলম্বনে দুখানি বড়ো-সড়ো নাটক লিখেছেন। অমিত্রাক্ষরছন্দে তিনি কতগুলি একাঙ্কীরও রচয়িতা। সত্যবান-সাবিত্রীর কাহিনী নিয়ে অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা 'যমন সোলু' তাঁর

এবং আধুনিক কন্নড-র প্রথম নাটক। তাঁর অধিকাংশ নাটকের প্রেরণা পৌরাণিক ও মহাকাব্য থেকে গৃহীত বিষয়। সামাজিক বিষয় নিয়ে বেন্দ্রে দু'খানি পূর্ণাঙ্গ ও তিনখানি একাঙ্ক নাটক রচনা করেন। সবগুলিই গদ্যে লেখা। এস্. আর. শ্রীনিবাসভূমি 'নাগরিক' এবং 'ধর্মদুরন্ত' নামে দু'খানি অমিত্রাক্ষর ছন্দের নাটক লেখেন। কুবেম্পুর নাটকে সৃজনশীল কল্পনা ও সাবলীল ভাষার পরিচয় আছে। বেন্দ্রের নাটকে সামাজিক তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ এবং মনুষ্য-দুর্বলতা নিয়ে কঠোর ব্যঙ্গ।

পুতিন উচ্চগুণমান সম্পন্ন পাঠ্যনাটক ও সঙ্গীতনাট্য রচনা করেন। তাঁর বিষয়বস্তু রামায়ণ ও ভাগবত থেকে গৃহীত। তাঁর রচনার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল : বিশেষ প্রসঙ্গে ভাবাবেগ ফোটাবার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত ছন্দ অথবা গানের ব্যবহার। সংগীত ও কবিতার মিশ্রণ-জনিত তাঁর শিল্প কৌশলের উত্তম দৃষ্টান্ত 'অহল্যে' এবং 'গোকুলনির্গমন'। ভি. সী. তাঁর 'আগ্রহ' এবং 'সোহরাব রুস্তম' নাটকে প্রাচীন বিষয় নিয়ে খুব সাফল্যের সঙ্গে লিখেছেন। বিনায়ক 'মহাশ্বেতে' এবং 'তীরদ দারী'র মতো পদ্য নাটক ও সংগীত নাটক লিখে-ছেন, তদুপরি 'জননায়ক' ও 'যুগান্তর' নামে গদ্যে পূর্ণাঙ্গ সামাজিক নাটক এবং 'বিমর্ষকবৈদ্য' নামে একাঙ্কের প্রহসনও লিখেছেন। 'জননায়ক' গ্রন্থে একজন নেতার ব্যক্তিগত জীবন ও কর্মজীবনের সংঘর্ষের বিয়োগান্ত পরিণতি কতগুলি কঠিন ভাবাবেগপূর্ণ ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রদর্শিত হয়েছে। 'যুগান্তর' কন্নড সাহিত্যে একটি সম্পূর্ণ নতুন ধরনের নাটক। এতে নাট্যাকারে দেখানো হয়েছে কমুনিজম ও অধ্যাত্মবাদের সমন্বয়—এই হল নাটকের প্রধান বক্তব্য। রসিকরঙ্গের 'এত্তিদ কাই' একাঙ্ক নাটকের সংকলন। তাছাড়া তিনি সামাজিক ও ঐতিহাসিক মিলিয়ে পূর্ণাঙ্গ নাটক লিখেছেন ছ'খানি। জড়-ভরতের স্বপ্ন অবলম্বনে লেখা কতগুলি নাটক সংকলিত হয়েছে 'পাবনপাবক' গ্রন্থে। একটি বিবাহিতা যুবতী রমণীর অবরুদ্ধ দুঃখ যন্ত্রণা নিয়ে 'মূকবলি' নামে শক্তিশালী নাটক লিখেছেন লেখক জড়ভরত। কৃষ্ণমূর্তি পুরাণিক অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত 'সৈরন্ধ্রি' এবং 'রাধেয়' নামে দুখানি ক্ষুদ্র নাটকে নাট্য-শক্তির প্রমাণ দিয়েছেন।

পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের জন্য যাঁরা নাটক লিখেছেন তাঁদের মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাম : বি. নরহরি শাস্ত্রী, বি. পুট্টস্বামাইয়া, সদাশিবরাও

গমড় এবং কণ্ডগল হনুমন্তরাও। তাঁদের বেশির ভাগ নাটক পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক। শিল্পকৃতি হিসাবে এদের স্থায়িত্ব সর্বদা নিশ্চিতরূপে নির্ধারিত না হলেও রঙ্গমঞ্চে অভিনয়কালে বহুসংখ্যক দর্শক আকর্ষণের ক্ষমতার জন্য এগুলি জনপ্রিয়।

কৈলাসম্, শ্রীরঙ্গ প্রভৃতি ছাড়া আর যাঁরা সৌখীন সম্প্রদায়ের জন্য নাটক রচনা করেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সি. কে. বেঙ্কট রামাইয়া, এ. এন্. কৃষ্ণরাও, এন্. কস্তূরী প্রভৃতি। তাঁদের কয়েকটি নাটক পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের নাটক থেকে স্বতন্ত্র নাট্যগুণযুক্ত এবং সৌখীন রঙ্গমঞ্চে বিশেষ সাফল্য মণ্ডিত। নাট্যশিল্প এবং মঞ্চাভিনেয়তার দৃষ্টিতে এক্কে, কৃষ্ণকুমার, পর্বতবাণী, ক্ষীরসাগর প্রভৃতি লেখকের কয়েকখানি একাঙ্কী সফল হয়েছে। এল্. জে. বেন্দ্রে কিছু বিলম্বে নাট্যচর্চা শুরু করলেও কয়েকখানি পূর্ণাঙ্গ ও একাঙ্কী নাটক রচনা করে বস্তুবাদী নাটকের প্রকৃতজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। এইচ. কে. রঙ্গনাথ, বীচি, শিবশাস্ত্রী এবং আরও কয়েকজন রেডিও নাটকে বিশিষ্টতা লাভ করেছেন। আনন্দকন্দ এবং এক্কে এঁরা দুজনেই পদ্য নাটকের ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছেন।

ধীরে ধীরে 'অদ্ভুত নাটক' (absurd play)-এর সঙ্গে দেখা দিচ্ছে আধুনিকতাবাদী নাটক। কালক্রমে এই জাতীয় নাটকের অগ্রগতি অবশ্যম্ভাবী। কর্ণাটকে আধুনিক নাটক ও আধুনিক থিয়েটার যথেষ্ট অগ্রসর হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের নাট্যকৃতি ও নাট্যাভিনয়ের সমপর্যায়ভুক্ত হতে হলে সর্ববিভাগে আরও উন্নতি আবশ্যক। অন্ধ অনুকরণ ত্যাগ করে কর্ণাটকের সামাজিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন। পেশাদারী ও সৌখীন সম্প্রদায়ের ক্রমবর্ধমান ব্যবধান দূর করতে হবে। উৎকৃষ্ট গুণসম্পন্ন নাটক যাতে মঞ্চে জনপ্রিয় হয় তাঁর ব্যবস্থা করা দরকার। আজকের নাট্যকারদের এই যুগের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে নাট্যকলার গুণমান বিসর্জন না দিয়ে থিয়েটারকে সামাজিক অগ্রগতির শক্তিশালী যন্ত্র হিসাবে কাজে লাগানো উচিত।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

প্রবন্ধ ও অন্যান্য গদ্যরচনা

প্রবন্ধ, ভ্রমণ কাহিনী এবং অন্যান্য শ্রেণীর গদ্যরচনা গীতিকবিতা ও ছোটগল্পের মতো পাশ্চাত্য প্রভাবের ফলেই আধুনিক সাহিত্যে আবির্ভূত হয়েছে। গীতিকবিতা এবং ঐ জাতীয় সাহিত্য-কৃতির কিছু প্রাচীন রূপ এদেশে ছিল। কিন্তু প্রবন্ধের কোনো পূর্বরূপ ছিল না। কন্নড-তে অন্তত প্রবন্ধের বিশেষ করে ব্যক্তিগত প্রবন্ধ সম্পূর্ণ নতুন। তবু অল্প সময়ের মধ্যে এই জাতীয় রচনার মান নিকৃষ্ট নয়। ব্যাপক ও বিচিত্র হয়তো হয়ে ওঠে নি, কিন্তু গুণগত উৎকর্ষের কথা জোর দিয়েই বলা যায়। প্রথমে সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রে দেখা দিয়ে কালক্রমে প্রবন্ধ একটি স্বতন্ত্র ধারা হয়ে ওঠে। প্রথম প্রবন্ধগ্রন্থ বোধ করি বাসুদেবাচার্য বেন্নর-এর 'নিবন্ধমলে'; পরে গোবিন্দপাই এবং এম্ এন্. কামাত, এ আর. কৃষ্ণশাস্ত্রী এবং অন্যান্য প্রবীণ ব্যক্তিরা একাজে হাত লাগান। বছর তিরিশেক যাবং বিভিন্ন প্রকৃতির হাস্যরসাত্মক ও গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়ে আসছে। কিন্তু সর্বদা অঙ্গুলিনির্দেশ করে দেখানো কঠিন, কারণ কখনও কখনও প্রবন্ধ, ছোটগল্প ও চরিত্র নক্শা মিলেমিশে প্রায় একাকার হয়ে যায়। ব্যক্তিগত প্রবন্ধের অগ্রণী লেখকরূপে অনায়াসেই এ এন্. মূর্তি রাওকে চিহ্নিত করা চলে। 'হগলু গণমুগলু' এবং 'আলেয়ুর মন' সংকলন-গ্রন্থে তাঁর প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত। সংখ্যায় কম হলেও সেগুলি ব্যক্তিগত প্রবন্ধের আদর্শস্বরূপ, লেখকের চিন্তাসমৃদ্ধ ব্যক্তিত্ব এবং বক্তব্যের স্বাভাবিকতা ও মর্মগ্রাহিতার জন্য। প্রবন্ধের প্রতি ছত্রে এমন একটি ব্যক্তি সংস্কৃতির ছাপ দেখা যায়, যা বোধশক্তি ও অনুভবশীলতায় বয়সের সঙ্গে বেড়ে উঠেছে। এই প্রবন্ধগুলির রচনাশৈলী বেশ মার্জিত, কিন্তু এগুলির আকর্ষণ স্বচ্ছ নির্মল প্রীতিকর গুণের জন্য। বাসুদেবাচার্যের পরে পাওয়া যায় সুপ্রসিদ্ধ গল্প লেখক আনন্দের উৎকৃষ্ট প্রবন্ধগ্রন্থ 'নন্ন প্রয়াণ সখী'। তাঁর অন্য ধরনের কিছু রচনাও ইংরেজীর দ্বারা প্রভাবিত। তাঁর দুটি প্রবন্ধ অবশ্য মৌলিক। বেন্দ্রে, র. সী., পি. রামানন্দ রাও, এন্. কস্তুরী এবং আরও কিছু লেখক কন্নড

প্রবন্ধ-সাহিত্যের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করেছেন। বেন্দ্রে-র মধ্যে আছে চিন্তার গভীরতা, র. সী.তে সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তি এবং পি. রামানন্দ রাওতে চরিত্রজ্ঞান।

পরবর্তী লেখক গোষ্ঠীর মধ্যে প্রাবন্ধিকের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। এক্কে, এইচ. এস্. কে, গডগকর এবং বডেপ্পি-র মতো প্রবন্ধকার তাঁদের নিজস্ব পথে বিকশিত হচ্ছেন। এই সব প্রবন্ধকারদের রচনায় উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের লক্ষণগুলি পরিস্ফুট হলেও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকটি এখনও অস্ফুট। তা হল: নিজস্ব ছাপসহ একটি পরিণত সতর্ক ও নমনীয় ব্যক্তিত্ব। কখনও কখনও লেখকদের হাস্যরস ধার-করা, ভাসা-ভাসা এবং নিম্নরুচি সম্পন্ন। তাছাড়া প্রবন্ধের মানও খুব উচ্চস্তরের নয়। সামগ্রিক প্রবন্ধকারদের মধ্যে আর. ভি. কুলকার্নী (রাকু) উঁচু দরের লেখক। তাঁর ব্যক্তিগত প্রবন্ধে তিনি সংস্কৃত ও কন্নড কাব্য থেকে টুকরো টুকরো উদ্ধৃতিসমেত সামাজিক ব্যঙ্গের সমস্ত অস্ত্রই প্রয়োগ করেন। তাঁর প্রবন্ধগুলি উৎকৃষ্ট শিল্পের নিদর্শন বলে সমালোচকদের দ্বারা সমাদৃত। কেউ কেউ সেগুলিকে এ. এন্. মূর্তিরাও-র প্রবন্ধের সমতুল্য মনে করেন। যে প্রবন্ধ একাধারে চিন্তামূলক আবার ব্যক্তিগত সেই ধারাটি বিকশিত হয়েছে শ্রী. ভি. ভি. জি. মাস্তি, গোবিন্দ পাই, এ. আর. কৃষ্ণশাস্ত্রী, বেন্দ্রে, কুবেম্পু, গোকাক, পুতিনা, এ. আর কৃষ্ণরাও মালওয়াড এবং অন্যান্যদের রচনায়। দার্শনিক চিন্তা ও সাহিত্যিক আলোচনা এঁদের বৈশিষ্ট্য। শ্রী-র প্রবন্ধে প্রকাশভঙ্গির সৌন্দর্যসহ রয়েছে আবেগ ও উৎসাহ; ডি. ভি. গুণ্ডাপ্পার প্রবন্ধে পাওয়া যায় স্পষ্ট যুক্তিনিষ্ঠা ও উন্নত রচনারীতি। মাস্তি তাঁর ভাবনাচিন্তা ও মতামতকে খুব সরল ও জোরালো ভাবে তুলে ধরেন। গোবিন্দ পাই হালকা চালে কিছু ব্যক্তিগত প্রবন্ধ লিখলেও তিনি গবেষণাধর্মী পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ রচনায় সিদ্ধহস্ত।

এ আর. কৃষ্ণশাস্ত্রী বেশ সুসম্বদ্ধ রীতিতে তাঁর মতামত উপস্থাপিত করেন। বেন্দ্রের চিন্তাশক্তি মৌলিক এবং তাঁর রচনায় অভিজ্ঞতার বিভিন্ন দিক ও স্তর লক্ষণীয়। প্রকৃতির মহিমাময় দৃশ্য কুবেম্পুর চিন্তাকে উদ্দীপ্ত করে এবং সেই প্রাকৃতিক দৃশ্য বর্ণনায় তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি কয়েকটি রসগ্রাহী সমালোচনামূলক প্রবন্ধও লিখেছেন। গোকাক প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিন্তার পটভূমিতে বিশ্লেষণ ও সংহতিমূলক আলোচনা করেন। পুতিনা তাঁর ব্যক্তিগত

প্রবন্ধগুলিকে এত চিন্তাপূর্ণ বিষয়টি দিয়ে ভরপুর করে তোলেন যে সেগুলিকে আর মনের অলস ভাবনা বলে মনে করা যায় না। বৈজ্ঞানিক বিষয়সমূহের উপর লিখিত অসংখ্য প্রবন্ধ 'প্রবন্ধ কর্ণাটক' প্রভৃতি সাময়িকপত্রে ইতিপূর্বেই প্রকাশিত হয়েছে।

ব্যঙ্গরস ও হাস্যরস মিশ্রিত একধরনের প্রবন্ধ ধীরে ধীরে প্রসার লাভ করছে। মাঝে মাঝে এই সব রচনার বিদেশী উৎস চাপা থাকে বলে এগুলি মৌলিক বলে মনে হয়। সেগুলির কথা বাদ দিলে ঐ শ্রেণীর অনেক মৌলিক রচনাও আছে যা 'কোরওয়াঞ্জি' এবং 'বিনোদা' নামক হাসির পত্রিকায় ছাপা হয়ে পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। আধুনিক কন্নডেতে ব্যঙ্গরস ও হাস্য-রসাত্মক রচনাকে সমৃদ্ধ করেছেন প্রবীণ গোষ্ঠীর কারন্ত, শ্রীরঙ্গ, কস্তুরী, গোরুর, আর. শিবরাম এবং নবীন দলের বীচি, নাডিগের, সুঙ্কাপুর, দাশরথি দীক্ষিত, এ. আর. সেতুরাম এবং লাঙ্গুলাচার্য। এই জাতীয় রচনা সংকলনের মধ্যে মৌলিক হাস্যরসের উৎকৃষ্ট নিদর্শনরূপে বিশেষ উল্লেখযোগ্য: কারন্তের 'স্নান', শ্রীরঙ্গের 'ঋতুসংহার', কস্তুরীর 'উভয়বেদান্ত' ইত্যাদি। হাস্যরসের লেখকদের মনে রাখা দরকার যে সত্যিকার শিল্পকৃতি নাহলে ধার করা বা ভাসা-ভাসা হাস্যরস দিয়ে কিছুকাল লোকের মন ভোলানো গেলেও কালের পরীক্ষায় তা ঝরে পড়বে।

সাহিত্য সমালোচনাও এগিয়ে যাচ্ছে এবং এ বিষয়ে ভালো ভালো বই প্রকাশিত হয়ে চলেছে। এক্ষেত্রে প্রথম অবতীর্ণ হন মাস্তি ও ভি. ভি. গুণ্ডাপ্পা। পরে বেন্দ্রে, কুবেম্পু, র. সী, এস্. ভি. রঙ্গন্না, গোকাক, টি. এস্. শ্রীকণ্ঠাইয়া এবং আরো অনেকে এগিয়ে চলেন। যে সমস্ত গ্রন্থে সমালোচনার নীতি ও মূলসূত্র নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, তাঁর কয়েকখানি হল: মাস্তি-র সাহিত্য, ভি. ভি গুণ্ডাপ্পাকৃত 'জীবন সৌন্দর্যমত্তু', সাহিত্য বেন্দ্রে লিখিত 'সাহিত্য মত্তু বিমর্শে', গোকাকের 'কবিকাব্য মহোন্নাতি' ও অন্যান্য বই এবং র. সী. লিখিত 'অর্থ মত্তু মৌল্য'। টি. এন্. শ্রীকণ্ঠাইয়া লিখিত 'ভারতীয় কাব্য মীমাংসে' ভারতীয় অলঙ্কার শাস্ত্র সম্পর্কে একখানি প্রামাণ্য গ্রন্থ। ব্যবহারিক সমালোচনা গ্রন্থের মধ্যে একক কবি-সাহিত্যিকের উপর যে সমস্ত বই লেখা হয়েছে, তাঁর কয়েকখানি: পম্প মহাকবি, রন্ন কবিপ্রশস্তি, হরিহরদেব, আন্ডাইয়া, কুমার ব্যাস প্রশস্তি, নিজগুণস্বরূপদর্শন, লক্ষ্মীশ এবং মুদ্দানা।

সাহিত্যিক প্রসঙ্গে লিখিত সমালোচনা মূলক প্রবন্ধের সংকলন: কুবেম্পু-র 'তপোবন্ধন' এবং 'কাব্যবিহার', টি. এন্. শ্রীকণ্ঠাইয়া-কৃত 'কাব্য-সমীক্ষে' এবং 'সমালোকন'। আধুনিক কন্নড-র সমস্ত শ্রেণীর সাহিত্য সম্পর্কে বিশিষ্ট পর্যালোচনা লেখেন কে. ভি. কুর্মকোটি। প্রথমে কবি মনোহর গ্রন্থমালার 'লাডেডু বন্দদারি'-র মধ্যে এবং স্বতন্ত্রভাবে 'সাহিত্য' এবং 'যুগধর্ম' নামে প্রকাশিত হয়। সাপ্তাহিক প্রভৃতি সাময়িক পত্রে মুদ্রিত পুস্তক পরিচয়ের সংখ্যা অজস্র। তবে স্বাধীন নিরপেক্ষ ও উপযুক্ত সমালোচনা কন্নড সাহিত্যে তখন দৃঢ়মূল হয়নি। সমালোচনার নীতি মূলসূত্র নিয়ে অবিরত আলোচনার সাহায্যে স্বাধীন মতামত প্রকাশের আবহাওয়া তৈরী করা আবশ্যক।

গবেষণার ক্ষেত্রে বিভিন্ন পণ্ডিত তাঁদের নিজস্ব বিভাগে মূল্যবান কাজ করেছেন। শিল্পবিদ্যা, ব্যাকরণ ও অভিধান রচনার ক্ষেত্রে পথিকৃতের কাজ করে গেছেন Lewis Rice, Fleet এবং Kittel-এর মতো বিদেশী পণ্ডিতেরা। বহু বছরের অধ্যয়ন ও শ্রমসাধ্য গবেষণার ফলস্বরূপ আর নরসিংহাচার্য তাঁর 'কর্ণাটক কবিচরিত্রে' তিন খণ্ডে প্রকাশ করেন। এফ্. জি. হালকাত্তি বীরশৈব সাধক কবিদের জীবনচরিত নিয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং প্রশংসনীয় নিষ্ঠার সঙ্গে প্রাচীন বীরশৈব কবিদের রচিত 'বচন' সাহিত্য প্রকাশ করেন। প্রাচীন কন্নড কবিদের ঐতিহাসিক কাল নির্ণয়ে এবং জীবনচরিত রচনায় এ. বেঙ্কট সুব্বাইয়া, গোবিন্দ পাই, রাজপুরোহিত প্রমুখের অবদান অতুলনীয়। বীরশৈব রচনাবলীর সম্পাদনা ও টীকা প্রণয়নের জন্য কন্নড সাহিত্যের পাঠক পাঠিকাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়ে থাকবেন সীত্রামপ্পা পাবটে, এম. আর. শ্রীনিবাসমূর্তি, এস. এস. বসবনাল এবং বি. শিবমূর্তি শাস্ত্রী। এম্ আর শ্রীদেবানমূর্তি বীরশৈব সাহিত্য অধ্যয়নে জীবনভর আত্মনিয়োগ করে 'ভক্তি-ভাণ্ডারী বসবন্না' এবং 'বচনধর্ম সার' নামে দুখানি পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন। আমাদের প্রশংসার দাবী রাখে 'বচনশাস্ত্রর রহস্য' এবং 'হরি-ভক্তিসুধে' নামক দুখানি সংকলন গ্রন্থের মুখবন্ধে আর আর দিবাকর কৃত 'বচন' ও 'কীর্তন' সাহিত্যের ব্যাখ্যা। পুঁথি সম্পাদনার কাজ যাঁদের নিয়মনিষ্ঠা ও শ্রমসাধ্য কাজ প্রাচীন সাহিত্য অধ্যয়নের পথ প্রশস্ত করে করে দিয়েছে, তাঁরা হলেন: টি. এস. বেঙ্কন্নাইয়া, টি. এস. শ্রীকণ্ঠাইয়া, ডি. এল. নরসিংহাচার, এস. এস. ভুসনুরমঠ, এবং আর সি. হীরেমঠ। পুঁথি

সম্পাদনার উপর কন্নড ভাষায় প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ ডি. এল. নরসিংহাচারের 'গ্রন্থ সম্পাদনে' কর্ণাটক রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ, মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়, কন্নড সাহিত্য পরিষদ এবং বেসরকারী কিছু প্রকাশক শব্দকোষ মুখবন্ধ প্রভৃতি সহ প্রাচীন গ্রন্থটির সুসম্পাদিত সংস্করণ প্রকাশ করেছেন।

ভ্রমণ সাহিত্য এখনও তেমন বিশালায়তন না হলেও সাহিত্যক্ষেত্রে কিছু গুরুত্ব লাভ করেছে। প্রথম বিদেশ ভ্রমণের কাহিনী রচয়িতারূপে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ গোকাক। পত্রাকারে রচিত বইটির নাম 'য়াসমুদ্রদাচেন্দি' (সমুদ্রের ওপার থেকে)। এটি শুধু প্রশস্তিমূলক গ্রন্থ নয়। ইংরেজদের দোষ-গুণ, তাঁদের জীবন ও সংস্কৃতির যেন বাতায়ন এটি। হাম্বির-ধ্বংসস্তূপ পরিদর্শনের বর্ণনা করে র. গী-র, প্রথম ভ্রমণ কাহিনী 'পাম্পায়োত্রে' নামে। শিবরাম কারন্ত দুখানি বেশ উপভোগ্য ভ্রমণকাহিনী লিখেছেন 'অপূর্ব পশ্চিম' এবং 'অষুরিন্দ বরামক্কে' নামে। প্রথমখানিতে য়ুরোপ যাত্রা এবং দ্বিতীয়খানিতে ভারত-ভ্রমণ বর্ণিত। সম্প্রতি আমেরিকা, রাশিয়া, জাপান প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

জীবনী ও ইতিহাস সংক্রান্ত বই অনেকাংশে লেখা হয়েছে। প্রথম যুগ-প্রবর্তক গ্রন্থ 'কর্ণাটকগতবৈভব'-এর রচয়িতা হলেন কন্নড আন্দোলনের জনক বেঙ্কটরাও আলুর। ইতিহাস ও জীবনচরিত একসঙ্গে মিলিয়ে লেখা তাঁর আর একখানি বই 'কর্ণাটক বীররত্নাগলু' উদ্দীপক রচনারীতির জন্য সুপ্রসিদ্ধ। কর্ণাটকের ইতিহাস ও সংস্কৃতিবিষয়ক গ্রন্থ রচনকারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পঞ্চমুখী, লক্ষ্মীনারায়ণ রাও, পি. বি. দেশাই প্রভৃতি। শ্রীচৈতন্য, রামকৃষ্ণ পরমহংস, স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীঅরবিন্দ এবং মহাত্মা গান্ধীর উৎকৃষ্ট জীবনচরিত লেখা হয়েছে। জীবনচরিতমূলক প্রবন্ধ এবং সাহিত্যিক চরিত্রের আলেখ্য রচনা করে সাফল্যলাভ করেছেন এম্. কৃষ্ণশর্মা, ডি. ডি. কুলকার্নী' এইচ এম্. কে প্রভৃতি। এ পর্যন্ত অল্প সংখ্যক আত্মজীবনী যা লেখা হয়েছে তার মধ্যে জি. পি. রাজরত্নম্, শিবরাম কারন্ত এবং নবরত্ন রামারাও-র আত্মচরিত উল্লেখযোগ্য।

বিজ্ঞানবিষয়ক সাহিত্য রচনা ও প্রকাশনার দায়িত্ব নিয়েছে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়। বিজ্ঞানের নানা বিভাগে ছোট বড় বই প্রকাশ করে জন-সাধারণের ভাষায় আধুনিক জ্ঞানবিস্তারে এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির অবদান খুবই

মূল্যবান। এছাড়া এক্ষেত্রে শ্রীনরসিংহাইয়া, কে. এম্. সবামুর এবং পদ্মনাভ পুরাণিকের মতো কিছু বিশিষ্ট লেখকের ব্যক্তিগত প্রয়াসও উল্লেখনীয়। বিন্দু মাধব বুরলি সম্পাদিত আধুনিক বিজ্ঞানের উপর শতাধিক গ্রন্থ প্রকাশ করে মিঞ্চিন বল্লি গ্রন্থমালে উচ্চ প্রশংসার কাজ করেছে।

কারন্ত, ডি. ভি. জি, এম্. বি. যোশী এবং আর্. আর্. দিবাকর নিজ নিজ জীবনদর্শন ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শক্তিশালী ও ফলপ্রসূ ভাষায় মৌলিক চিন্তার পরিচয় দিয়েছেন। কর্ণাটকের প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে এস্. ভি যোশীর গবেষণামূলক গ্রন্থগুলি বিশেষজ্ঞদের প্রশংসা কুড়িয়েছে। মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন খণ্ডে কর্ণাটক বিশ্বকোষ প্রকাশ করে যাচ্ছে। এ বিষয়ে অবশ্য সর্বপ্রথম চেষ্টা করে পথ দেখিয়ে দিয়েছেন কারন্ত তাঁর 'বালপ্রপঞ্চ' ও অন্যান্য বই দিয়ে। কন্নড-কন্নড অভিধানের প্রথম খণ্ড কন্নড সাহিত্য পরিষদ ইতিপূর্বেই প্রকাশ করেছে। ছন্দ ও ভাষাতত্ত্বের উপর বই লিখেছেন ডি. এম্. কারকি, আর. ওয়াই. ধারওয়াড, এইচ. সি নাগরাজাইয়া এবং এম্.চিদানন্দ মূর্তি।

উপসংহার

(কন্নড সাহিত্যের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য)

এতদিন ধরে প্রাচীন, মধ্যযুগীয় ও আধুনিক কন্নড সাহিত্যের যে সমালোচনা-মূলক পর্যালোচনা সংক্ষেপে করা হল, তাতে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বিশদ বিবরণ দেওয়া হলেও আধুনিক সাহিত্যের জন্য গ্রন্থের এক-তৃতীয়াংশেরও কিছু কম জায়গা বরাদ্দ করা হয়েছে। সত্য বটে সর্ব রকম সৃজন-মূলক রচনার সূচনা থেকে আধুনিক সাহিত্যের ব্যাপ্তিকাল মাত্র পঞ্চাশ বছরের কিছু বেশি, কিন্তু এ যুগের সৃষ্টি যেমন পরিমাণে বিশাল তেমনি প্রকৃতিতে বিচিত্র। নবীন যুগের প্রতি সুবিচার করতে হলে আরও বেশি স্থানের প্রয়োজন। কিন্তু গ্রন্থের সুনির্দিষ্ট পরিধিতে তা করা সম্ভব হল। তাছাড়া, সাহিত্যের কোনো ইতিহাসকারই বোধ হয় তাঁর সাহিত্য পরিক্রমায় সমস্ত উৎকৃষ্ট রচনাকেও স্থান দিতে পারেন না।

এই পর্যালোচনা থেকে বোঝা যাবে যে কন্নড সাহিত্যের প্রারম্ভ কাল থেকে ভারতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির কাছ থেকে প্রেরণা পেলেও এর নিজস্ব স্বকীয়তাও অনস্বীকার্য। উপসংহারে কন্নড সাহিত্যের কয়েকটি প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা প্রয়োজন। অন্যান্য ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় না থাকায় এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে এখনও কন্নড সাহিত্যের নিজস্ব বলা বোধ করি খুব সাহসের কথা মনে হবে। কিন্তু ভারতীয় সাহিত্য এত বিশাল ও বিচিত্র যে কোনো একক ব্যক্তির পক্ষে এই বিরাট সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ সম্ভব নয়। ঠিক ঠিক বলতে গেলে, আমাদের জ্ঞানের বর্তমান অবস্থায় কোনো তুলনামূলক মূল্যায়ন সম্ভব নয়। তথাপি আজকের দিনে বিভিন্ন সূত্র থেকে সাহিত্যের যেটুকু খোঁজখবর পাওয়া যায় তাতে পরীক্ষামূলকভাবে কিছু বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা অন্যায় হবে না।

এ তো সহজ সত্য যে আমাদের দেশের সবচেয়ে প্রাচীন ঐতিহ্য সংস্কৃত-ভাষা ও সাহিত্য। সংস্কৃতের পরে প্রাচীনতার দিক থেকে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানের অধিকারী তামিল ও কন্নড। এই উভয় ভাষার প্রাচীনতর রূপ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে এক সময়ে ভাষা দুটি খুবই কাছাকাছি এমনকি

প্রায় অভিন্ন ছিল। মনে হয় আদি বা মূল দ্রাবিড় ভাষা প্রধানত এই দুটি ভাষার প্রাচীনতম উপাদান নিয়ে গঠিত ছিল, যদিও তেলুগু-র মতো অপর দ্রাবিড় ভাষাগুলির ভূমিকাও বিবেচনার যোগ্য। এই মর্মের ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে খ্রীস্টীয় শতকের আরম্ভ কালেও কন্নড সাহিত্যের অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু সেই অস্তিত্বগুলিকে হয়তো নিশ্চিত প্রমাণ বলে গণ্য করা যায় না। এই গ্রন্থের প্রথম দিকে বলা হয়েছে কন্নড সাহিত্যের যাত্রা নিশ্চিতভাবে পঞ্চম শতকে শুরু হয়ে গত পনেরোশো বছর যাবৎ সেই ধারা অবিচ্ছিন্ন ভাবে চলে এসেছে।

একথা সত্য যে কোনো সাহিত্যের গুণাগুণ কেবল তার প্রাচীনতা অথবা লেখকের সংখ্যা দিয়ে বিচার করা উচিত নয়। কিন্তু প্রাচীনতা ও লেখক সংখ্যা থেকে এটুকু বোঝা যায় যে সাহিত্যিক ঐতিহ্য কত পুরোনো এবং সেই ভাষার জনসাধারণের জীবনের উপর সেই সাহিত্যের প্রভাব কতটা গভীর এবং স্থায়ী। একথা না বললেও চলে যে কোনো ভাষায় সাহিত্যের মূল্য কেবল সাহিত্যিক মানদণ্ডেই করা বিধেয়। যখন আমরা এই দৃষ্টিতে কন্নড সাহিত্যের কথা চিন্তা করি তখন স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে এই সাহিত্য কতটা বাইরের প্রভাব থেকে মুক্ত ও মৌলিক। কন্নডভাষার মতো কন্নড সাহিত্যও প্রাচীনতম যুগ থেকে সংস্কৃতের প্রভাবে বিকাশ লাভ করেছে। কন্নড সাহিত্যের প্রথম প্রাপ্ত গ্রন্থ 'কবিরাজ মার্গ' দণ্ডীর 'কাব্যাদর্শ'-এর অবলম্বনে রচিত। প্রথম চিরায়ত গ্রন্থ 'পম্পভারত' ব্যাসভারতের কাছে ঋণী। তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ আদি পুরাণের মূল প্রেরণা জিনসেনার রচিত সংস্কৃত গ্রন্থ 'মহাপুরাণ'। পরবর্তী যুগের আরো অনেক লেখক কোনো-না কোনোরূপে সংস্কৃত সাহিত্যের কাছে ঋণ স্বীকার করেছেন। সাধারণভাবে বলা যায়, প্রাচীন সাহিত্য সংস্কৃত ও প্রাকৃতের কাছে ঋণী। বিশেষ করে, উপনিষদ, আগম, পুরাণ, ভগবদ্গীতা, রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের কথা উল্লেখ-যোগ্য। সুতরাং একথা বললে সত্যের অপলাপ হবে না যে প্রাচীন কন্নড গ্রন্থাদিতে সাধারণভাবে কোনো মৌলিক বিষয় বা মৌলিক দৃষ্টি-ভঙ্গির পরিচয় নেই। তবে আন্দেয়া-র 'কবিগর কব' এবং কনকদাসের 'রামাধ্যায় চরিতে' গ্রন্থে বিষয়বস্তুর দিক থেকে দুর্লভ উদ্ভাবনী শক্তি দেখা যায়।

কোনো গ্রন্থের বিষয় ও দৃষ্টিভঙ্গির উৎস যাই হোক না কেন, প্রকৃতপক্ষে বিষয়বস্তু উপস্থাপনার রীতি ও পদ্ধতির উপর সেই গ্রন্থের

সাহিত্যমূল্য নির্ভরশীল। একথা শুধু কন্নড সাহিত্য সম্পর্কেই নয়, অন্যান্য সাহিত্যেরও প্রাচীন গ্রন্থাদি সম্পর্কে প্রযোজ্য। কন্নড লেখকগণ তাঁদের বিষয়-বস্তুকে বেছে নিয়ে আত্মস্থ করে তাঁদের পুনর্গঠনমূলক শিল্পসৃষ্টিতে স্বীয় বিদ্যাবত্তা, প্রতিভা ও জীবনদর্শন প্রকাশ করেছেন। কখনও কখনও তাঁদের রচনায় কথাবস্তু সংগঠনে নতুন উপাদান এবং চরিত্র বিশ্লেষণে নতুন ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, পম্পভারতে এবং হরিশ্চন্দ্র কাব্যে কাহিনী সংগঠনে নতুন আঙ্গিক অথবা নতুন উপস্থাপন রীতি দৃষ্টিগোচর হয়। বচন, কীর্তন, সর্বজ্ঞের বাণী এবং লোকগাথার মতো অতীন্দ্রিয় বা ভক্তিমূলক সাহিত্যে সাধক কবিদের অন্তর উপলব্ধি ও স্বকীয় সৃজনীশক্তির জন্য ভাব ও রূপ উভয়ত পরিবর্তন ও নতুন কিছুর প্রবর্তন ঘটেছে যদিও তাঁদের মূল ভাবটি অবশ্যই ভারতীয়। পাশ্চাত্য প্রভাবিত আধুনিক সাহিত্যের চিন্তায় ও রূপায়ণে মৌলিকতা দেখা যায় যদিও তা লেখকদের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা এবং ব্যক্তিত্ব বিকাশে কিছু কিছু ভিন্নরূপে প্রতিভাত হয়। সর্বাঙ্গীণ দৃষ্টিতে কন্নড সংস্কৃতির বিশিষ্ট লক্ষণরূপে কয়েক শতাব্দী ব্যাপী কন্নড সাহিত্যে জীবন সম্পর্কে একটা মোটামুটি স্বতন্ত্র মেজাজ ও দৃষ্টি-ভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। এইভাবে তার সংজ্ঞা নির্ধারণ করা যেতে পারে। কন্নড সাহিত্য সমস্ত উত্তম প্রভাব গ্রহণে উন্মুখ। যদিও সময়ে সময়ে নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির বিনিময়ে এই সাহিত্য বাইরের প্রভাবে অভিভূত হয়ে পড়ে, তথাপি এর এমন একটা স্বতন্ত্র সত্তা রয়েছে যা দেশীয় ও বিদেশী উপাদানের সামঞ্জস্য ঘটিয়ে শ্রেষ্ঠ রচনায় একটা সমন্বয়ের চেষ্টা করে।

কন্নড সাহিত্যের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এই সমন্বয়ী দৃষ্টিভঙ্গি যা আর্য-দ্রাবিড়ের সাংস্কৃতিক সংঘর্ষের মীমাংসায়, সংস্কৃত কন্নড বিরোধের ব্যাপারে অথবা প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধমতের মিলন প্রয়াসে সহায়ক হয়েছে। তাই দেখা যায় কন্নড সাহিত্যের দীর্ঘ ইতিহাসে ধর্মবিশ্বাস ও সম্প্রদায়ের বৈচিত্র্য। এই বৈচিত্র্যভাবের ফলে মাঝে মাঝে সংঘর্ষ সৃষ্টি হলেও আসল কথা এই যে শেষ পর্যন্ত নতুন উপলব্ধির ফলে নতুন সঙ্গীতের জন্ম হয়েছে। প্রাচীন কন্নড দেশে জৈন, বীরশৈব, শঙ্কর, মধ্ব ও রামানুজ এই সমস্ত বিভিন্ন ধর্ম-বিশ্বাস ও চিন্তা-গোষ্ঠীর আবির্ভাবের ফলে প্রাচীন কন্নড সাহিত্য শ্রেষ্ঠ ও মহৎ আত্মপ্রকাশের বাহন হয়েছিল। তাতে যেমন সংঘর্ষের নিদর্শন রয়ে গেছে, তেমনি রয়েছে

সংঘর্ষকে কাটিয়ে উঠে সমন্বয় স্থাপনের চিহ্ন। এই শেষোক্ত কাজের মধ্যেই কন্নড সাহিত্যের সম্পদ ও গৌরব। একথা অবশ্য অস্বীকার করা যায় না যে এরকম দৃষ্টিভঙ্গি ও অভিব্যক্তি ভারতের অন্যান্য সাহিত্যেও ঘটেছে; তবু মনে হয় বৈদিক ও বেদবিরোধী ধর্মমত ও সম্প্রদায়ের বিভিন্নতাকে কন্নড সাহিত্য ও সংস্কৃতি যে পরিমাণে সমন্বিত করার সুযোগ পেয়েছিল এবং চেষ্টা করেছিল অন্যত্র তা ঘটে নি।

ধর্মবিশ্বাসের বৈচিত্র্য সমেত কন্নড সাহিত্যে যে বিষয়বস্তু, বিভিন্ন সাহিত্য-রূপ, ছন্দ ও রচনারীতিতেও বৈচিত্র্য এসেছিল তার দৃষ্টান্ত এই সাহিত্যের সূচনাকাল থেকেই পাওয়া যায়। প্রথমে প্রাধান্য পায় সাহিত্যের চিরায়ত ধারা যাতে সংস্কৃত উৎস থেকে গৃহীত বিষয়বস্তুকে কন্নড রূপে ও ছাঁচে ফেলা হয়। অতঃপর আসে দেশীয় ধারা যাতে কন্নড উৎস থেকে গৃহীত বিষয়-বস্তুকে কন্নড পদ্ধতিতেই রূপায়িত করা হয়, যদিও সংস্কৃতের প্রভাবকে কখনও অগ্রাহ্য করা হয় নি। এই সমস্ত কারণে বিচিত্ররূপের বিভিন্ন গ্রন্থ কন্নড দেশের সাহিত্যকে অলঙ্কৃত করেছে।

এই বৈচিত্র্য আরও বেশি আধুনিক কন্নড কবিতায়। আধুনিক লেখক যখন তাঁর অভিপ্রেত বিষয় অনুযায়ী রূপ নির্বাচন করেন, তখন তিনি বাইরের কোনো শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হন না। ফলে কবিতায়, গল্পে, উপন্যাসে ও নাটকে নতুন নতুন ছাঁচ বা কাঠামো তৈরী হতে থাকে। কন্নড সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য নির্ণয় প্রসঙ্গে কোনো কোনো সমালোচক এই সাহিত্যের কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি নির্দেশ করেছেন। যেমন, প্রচুর পরিমাণে সাম্প্রদায়িক রচনা, প্রচুর পুনরাবৃত্তি, প্রকৃত কবিত্বরসের ক্ষতিসাধন করে মামুলি কাব্যরীতির প্রয়োগ, সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত নিষ্ঠা, দীর্ঘ ঘোরালো বর্ণনার অসংযম ইত্যাদি। কিন্তু এ সমস্ত ত্রুটি যে কোনো ভারতীয় ভাষারই প্রাচীন সাহিত্যে দেখা যায়, কন্নড কিছু ব্যতিক্রম নয়। অতীত যুগের সাহিত্য পরিবেশে এটা কিছু পরিমাণে অনিবার্যই ছিল। যে কথাটা বোঝা দরকার তা হল এই যে কন্নড লেখকগণ তাঁদের বাধা অতিক্রম করে তৎকালীন অবস্থার সীমারই মধ্যেই স্বকীয় প্রতিভা বিকাশের চেষ্টা করেছিলেন।

এই শতকের গোড়ায় E. P. Rice কন্নড ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি একটা বড় রকমের অবিচার করে গেছেন। কন্নড সাহিত্য সম্পর্কে গ্রন্থ রচনা করে

তিনি কন্নড-র অতুলনীয় সেবা করেছেন সন্দেহ নেই, কিন্তু তিনি তাঁর গ্রন্থের The characteristics of Kannada Literature নামক শেষ অধ্যায়ে কিছু অসত্য ও অর্ধসত্য বলেছেন। বিতর্কের সমস্ত বিষয় নিয়ে এখানে সাম্‌পুঙ্খ আলোচনা অভিপ্রেত নয়। তবে এই বিদেশী লেখকের একটি দুঃসাহসিক মন্তব্য উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। মন্তব্যটি এইরূপ :

I am afraid it must be confessed that Kanarese writers, highly skilful though they are in the manipulation of their language, and very pleasing to listen to in the original, have as yet contributed extremely little to the stock of the world's knowledge and inspiration. There is little of original and imperishable thought on the questions of perennial interest to man, Hence a lack of that which stimulates hope and inspires to great enterprises. (দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতেই হচ্ছে যে কানাডী লেখকরা ভাষার ব্যবহারে অত্যন্ত নিপুণ ও পারদর্শী হলেও এবং মূল ভাষায় তাঁদের রচনা অত্যন্ত শ্রুতিমধুর হলেও আজ পর্যন্ত বিশ্বের জ্ঞান ও প্রেরণা ভাণ্ডারে তাঁদের অবদান খুবই নগণ্য। মানুষের পক্ষে যা চিরন্তন আগ্রহের বস্তু সেই সব প্রশ্নে মৌলিক ও অবিনশ্বর চিন্তা তাঁরা বিশেষ কিছুই দিয়ে যান নি। কাজেই মানুষের মনে আশা সঞ্চার করবার মতো এবং মানুষকে মহৎ উদ্যোগে উদ্দীপ্ত করবার মতো বস্তুর একান্ত অভাব।)

উল্লিখিত মন্তব্য যদি সত্য হয়ে থাকে, তবে সত্যানুরাগীদের তা মেনে নিতেই হবে। আর যদি মন্তব্যটি অসত্য হয় তাও স্বীকার করতে দ্বিধা হওয়া উচিত নয়। প্রাচীন কন্নড সাহিত্যের একটি যথাযথ বিবরণ দানের যে আন্তরিক প্রয়াস করা হয়েছে তা থেকে নিরপেক্ষ পাঠক বুঝে নিতে পারবেন যে কন্নড সাহিত্যের অবদান খুবই নগণ্য কিনা। আমাদের অভিমত এই যে, কন্নড সাহিত্য বিশ্বের জ্ঞান ও প্রেরণার ভাণ্ডারে নিঃসন্দেহে প্রচুর অবদান রেখে গেছে।

হাজার বছরেরও অধিককাল থেকে প্রাপ্ত ইতিহাসে পরিণত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন কবি ও লেখকবৃন্দ বলিষ্ঠ কলাকৃতি রচনা করেছেন এবং জ্ঞানগর্ভ বাক্য উচ্চারণ করেছেন। যেমন, সমস্ত মানবজাতি সত্যিসত্যিই এক (পম্প) 'এই নশ্বর

পৃথিবী ঈশ্বরের 'টাঁকশাল' (বসবেশ্বর) 'স্বচ্ছন্দে সাঁতরে পার হয়ে জয়ী হও' (পুরন্দর দাস), 'অন্যের সঙ্গে আত্মবৎ ব্যবহার করলে স্বর্গীয় প্রাপ্তির অধিকারী হবে' (সর্বজ্ঞ)। এইসব মনীষীবৃন্দ যেন মহাকাশের পথে প্রেরণার শাশ্বত উৎস স্বরূপ চিরস্থায়ী দীপস্তম্ভ নির্মাণ করেছেন। কন্নডভাষীরা তাঁদেরই কাছ থেকে প্রেরণা লাভ করে নিজস্ব জীবন সংগঠনে নিরত। তারা যেমন অন্যান্য সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রচনায় অনুপ্রাণিত বোধ করবে, তেমনি ভারতবর্ষ ও পৃথিবীর অন্যান্য মানুষও কন্নড সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ অংশ পাঠে অনুপ্রাণিত হবে বলে আমাদের ঐকান্তিক আশা।

গ্রন্থপঞ্জী

[কন্নড ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে ইংরেজী ভাষায় লিখিত কয়েকটি নির্বাচিত গ্রন্থের তালিকা]

1. A History of Kannada Literature—E. P. Rice
2. The Heritage of Karnataka—R. S. Mugali
3. Popular Culture of Karnataka—Masti Venkatesh Iyenger
4. The Cultural History of Karnataka—A. P. Karmarkar
5. The Indian Literatures of Today—Edited by Bharatan Kumarappa (for the P. E. N.)
6. Literatures in Modern Indian Languages— A. I. R. Publication
7. Contemporary Indian Literature—Sahitya Akademi
8. Karnataka through the Ages—Mysore Government
9. Mahakavi Pampa—V. Sitaramiah
10. Karnataka Darshana—R. R. Diwakar Commemoration Volume
11. Bendre: Poet and seer—V, K. Gokak

(ইংরেজীতে কন্নড সাহিত্যের কিছু অনুবাদ গ্রন্থ)

1. Short Stories and Subbanna by Masti Venkatesa Iyengar
2. Chennabasavanayaka—novel by Masti. Transated by Navaratna Rama Rao
3. Marali Mannige—novel of Karanth. Translated by A. N. Moorty Rao

নির্দেশিকা